দেওয়ান
কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের
আত্ম-জীবন চরিত॥

দেওয়ান
কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের
আত্ম-জীবন চরিত॥

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

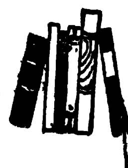
৭ই ভাদ্র, ১৩৬৮

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

বঙ্গের যে রাজবংশ প্রজারঞ্জনে, ব্রাহ্মণ পালনে, উদারতায়, দানে, সাহিত্যে চিরস্মরণীয়,— যে প্রসিদ্ধকুল বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহার যশ অমরকবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" গীত হইয়াছে, যে বংশ অদ্যাপি নবদ্বীপাধিপতিরূপে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছেন, যে বংশের সহিত নদীয়া রাজার দেওয়ানবংশ দুইশত বৎসরাধিক সংস্পৃষ্ট, যাঁহাদিগের মঙ্গলার্থে গ্রন্থকারের দীর্ঘকালব্যাপী পবিত্র জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, যে বংশের সেবায় গ্রন্থকারের পুত্র অদ্যাপি নিয়োজিত, সেই খ্যাতনামা কুলের বর্ত্তমান বংশধর, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, সুপণ্ডিত, প্রথিতযশা, নানাগুণালঙ্কৃত, নদীয়া রাজকুল-প্রদীপ **মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের** করকমলে, "আত্মজীবন" রচয়িতা স্বর্গীয় দেওয়ান **কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের** পুত্রগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে এই রাজকুল-ইতিহাস-জড়িত জীবনী অর্পণ করিলেন।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়।	শ্রীনরেন্দ্রলাল রায় (বর্ত্তমান কুমার বাহাদুরের শিক্ষক)।
শ্রীদেবেন্দ্রলাল রায়।	শ্রীসুরেন্দ্রলাল রায় (বর্ত্তমান দেওয়ান)।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।	শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়।
(ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান)।	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।



বিজ্ঞাপন

ক্ষিতীশবংশাবলী রচয়িতা স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের জীবনচরিতের কিয়দংশ মাত্র স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র অশেষ প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সুসম্পাদিত "সাহিত্য" মাসিক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই জীবনচরিত, বিশিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র, চিন্তা এবং কার্য্যাবলী সংশ্লিষ্ট হইলেও, ইহাতে বঙ্গের পঁচাত্তর বৎসর ব্যাপী সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত। যখন এই জীবনচরিত "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে ইহা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করেন এবং সংবাদপত্রাদিতেও বিশিষ্টরূপে উল্লিখিত হয়। ১৮৯৭ সালের ২৬শে মে তারিখে 'ইণ্ডিয়ান্ মিররে' এবং ১৩০৩ সাল বৈশাখের "সাহিত্যে" এই আত্ম-জীবনচরিত সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"The bulk of the Falgoon Number of the journal (Sahitya) is taken up by the autobiography of late Babu Karticayachander Roy Dewan of the Nuddea Raj. This is a very interesting contribution in as much as it presents a graphic account of the men and manners of a nearly bygone age".
—*Indian Mirror*.

"নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধিবাসী নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বরচিত জীবনচরিতের আরও একটি আকর্ষণ আছে। ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানজী মহাশয়ের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ, সুতরাং তাঁহার জীবন-কাহিনীর সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্তও স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। আত্ম-জীবনচরিতের এদেশে সম্পূর্ণ অপ্রতুল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্ম-জীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথাই নূতন তথায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত একজন বিষয়ী ব্রাহ্মণ আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও অল্প বিচিত্র নহে। রায় মহাশয় এই আত্ম-জীবনচরিতে প্রসঙ্গক্রমে যেসকল মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উদারতা ও সূক্ষ্মদর্শনের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক এই জীবনচরিতের সঙ্গে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।"—সাহিত্য।

এই আত্ম-জীবনচরিতের সহিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংযুক্ত। আজন্ম বিশুদ্ধচরিত্র, দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই "আত্ম-জীবনচরিত"-লেখক ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে আসিয়া বলেন,—"যদি কার্ত্তিকবাবু কোন কার্য্য অপূর্ণ বা অসম্পন্ন রাখিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিতান্ত ইচ্ছা যে তিনি উহা সম্পন্ন করিয়া যান।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রীতিপূর্ণ অভিমতি প্রকাশের পর তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট

হইয়া আমি পিতৃদেবের এই "আত্ম-জীবনচরিত"—এবং বঙ্গভাষায় অনুবাদিত পার্শী পুস্তকসমূহ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থগুলি গ্রহণান্তর অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাষ্পদিগ্ধ গদগদস্বরে কহিলেন, "আমি নিজের মুদ্রাযন্ত্রে ও নিজ ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে আদ্যোপান্ত দেখিয়া শুনিয়া এই পুস্তকগুলি ছাপাইব। এই কার্য্য পরিশ্রম সাপেক্ষ। কিন্তু কার্ত্তিকবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতাম ও ভালবাসিতাম বলিয়াই এই আমার বৃদ্ধাবস্থায় ও অসুস্থ শরীরে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্যগ্র ও উৎসুক। তবে ইহাও বলিতেছি যে, এ সংসারে কার্ত্তিকবাবু ভিন্ন আর কাহারও জন্য, আমি, এই ভগ্নশরীরে এবম্প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইতাম না।" এই কথাবার্ত্তার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত হইলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন। এই আত্ম-জীবনচরিত সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ণ অভিলাষ সুসিদ্ধ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতপ্রবর লালমোহন বিদ্যানিধি আমাকে সন ১৯০০, ৪ঠা আগষ্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বদা কার্ত্তিকেয়বাবুর জন্য দুঃখ করিতেন; কহিতেন, 'কবে কার্ত্তিকবাবুর সহিত স্বর্গে দেখা করিব'।" আজ তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন জগতে,—আবার, হয়তো প্রীতিসূত্রে আকৃষ্ট ও সম্মিলিত। তাঁহাদিগের উভয়ের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া এই "আত্ম জীবনচরিত" জনসমাজে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে চলিল। নানা কারণে শঙ্কিত পদে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইল।

শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়

কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ 'চক্রবর্ত্তী দেওয়ান' পরিবারে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণনগর রাজপরিবারে দেওয়ানী করিতেন। নিজের চেষ্টায় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র দেশের ও দশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তৎকালীন সকল শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্য' গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন:

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান,
সুললিত স্বরে গত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজানবাহিনী।"

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের দুইটি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থ 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতাবলী'— তিনি প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার পিতার নিকট হইতে সাহিত্যিক প্রতিভা ও ঐতিহ্য লাভ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত প্রবাসকালে—১৮৮৫, ২রা অক্টোবরে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র পরলোকগমন করেন।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর সংখ্যা বেশী নয়। প্রথম উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী কিশোরীলাল সরকারের মাতা রাসসুন্দরী দাসী প্রকাশ করেন ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৬, ইহার নাম 'আমার জীবন'। এই গ্রন্থটি আমরা ১৩৬৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনর্মুদ্রণ করিয়াছি।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের 'আত্মজীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত প্রসিদ্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, ইহার নয়টি সংখ্যায় (বৈশাখ—শ্রাবণ, কার্ত্তিক—পৌষ ও ফাল্গুন—চৈত্র) মুদ্রিত হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্রগণের চেষ্টায় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশকাল ২৯ এপ্রিল, ১৯০৪, এই তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরী সঙ্কলিত 'মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা' হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

[দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ সংখ্যাসমূহ পৃষ্ঠার্থ-জ্ঞাপক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

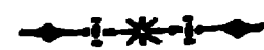
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

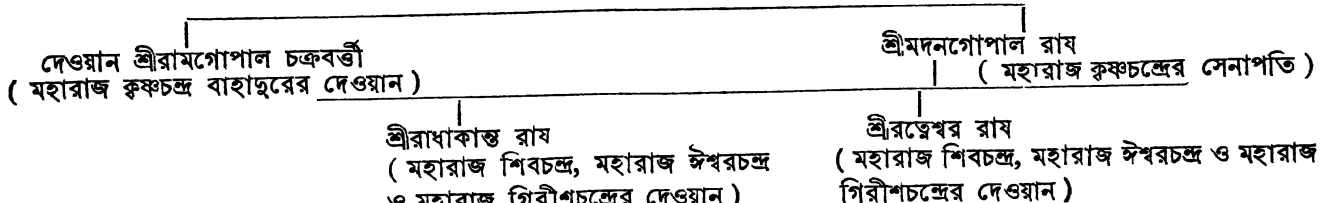
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

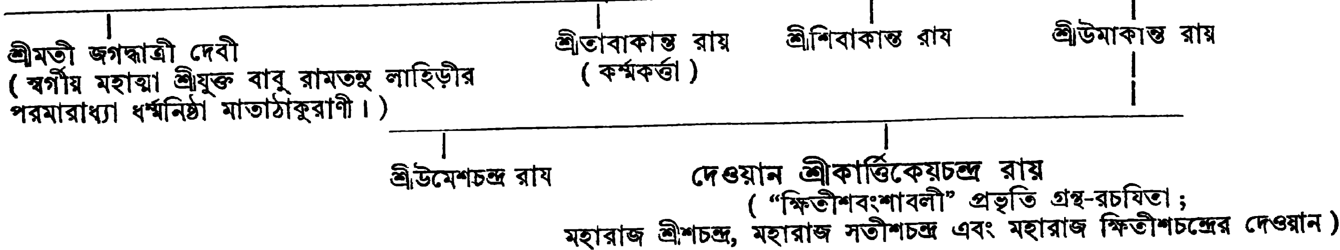
সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের দেওয়ান চক্রবর্ত্তীদিগের
বংশলতিকা









মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের

আত্ম-জীবনচরিত



প্রথম পরিচ্ছেদ

এই নবদ্বীপের রাজাদের (অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির) বংশের ইতিহাসের সহিত আমার পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস এত জড়ীভূত আছে যে, তাঁহাদের বংশের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ মধ্যে মধ্যে বিবৃত না করিলে আমার বংশের সমস্ত অবস্থা জানা যায় না। এ কারণ তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত স্থানে স্থানে নিবেশিত করিতে হইয়াছে।

আমার পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত গুরুজনের প্রমুখাৎ এইমাত্র শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহারা বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী ও ভূস্বামী ছিলেন। কিন্তু কোন্ পরগণায় কোন্ গ্রামে বাস করিতেন, তাহা শুনি নাই, অথবা স্মরণ নাই, এবং বংশের অতি প্রাচীনদিগের অভাবে ইহা আর এক্ষণে জানিবারও উপায় নাই। ইহারা এই নবদ্বীপের বর্ত্তমান রাজাদের পূর্ব্বপুরুষদের সংসারে থাকিতেন। দিল্লীর সম্রাট আকবরসাহ উক্ত বংশোদ্ভব কাকদির জমিদার কাশীনাথ রায়ের কোন অপরাধ শুনিয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে সৈন্য পাঠানতে কাশীনাথ পলায়ন করিয়া এই দেশে আইসেন এবং আন্দুলিয়া গ্রামের নিকট রাজসৈন্য কর্ত্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইলে তদীয় গর্ভবতী পত্নী এই জেলার অন্তর্গত বাগোওয়ানের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লন, এবং এক পুত্র প্রসব করেন। হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান বশতঃ ঐ নবকুমারকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, এবং তাঁহার নাম রামচন্দ্র রাখেন। আর পরিশেষে ঐ নন্দনকে স্বীয় সম্পত্তির ও পদবীর উত্তরাধিকারী করিয়া যান। সে সময় আমার তৎকালীন পূর্ব্বপুরুষেরাও এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ করেন।

রামচন্দ্রের পুত্র ভবানন্দ, ঘটনাক্রমে রাজা মানসিংহের অনুগ্রহে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে, এ প্রদেশে কয়েকখানি পরগণার জমিদারী পাইলে, বাগোওয়ান হইতে আসিয়া মাটিয়ারিতে বাস করেন। আমার তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষও তথায় উপনিবেশিত হন। (১) ভবানন্দের পুত্র ও পৌত্রেব সময় তাঁহাদের সংসারে আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ চিরদিন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি, এবং যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্য কোন দেওয়ান বংশের কথা শ্রুতিগোচর হয় না, তখন কেবল আমার পূর্ব্বপুরুষেরা যে ভবানন্দের সময় হইতে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত ছয়পুরুষের একাদিক্রমে দেওয়ান ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ বোধ হয় না।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় প্রথমতঃ ভালুকার কৃপারাম সিংহ ও তৎপরে বিখ্যাত রঘুনন্দন মিত্র দেওয়ান হন। মিত্র দেওয়ানের পরে কৃপা-রামের পুত্র কালীপ্রসাদ সিংহ দেওয়ানী পদ পান। ভারতচন্দ্র-রচিত অন্নদামঙ্গলে সভাবর্ণনা স্থলে রঘুনন্দন মালের দেওয়ান, আমার প্রপিতামহ মদনগোপাল রায় বকশী সেনাপতি এবং তদীয় অগ্রজ রামগোপাল চক্রবর্ত্তী সহবতের দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২)

এই রাজসংসারে মালের দেওয়ানী, সহবতের দেওয়ানী এবং রায় বকশী এই তিন প্রধান পদ ছিল। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া আমাদের বংশ এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমার প্রপিতামহ রায় বকশী পদাভিষিক্ত হওয়া অবধি তাঁহার অধস্তন পুরুষদের রায় উপাধি হইয়া রহিয়াছে। পিতামহ দেওয়ান হইলে তাঁহার রায় দেওয়ান উপাধি হয়। তদীয় পিতৃব্য রামগোপাল চক্রবর্ত্তীর বংশীয়দের পদবী চক্রবর্ত্তীই আছে।

আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন্ জন কোন্ রাজার সময় দেওয়ান ছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন পাই নাই। তবে ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র

---

(১) আমার জ্ঞাতির মধ্যে একজনের বংশ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

(২) চক্রবর্ত্তী গোপাল দেওয়ান সহবতী। রায় বকশী মদনগোপাল মহামতি।

রামরাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানীপদে নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও রামরাম চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পর রাজা শিবচন্দ্রের, ঈশ্বরচন্দ্রের ও গিরিশচন্দ্রের সময় কখন আমার পিতামহ রাধাকান্ত রায় ও তাঁহার অনুজ রত্নেশ্বর রায়, কখন কালীপ্রসাদ সিংহের বংশোদ্ভব ব্যক্তি ও কখন অন্য কেহ কেহ দেওয়ান হইয়াছিলেন।

আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই রাজাদের অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন, এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের ন্যায় সমাদৃত ও সম্ভাষিত হইতেন। যদি কোন সম্পত্তি বিনামী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইত, তবে রাজা ইঁহাদের নামেই রাখিতেন। এক্ষণে এই রাজাদের যে সকল জমিদারী আছে, তাহার মধ্যে প্রায় সমস্তই আমার খুল্লপিতামহ রত্নেশ্বরের নামে বহুকাল বিনামী ছিল। তাঁহার প্রতি এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, যখন তরফ মহতপুর, ডিহি কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ডিহি বাগরালি এবং ডিহি পাঁচপোতা পত্তনী দিবার প্রয়োজন হইল, তখন তিনিই পত্তনী পাট্টায় দস্তখত করিলেন, এবং পত্তনীদারগণও তাঁহার নিকটেই পত্তনী কবুলতি প্রদান করিল। সেই সকল পাট্টা ও কবুলতী অদ্যাপি স্থিরতর রহিয়াছে।

বহুকালাবধি আমাদের একদিকে যেমন পদসংক্রান্ত মান আছে, অন্যদিকে তেমনই বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করাতে গতকর্ত্তার বংশ বলিয়া আমাদের সম্মান রহিয়াছে। রোহেলা পটির মধ্যে মমিনপুর নামে যে এক মত আছে, ঐ মতস্থ কুলীনদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ ছয় জনকে নির্ব্বাচন করিয়া এই মতের সৃষ্টি হয়, তজ্জন্যে ইহারা কুলীন শ্রোত্রিয় ছয়ঘরিয়া মতাবলম্বী বলিয়া খ্যাত হন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বিস্তর নিষ্কর ভূমি তালুক ইত্যাদি ছিল, তদনুরূপ সৎক্রিয়াশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত হইতেন এবং বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের বংশের বাৎস্যব গোত্র, কুতব শাখা, পঞ্চপ্রবর ও সপ্তামনি গাঁই। আমার পিতামহের তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ তারাকান্ত,

মধ্যম শিবাকান্ত, কনিষ্ঠ উমাকান্ত। কন্যা সকলের জ্যেষ্ঠা, ইহার নাম জগদ্ধাত্রী। পিতামহের প্রথমা স্ত্রীর নিঃসন্তানাবস্থায় মৃত্যু হয়। এই সকল দ্বিতীয়াপক্ষের স্ত্রীর সন্তান। পিতামহী কৃষ্ণনগরের চৌধুরীর কন্যা, চৌধুরীদিগের সহিত আমাদের এই প্রথম সম্বন্ধ।

আমি উমাকান্ত রায় মহাশয়ের পুত্র। ১২২৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির রাত্রে আমি ভূমিষ্ঠ হই। আমার পিতার প্রথমে এক পুত্র ও তৎপরে তিন কন্যা জন্মে। উপর্য্যুপরি তিন কন্যার পরে পুত্র জন্মিলে দীর্ঘায়ু হয় না, এ দেশস্থ লোকের এই সংস্কার আছে। এই পুত্রের তুরদৃষ্ট দূরীকরণ নিমিত্ত জনকজননী বিবিধ প্রকার দৈবকর্ম্ম করিয়া থাকেন। আমার কল্যাণার্থ প্রস্মৃতি অন্যান্য ক্রিয়ার অতিরিক্ত একটি বাড়তি শিবপূজা প্রত্যহ করিতেন, এবং আমার কোন পীড়া হইলে যারপরনাই চিন্তাকুলা হইতেন। এ প্রদেশের তদানীন্তন নিয়মানুসারে পঞ্চমবর্ষে আমার হাতেখড়ি হয়। তালপত্রে, কদলি-পত্রে ও কাগজে যাহা যাহা লিখিয়া শিখিতে হয় তাহা শিক্ষা করি। পিতাঠাকুরের নিকটেই এই সকল বিষয়ের অধিকাংশ অভ্যাস করিয়াছিলাম। কোন পাঠশালায় কখনও যাইতে হয় নাই। কিছুদিনের জন্য একজন গুরুমহাশয় আমাদের বাটীতে ছিলেন এবং তিনি শিক্ষা প্রদান করিতেন। কখন কখন আমাদের কর্ম্মচারিরাও শিক্ষা দিতেন। দিবসে লিখিতাম, রাত্রিতে নামতা পড়িতাম। সন্ধ্যার পর কখন কখন পিতৃদেব আমাদের বংশাবলী, শ্রেণী, গাঁই, গোত্র, বেদ, শাখা, প্রবর, আমরা কাহার সন্তান, কত দিবসের ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বিষয়সকল শিখাইতেন।

যদিও আপনাদের বংশাবলী গাঁই গোত্র ইত্যাদি শিখিতে কিছুই সময় ব্যয়িত হয় না তথাপি নিষ্প্রয়োজনবোধে এ সকল বিষয়ের শিক্ষা ইদানীং একেকালে উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে জিজ্ঞাসিত হইলে যদি কোন বালক স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের নাম-কীর্ত্তনে অশক্ত হইত তবে তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না। ইদানীন্তন বালকের কথা সুদূরপরাহত, যুবকদের মধ্যেও অনেকে আপনাদের প্রপিতামহ বা মাতামহের নাম জ্ঞাত নহেন, এবং এ বিষয়ে অজ্ঞতা

প্রকাশে লজ্জিত হন না। অনেকে আপনার জন্মদিনের স্মরণ রাখেন না। ইউরোপের অনেক বংশের ইতিবৃত্ত বলিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের বংশবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে নিরুত্তর থাকেন।

আমাদের পূর্ব্বতন জনগণ যে কোন বিদ্যা শিখিতেন না কেবল এই সকল বিষয় শিখিয়া রাখিতেন, এরূপ নহে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাজ্যোতিতে জগন্মণ্ডল আলো কবিয়া গিয়াছেন, অথচ এ সকল শিক্ষা অনাবশ্যক বোধ করেন নাই, এবং আপন সন্তানদিগকে এরূপ শিক্ষাপ্রদানে বিরত হন নাই।

যদি এ মহীমণ্ডলে কাহার বংশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে নিজ বংশের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য হয়। আপনার বংশবৃত্তান্ত জানা থাকিলে বিস্তর উপকার আছে। উন্নত বংশোদ্ভবগণ পূর্ব্বপুরুষের চরিতাবলী অবগত থাকিলে উচ্চ থাকিবার যত্ন করিবেন, এবং অবনত বংশোদ্ভূত জনেরা পূর্ব্বপুরুষের হীনাবস্থা স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে উন্নত করিবার প্রয়াস পাইবেন। বিভিন্ন বংশের সহিত যতই কেন বন্ধুতা হউক না, শোণিতসম্বন্ধবশতঃ নিজ বংশের ব্যক্তির সহিত তদপেক্ষা অধিক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যখন বিদেশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা স্বদেশীয় ব্যক্তি আমাদের অধিক প্রিয় হন, তখন আপন বংশোদ্ভূত জনের সহিত অন্য বংশোদ্ভব জন অপেক্ষা অধিক স্নেহভাব জন্মিবে, তাহার সন্দেহ কি? দেখা যায়, বিদেশে হঠাৎ কোন স্বদেশীয় ব্যক্তির সন্দর্শন হইলে হৃদয়ে কতই আনন্দ উদয় হয়। আবার যদি পরস্পরের পরিচয়ে সে ব্যক্তি স্বসম্পর্কীয় জানা যায়, তাহা হইলে সে আনন্দ আরও কত বৃদ্ধি হইয়া উঠে। স্বদেশীয় ব্যক্তি যেমন সহজে জানা যায়, তাহার পরিচয় না জানিলে তিনি স্বসম্পর্কীয় কি না তাহা তেমন জানা যায় না। কিন্তু আপনাপন বংশাবলী অজ্ঞাত থাকিলে সেই সুখের পরিচয়ের সম্ভাবনা কি? যদি আমি আপন প্রপিতামহের নাম অজ্ঞাত থাকি এবং আমার জ্ঞাতিও তাঁহার প্রপিতামহের নাম অনবগত থাকেন, তবে উভয়ের যে এক প্রপিতামহ, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইবে? দেখ, আমরা উভয়েই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকাতে, আমাদের যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা

কিছুই জানিতে পারা গেল না, এবং পরস্পরের যে আনন্দ হইত অথবা কোন প্রয়োজন থাকিলে তাহা সিদ্ধ হইত তাহা ঘটিল না।

শ্রেণী গাঁই গোত্র ইত্যাদিও বংশের পরিচয় বিশেষ। একরূপ নাম অনেকের থাকিতে পারে, সুতরাং শুদ্ধ পূর্ব্বপুরুষের নামোল্লেখ হইলেই উভয়ই এক বংশোদ্ভূত কিনা, তাহা জানিতে পারা যায় না। যদি নামের সঙ্গে গাঁই গোত্র ইত্যাদি মিলিয়া যায়, তবেই উভয় যে একের সন্তান, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। আমি দেখিয়াছি যে আমার গুরুজনেরা প্রতিবেশী ভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরও পূর্ব্বপুরুষের নাম কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন যুবা অপরিচিত থাকিলে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ইহার উত্তর পাইবামাত্র তাহার পিতামহ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে কতই সুখী করিতেন, এবং তাহার সুখে আপনারাও সুখী হইতেন। এক্ষণে আমরা সভ্যতাভিমানী হইয়া এইরূপ অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি।

বিদ্যারম্ভ—গুরুমহাশয়

তৎকালে প্রায় সকল ভদ্র গ্রামেই একজন গুরুমহাশয়ের পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামের ভিন্ন পাড়ায় এক পাঠশালা ছিল। কিন্তু আমাদের পাড়ায় ইহা ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। কেবল এইমাত্র স্মরণ হয়, যেন কিছুদিনের জন্য একবার একজন গুরুমহাশয় আমাদের বাটীতে ছিলেন। আমাদের বাটীর সকল বালকেই গুরুজনের অথবা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীর নিকট বাঙ্গালা লেখাপড়া করিত। বোধ হয়, আমরা কর্ত্তাদের সহিত কখন নীলকুঠীতে কখন গোলাবাটীতে থাকিতাম বলিয়া অথবা শৈশবাবস্থায়ই পারস্য-ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন বোধ হইত না।

তদানীন্তন গুরুমহাশয়দের যেরূপ বিগর্হিত আচরণ এবং শিক্ষা দিবার যেরূপ জঘন্য নিয়ম ছিল, তাহা ইদানীন্তন যুবকবৃন্দের সহজে বিশ্বাস্য হইবার নয়। তাঁহাদের পাঠশালায় বালবুদ্ধিসুলভ কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না এবং কোন নীতিগর্ভ মিষ্ট গল্প বালকের কর্ণগোচর

হইত না। কেবল ক্রোড়ে তালপত্র বা কদলীপত্র, সর্ব্বাঙ্গে মসীরেখা এবং গুরুমহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তের বেত্র দৃষ্ট হইত। আর "পড়ে পড়ে ল্যাখ, তুই বেটা বড় হারামজাদা" এইরূপ কর্কশধ্বনি মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। প্রথমে এই সকল দর্শনে ও শ্রবণে শিশুর কোমল হৃদয় কম্পিত হইতে থাকিত, তাহার পর বিদ্যা আরম্ভ হইলে নীরস ও কঠিন অঙ্ক অভ্যাসে মন দিতে হইত। ইহার উপর আবার গুরুমহাশয়ের নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ব্যথিতহৃদয় করিত। কোন বিষয় ছাত্রের বোধগম্য করিয়া দিবার জন্য গুরুমহাশয় কোমল ভাব অবলম্বন করিতেন না। বালক শিক্ষাবিষয় বুঝিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন, এবং কখন কখন তাহার সুকুমার শরীরে প্রহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কেহ কাহাকে পীড়া দিলে পীড়িত ব্যক্তি তাহার প্রতীকারের জন্য আত্মীয়স্বজনের নিকট ক্রন্দন করে। আত্মীয়েরা নিজে অক্ষম হইলে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হয়। যদি রাজপদাতিকও কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে থাকে, তাহাকেও উদ্ধার করিবার নিমিত্ত লোক কখন কখন ধাবিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বালককে যখন বলবান্ ছাত্রগণ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত, তখন কেহই তাহার সহায় হইত না, বরং উৎসাহ প্রদান করিত। গুরুমহাশয় বালককে যতই পীড়ন করুন না কেন, গুরুজন তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেন না। সুতরাং ছাত্রেরা গুরুমহাশয়কে যমস্বরূপ জ্ঞান করিত। কোন কোন বালক পাঠশালা হইতে পলায়নকালে ব্যাঘ্র, সর্প, ভূত, প্রেত কিছুরই ভয় করিত না।

আমার সমবয়স্ক স্বসম্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরের চৌধুরী-দিগের বাটীর পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। ঐ পাঠশালার গুরুমহাশয় বর্দ্ধমান-অঞ্চল-নিবাসী এবং কায়স্থজাতীয় ছিলেন। তাঁহাকে যে বালক কিছু খাদ্যদ্রব্য দিতে পারিত, তাহার প্রতি সদয় থাকিতেন, এবং তাহার অনুপস্থিতি বা শিক্ষায় অমনোযোগ জন্য কোন শাস্তি পাইতে হইত না। আমার এক সুচতুর বাল্যসখা তাঁহার পাঠশালার ছাত্র ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার মাতুলালয়ে আসিয়া ২।৪ দিন

থাকিতেন। প্রতিগমনকালে আমাদের এক প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট বিল্ববৃক্ষ হইতে দুই একটি বেল পাড়িয়া গুরুমহাশয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতেন, মহাশয়! আপনার নিমিত্ত দুইটি উত্তম বেল আনিয়াছি। তিনি আহ্লাদ প্রকাশিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি এ কয়েক দিন কেন আইস নাই? বালক উত্তর করিতেন, মামার বাটী যাইয়া আমার জ্বর হইয়াছিল। ইনি যখনই অনুপস্থিত থাকিতেন, তখনই এইরূপে গুরুমহাশয়ের রাগের শান্তি করিতেন। কখন তিরস্কৃত বা প্রহারিত হয়েন নাই। এই পাঠশালায় আমার এক পিস্‌তুত ভ্রাতা ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্ব্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে পলাইয়া আমাদের বাটীতে আসিতেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের দূতেরা গুপ্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার অনুপায় দেখিয়া একদা এক বারোওয়ারী-ঘরে মাচার উপর অনাহারে এক দিবা ও এক রাত্রি থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের ক্ষেত্রমধ্যে রজনী যাপন করেন। ঐ গুরুমহাশয় চৌধুরী-বাটীর এক বালকের গণ্ডদেশে এরূপ বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন তাঁহার যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বয়স ৫ হইতে ১২ বৎসর

তৎকালে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত আট দশ ক্রোশের বহির্দ্দেশে ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও কেরাণীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কর্ম্ম মফঃস্বলে দৃষ্ট হইত না; এবং এই সকল পদের বেতন বা মান অধিক ছিল না। দেশের সমস্ত জেলার রাজকার্য্য পারস্য ভাষায় নির্ব্বাহ হইত। সে সকল পদের বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাভ হইত, এবং পদেরও গৌরব বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফঃস্বলের প্রধান পরিবারেরা আপন আপন সন্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা না দিয়া পারস্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দুস্থানীয় লালা শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তিন টাকা বেতন পাইতেন ও বাটীতে আহারাদি করিতেন। আমি ও আমার পিতৃব্য-পুত্র মধুসূদন রায় তাঁহার নিকট পাঠারম্ভ করি। মধুসূদনকে আমি মধ্যম দাদা বলিয়া ডাকিতাম, এবং এক্ষণেও বলিয়া থাকি। কিয়ৎ-কালানন্তর শিক্ষকের সুরাসক্তি-দোষ প্রকাশ হইল। তৎকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ণনগরের আর কোন স্থানে মদিরা প্রস্তুত বা বিক্রীত হইত না।

তিনি প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ঐ বাজার হইতে মদ্যপান করিয়া যাইতেন, এবং কখন সামান্য দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। এ কারণে গুরুজনেরা তাঁহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করিলেন।

এ ওস্তাদের পান-দোষ ছিল না বটে, কিন্তু বিষম দোষান্তর প্রকাশ হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা বেতন পাইতেন। এবং ভাণ্ডার হইতে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য আমাদের দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। নিবারণ রায় নামক একটি প্রতিবেশী বালক আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার উপনয়ন উপস্থিত হইলে আমার অজ্ঞাতসারে মধ্যম দাদার ও ঐ বালকের সহিত পরামর্শ স্থির হয় যে, উপনয়নের লব্ধ ভিক্ষার টাকা হইতে মধ্যম দাদার দ্বারা ৫৲ টাকা ওস্তাদের নিকট পাঠাইবেন। নির্দ্ধারিত দিবসে মধ্যম দাদা উপস্থিত হইলে নিবারণ কহিলেন যে, বাক্সের চাবি পিতার নিকট আছে। দাদামহাশয় আপন চাবি দ্বারা বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া ওস্তাদকে দিলেন। পরদিবস বালকের পিতা বাক্সের মধ্যে টাকার সংখ্যা ন্যূন দেখিয়া বালককে তাড়না করাতে, তিনি ইহার প্রকৃত অবস্থা পিতাকে জ্ঞাপন করিলেন। পিতা আমাদের কর্ত্তৃপক্ষকে বিদিত করিলেন ও মধ্যম দাদাও অপহরণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং ওস্তাদকে দূরীভূত করা হইল।

তদনন্তর ক্রমান্বয়ে আর দুই ওস্তাদ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের দোষ-গুণের কথা স্মরণ নাই। প্রাতঃকাল অবধি বেলা দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ও তৃতীয় প্রহর হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ওস্তাদের গৃহে থাকিয়া পড়িতে হইত, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে একখানি পুস্তকেরও পাঠ সমাপ্ত হয় নাই। এই দুই ওস্তাদ আপনারাই বিদায় হন, কি কর্ত্তারা তাঁহাদিগকে বিদায় করেন, তাহা স্মরণ হয় না।

পঞ্চম ওস্তাদের সময় আমার অগ্রজের বিবাহ উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণভোজনের জন্য নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইল। ওস্তাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। মধ্যম দাদা ভাণ্ডার-গৃহের জানালা দিয়া খাদ্যদ্রব্য আমার হস্তে দিতেন, আমি তাহা ওস্তাদের গৃহে পৌঁছিয়া দিতাম। বিবাহের তিন চারি দিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে ভাণ্ডার হইতে কোন কোন দ্রব্য চুরি করিয়া আনিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইলাম। আমি দ্রব্যজাত সহিত প্রত্যাগত হইলে দেখিলাম, ওস্তাদজি মহা-আনন্দে মধ্যম দাদার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, অদ্য আর পড়িতে হইবে না, তোমাদিগকে ছুটি দিলাম। ওস্তাদজিকে সদয় দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কিন্তু তাঁহার এতাধিক সদয় হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহের পর তৃতীয় দিবসের প্রাতে মধ্যম দাদা কর্ত্তা-দিগকে কহিলেন যে, "ওস্তাদজি আমাকে কহিয়াছিলেন যে, (বিবাহের পরদিবস যখন পাত্রপাত্রীকে বরণকরণার্থ সমারোহ হইবেক, তখন তুমি তোমার ভাইয়ের গলা হইতে স্বর্ণহার খুলিয়া আমাকে আনিয়া দিবে।) আমি ভয়ে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে পারি নাই। কল্য রাত্রিতে তিনি আমাকে অত্যন্ত তাড়না করিয়াছেন। অদ্য তাঁহার ঘরে যাইলেই কোন ছলে আমাকে পীড়ন করিবেন। অতএব তাঁহার ঘরে যাইয়া পড়িবার সাহস হইতেছে না।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণে কর্ত্তারা কি করিবেন ভাবিতেছেন ; এমত সময় ওস্তাদ আসিয়া আমাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "আমার ঘরের এঁটো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" ওস্তাদের বাসের নিমিত্ত একখানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল। তাহার একাংশে তিনি রন্ধন

ও ভোজন করিতেন, অপরাংশে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া আমরা পড়িতাম। উভয়াংশের মধ্যে একটি সামান্য আবরণ ছিল। যে অংশে আমরা বসিতাম, তাহা উচ্ছিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং আমার ঘরের এঁটো সাফ করিয়াছি, তোমরা আমার সঙ্গে আইস,—"শিবের মন্দিরে কে, আমি কলা খাই নাই";—সেইরূপ অসঙ্গত কথাতে, মধ্যম দাদার বাক্য সত্য জ্ঞান হইল। ওস্তাদের এ কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; যেহেতুক তৎকালে শুদ্ধা-শুদ্ধের বিষয়ে আমাদের কোন বিশেষ জ্ঞান হয় নাই। যাহা হউক, ওস্তাদজি বিদায় হইলেন; এবং আমরাও আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

বোধ হয়, ১২৩৭ বঙ্গাব্দে উপরি উক্ত ঘটনা হইয়াছিল। এই বৎসর আমার উপনয়ন হয়। তখন আমার বয়স ১১ বৎসর। ইদানীং যে যজ্ঞসূত্র যুবকেরা অশ্রদ্ধা বা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ত্যাগ করিতেছেন, সেই যজ্ঞসূত্রের জন্য তদানীন্তন বালকেরা লালায়িত হইত, এবং অদ্যাপি অনেক বালক হইয়া থাকে। গতবর্ষে আমার উপ-নয়নের দিন স্থির হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাগর্জ্জন হওয়াতে উহা ঘটে নাই। এই দুর্ঘটনাতে আমি কতই দুঃখিত হইয়াছিলাম, এবং মাতাঠাকুরাণীকে, ক্রন্দন করিয়া কতই জ্বালাতন করিয়াছিলাম। এই উপলক্ষে আমার জন্য একজোড়া হরিদ্রাবর্ণের কার্পাসবস্ত্র আনীত হইয়াছিল। উপনয়ন না ঘটাতে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইল। এই বস্ত্র ফেরৎ দেওয়াতে আমার যতদূর দুঃখ হইয়াছিল, বোধ হয়, ব্রাহ্মণ হইতে না পারাতে তত দুঃখ হয় নাই।

আহা! দেশের কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। পূর্ব্বসুগঠিত দ্রব্য ভগ্ন হইল, অথচ তৎপরিবর্ত্তে কোন উত্তম দ্রব্য পুনর্নির্ম্মিত হইল না। অতি প্রাচীন কালে উপবীত না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হইত না বলিয়া বালককে উপবীত ধারণ করাইয়া উপযুক্ত গুরুসন্নিধানে প্রেরণ করা হইত, এবং বালক যথোচিত পাঠসমাপনান্তে পিতৃনিকেতনে প্রত্যাগত হইত। এ বিষয় বহুকালাবধি এ দেশস্থ লোকের চিন্তাতীত হইয়াছে। ইদানীং কেবল ব্রাহ্মণ হইবার জন্য যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন, ইহাই সকলের বোধ আছে। কিন্তু কি কি গুণযুক্ত হইলে

ব্রাহ্মণ নাম ধারণের উপযুক্ত হওয়া যায়, তাহার বিচার-চক্ষু এককালে অন্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বকালের জ্ঞানলাভের জন্য যে উপনয়নের প্রয়োজন হইত, তাহা এই কালে কেবল ঠাকুরপূজা করিবার ও ফলাহার লাভের নিমিত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিলে বালকের মনে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ উপবীত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উঠিব, এই ভাবিয়া, বালকের হৃদয়ে আহ্লাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কর্ত্তাদের মুসলমান শিক্ষকের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবাতে, একজন কায়স্থজাতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তিনি অতি শান্তস্বভাব ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি সতত সদয় থাকিতেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত আমাকে কখন কখন কহিতেন যে, "তুমি অধিক দুগ্ধ পান করিতে পাও বলিয়া এত গৌরাঙ্গ হইয়াছ, যদি আমি অন্ততঃ এক পোয়াও পাই, তথাপি গৌরবর্ণ হইতে পারি।" এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকের নিকট যেরূপ শিক্ষা হইল, তাহা লেখা বাহুল্য। এক বৎসর পরেই তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত এক যোগ্যতর মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। যত দিন আমি বাঙ্গালা লেখাপড়া করিতাম, তত দিন প্রায়ই পিতার সহিত তাঁতিমা গ্রামের গোলাবাটীতে থাকিতাম। তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিতাম, অথচ তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি কখন আমাকে সঙ্গে না লইতেন, তবে নিরন্তর কাঁদিয়া মাতাঠাকুরাণীকে অস্থির করিয়া দিতাম। সুতরাং তিনি আমাকে পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। এই গোলাবাটী অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল, এবং তথায় কৃষিকার্য্যও বাহুল্য পরিমাণে চলিত।

পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় এই বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি রাজবাটীর আমিনী-পদে নিযুক্ত হইলে পিতাঠাকুর এই গোলা-বাটীর কারবারের ও কৃষিকার্য্যের অভিভাবকতা করিতেন। মধ্যমতাত মহাশয় আমাদের শাঁকদহ ও ভগবানপুর নামে যে দুই দরপত্তনি তালুক ছিল ও তাহাতে যে নীলকুঠী ছিল, তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিতেন।

আমার পারস্যবিদ্যারম্ভ করণের দুই বৎসর পরে ওস্তাদের সহিত উক্ত কুঠীতে বৎসরের কিয়দংশ কাটাইতাম। বাটী থাকিলে পাছে কেবল খেলা করিয়া বেড়াই, এই জন্য আমাদিগকে কুঠী লইয়া যাওয়া হইত। ঐ দুই তালুকে ইতর জাতি ব্যতীত ভদ্রলোকের বসতি ছিল না। সুতরাং প্রতিবাসী কোন বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইত না ; দিবারাত্রি বন্দীর ন্যায় কুঠীতে বদ্ধ থাকিতাম। পলদীবিলের উভয় পার্শ্বে এই দুই গ্রাম অবস্থিত। বিলের ধারে এই কুঠী ছিল, এবং তাহার সম্মুখে এক বিস্তৃত মাঠ দৃষ্ট হইত। যখন বর্ষাকালে এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে নবীন শ্যামল ধান্যবৃক্ষরাজি শোভা পাইত ও যখন পবন-হিল্লোলে এই সকল নৃত্য করিতে থাকিত, তখন কি মনোহর সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হইত। অথবা শীতকালে যখন ঐ মাঠ সর্ষপবৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত হইত, তখন কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিত। বোধ হইত, যেন সমস্ত ক্ষেত্রে স্বর্ণবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে। কিন্তু কি উত্তালতরঙ্গ-মালাসঙ্কুল সাগর সন্নিধানে, কি অত্যুচ্চ শোভনীয় শৈলশৃঙ্গে, কি বিশাল বৃক্ষ-পূর্ণ রমণীয় গহনকাননে, কি অমরাপুরীসম অতি মনোহর নগরে, কোন স্থানেই বন্দীর সুখানুভব হয় না। আমরা একে বালক, তাহাতে বন্দীর ন্যায় অবস্থিত, সুতরাং আমাদের এ সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা কি ছিল, আমরা বাল্য-সখাদের সহবাস-সুখে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বদাই অসুখে কাল যাপন করিতাম। কত দিনে আবার তাহাদের সঙ্গে সুখ ভোগ করিব, ইহাই ভাবিয়া ম্রিয়মাণ থাকিতাম। একে পাঠ্যপুস্তক আমাদের বুদ্ধির নিতান্ত অগম্য, তাহার উপর আবার শিক্ষকের অপ্রীতিকর ব্যবহার ছিল। সুতরাং যতক্ষণ ওস্তাদ সমীপে থাকিতাম, ততক্ষণ যে আমাদের কি কষ্টে যাইত তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রথমে আমরা সেখ মসলহার্দ্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশপুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতিক্ষুদ্র ও অতি সরল ভাষায় লিখিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বর-বন্দনা, ২য় অধ্যায়ে আত্মোপদেশ, ৩য় অধ্যায়ে দয়ার মাহাত্ম্য, ৪র্থ অধ্যায়ে দানের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে কৃপণতার দোষ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে নম্রতার গুণ, ৭ম অধ্যায়ে

অহঙ্কারের দোষ, ৮ম অধ্যায়ে বিদ্যার মহিমা, ৯ম অধ্যায়ে মূঢ়-সঙ্গত্যাগ, ১০ম অধ্যায়ে সুবিচার, ১১শ অধ্যায়ে দৌরাত্ম্যের নিন্দা, ১২শ অধ্যায়ে সন্তোষের গুণ, ১৩শ অধ্যায়ে লোভের দোষ, ১৪শ অধ্যায়ে ঈশ্বরের বশ্য থাকেন, ১৫শ অধ্যায়ে কৃতজ্ঞতা, ১৬শ অধ্যায়ে সত্যের মহিমা, ১৭শ অধ্যায়ে মিথ্যায় অযশ, ১৮শ অধ্যায়ে সংসারের অনিত্যতা, ১৯শ অধ্যায়ে সম্পদের অস্থায়িত্ব, এবং ২০শ অধ্যায়ে সংসারাসক্তির দমন কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরল ভাষায় রচিত বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনামা পারস্য বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাহাব পাঠেই বা কি লাভ হইবে? কারণ তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু-ভাষায় অর্থশিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দ-নামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না; কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুস্তিকা বাঙ্গালা অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত।

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদীর বিরচিত গোলেস্তাঁ অর্থাৎ গোলাপ-ফুল-কানন নামে গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। এইখানি গদ্যে পদ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপক্রমণিকার আরম্ভ পারস্যরীত্যনুসারে প্রথমে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন, তৎপরে মহম্মদ ও পয়গম্বরের মাহাত্ম্য কথন, তদনন্তর স্বদেশের রাজার যশঃ কীর্ত্তন হইয়াছে। তাহার পর রচয়িতা এই গ্রন্থ-রচনার এইরূপ কারণ লিখিয়াছেন যে, সংসারে লিপ্ত থাকিলে নানাবিধ পাপে মুগ্ধ হইতে হয়, অতএব নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ঈশ্বর-আরাধনায় জীবন-যাপন করিব, একদা এই মনে ভাবিয়া গৃহাভ্যন্তরে পরমেশ্বরের চিন্তায় চিত্তার্পণ করিলাম। কিছু দিন পরে আমার এক পরম প্রিয়তর বান্ধব আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে অস্মদের

মানসিক অবস্থা ও প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করে। তিনি পূর্ব্বসখ্যের বলে তাহাদের নিষেধ না মানিয়া আমার সন্নিহিত হইলেন, এবং এইরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন যে, কেবল আত্মোপকার লাভে মন নিবিষ্ট করা তোমার ন্যায় পণ্ডিতবরের উচিত হয় না। যাহাতে অন্যের উপকার হয় তদ্বিষয়ে তোমার চিত্ত সংযোগ করা কর্ত্তব্য। তোমার মৌন হইয়া থাকা কোনও মতেই বিধেয় হয় না।

কহিবার শক্তি তব আছে হে এখন,
আনন্দে করহ ভ্রাতা কথোপকথন।
কল্য যবে যমদূত উপনীত হবে,
কঠিন আদেশে তার বাক্যহীন রবে।

বন্ধুর এই কথা শ্রবণে আমার যেন চক্ষুরুন্মীলন হইল। আমি তাঁহার হৃদয়-গত ভাবানুসারে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থ অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে রাজচরিত্র, ২য় অধ্যায়ে ফকিরের কর্ত্তব্য, ৩য় অধ্যায়ে সন্তোষের উৎকর্ষ, ৪র্থ অধ্যায়ে মৌনাবলম্বনের গুণ, ৫ম অধ্যায়ে যৌবন ও প্রেম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃদ্ধাবস্থা, ৭ম অধ্যায়ে বিদ্যাশিক্ষাব গুণ, এবং ৮ম অধ্যায়ে জীবনযাপনের সুপ্রণালী অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে আমবা এই গ্রন্থেরও আবৃত্তি করিতে থাকি।

পবে এক অধ্যায় পাঠ হইলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থসহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থকর্ত্তার বিরচিত বুস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্যপুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। এই গ্রন্থসূচনার এইরূপ কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আমি পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, এবং বহু ব্যক্তির সংসর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনকালে আত্মীয়স্বজনের নিমিত্ত কি মিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাই, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, বাক্যের অপেক্ষা কিছুই মিষ্টতর দ্রব্য নাই। অতএব তাঁহাদিগকে উপহার দিবার জন্য এই বুস্তাঁগ্রন্থ রচনা করিলাম।

বুস্তাঁ দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে প্রজাপালনার্থে বিচার,

উদ্যোগ, বিবেচনা, প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মভয়; ২য় অধ্যায়ে ধনবানের সুখসচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা; ৩য় অধ্যায়ে স্বাভাবিক প্রেম; ৪র্থ অধ্যায়ে বিনয়; ৫ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর; ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে সন্তোষ; ৭ম অধ্যায়ে জ্ঞানার্জ্জন; ৮ম অধ্যায়ে স্বাস্থ্য জন্য কৃতজ্ঞতা; ৯ম অধ্যায়ে অনুতাপ ও সৎপথাবলম্বন; ১০ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের উপাসনা। গোলেস্তাঁর ন্যায় এই কয়েক অধ্যায়েও গল্প উপলক্ষে বিবিধ সদুপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণীর পাঠোপযোগী; তথাপি এই দুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতিশিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উর্দ্দু ভাষাও বালকের বোধগম্য হইত না। যাহা হউক, তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন।

বালকেরা গুরুজনের নিকট যে কিছু উপদেশ পাইত, এবং তাঁহাদের যেরূপ আচার ব্যবহার দেখিত, তাহাই তাহাদের নীতিশিক্ষার প্রধান পুস্তক হইত। সুতবাং গুরুজনের দৃষ্টান্তের উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রের সৃষ্টি ও স্থিতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই কারণেই তৎকালে, যে বালকের গুরুজন যেরূপ, সে সেইরূপ হইত। কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র প্রেতের ন্যায় দূষণীয় দৃষ্ট হইত। দেবভক্তি, পিতৃ মাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী স্নেহ, অপত্য স্নেহ, প্রতিবাসী ভালবাসা, অতিথিসৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ,

ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষয়সকল তাঁহাদের বিবেচনায় যৎসামান্য পাপ বলিয়া বোধ হইত।

গোলেস্তাঁ বা বুস্তাঁর কিয়দংশ পাঠ করণানন্তর আমি জামেজল কওয়ালিন, মতলুব এবং জোলেখাঁ নামে গদ্য ও পদ্য পুস্তকসকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম। একজন সুলেখক তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রথম পুস্তক তৎসমূহের সঙ্কলন। দ্বিতীয় পুস্তক প্রসিদ্ধ আবুয়ল ফজলের পিতা মুন্সী হাস্মিরের কতকগুলি পত্রের সংগ্রহ। পত্রের রচনাশিক্ষার জন্য প্রথমে এই দুই পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন হইত। তৃতীয় পুস্তক জোলেখাঁতে রাজকন্যা জোলেখাঁর ইউসফ নামে (ইয়াকুবের পুত্র জোসেফ) অদ্বিতীয় সুন্দর পুরুষের প্রেমাভিলাষের উপাখ্যান আছে। নৃপনন্দিনী অষ্টম বর্ষে ইউসফকে স্বপ্নে দেখিয়া পাগলিনী হন। রাজা নিয়োজিত উপায়সমূহ বিফল দেখিয়া শেষে তাঁহার পদে স্বর্ণ শৃঙ্খল দেন। ইউসফ পিতার প্রিয়তম হওয়াতে সহোদরেরা হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে কোন ছলে কেনান দেশের এক কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।

তথা হইতে কোন বণিক তাঁহাকে উদ্ধার কবিয়া বিক্রয়ার্থ মিসর নগবে আইসে। তৎকালে জোলেখাঁ মিসরদেশাধিপতির রাজমন্ত্রী আজিজের পত্নী হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে ইউসফের রূপদর্শনে তাঁহাকে আপনার মনচোর বলিয়া স্থির করেন। এবং বহু মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া আনেন। তাঁহার সহচরীগণ তদীয় ক্রীতদাসের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী দেখিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করে। একারণে মন্ত্রীপত্নী একদা কৌশলক্রমে তাহাদিগের কয়েকজনকে এক এক লেবু দিয়া তৎসকল বানাইতে আদেশ দেন। তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তিনি ইউসফকে তথায় আনেন। সহচরীরা তাহার অভূত-পূর্ব্ব রূপ দর্শনে এককালে মোহিতা হইয়া লেবু কাটিতে আপনাদের হস্ত ক্ষতবিক্ষত করে। যাহা হউক, জোলেখাঁ ইউসফকে যতই ভালবাসুন, আর যতই তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হউন, ইউসফের ধর্ম্ম অটল ছিল। রমণী মনোরথ পূরণে হতাশ হইয়া তাঁহাকে কোন

কৌশলে কারারুদ্ধ করেন। ইউসফ বহুকালের পর আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণপূর্ব্বক কারামুক্ত হইয়া মন্ত্রী আজিজের প্রিয়পাত্র হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মন্ত্রীপদ লাভ করেন। এদিকে জোলেখাঁ প্রেমে হতাশা হইয়া কালে বৃদ্ধা, অন্ধ এবং ভিখারিণী হন। পরিশেষে কোন অলৌকিক ঘটনায় তিনি যৌবনদশা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ইউসফের ধর্ম্মপত্নী হন।

ক্রমশঃ আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের কায়স্থ শিক্ষককে অনুপযুক্ত দেখিয়া কর্ত্তারা পুনরায় মহম্মদীয় শিক্ষক একজনকে নিযুক্ত করেন। ইঁহার গুণাগুণের বিষয় স্মরণ নাই। বোধ হয়, পূর্ব্বতন ওস্তাদগণ অপেক্ষা ভাল লোক ছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে মধ্যম দাদার বিবাহ হওয়াতে আমার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। তাঁহার ও আমার এক পাঠ ছিল। তিনি পাঠ্যপুস্তকের যে অংশ পড়িতেন, আমিও সেই অংশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়া যাইতাম। স্মরণশক্তি তাঁহার যাদৃশ ছিল, আমার তাদৃশ ছিল না। সুতরাং পাঠের অনেকাংশ আমার মনে থাকিত না। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পড়িতাম বলিয়া ওস্তাদ আমার ভুল বুঝিতে পারিতেন না। তিনি শ্বশুরালয়ে গমন করিলে আমার গুণ প্রকাশ হইয়া বিড়ম্বনার সীমা থাকিবে না, এই ভাবিয়া আমার মনে বিষম উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইল। কি উপায়ে এই বিপদ হইতে মুক্ত হইব, দিবারাত্র কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে এই স্থির করিলাম যে, পীড়ার ছল না করিলে এই দায় হইতে রক্ষা পাইব না। তাঁহার সম্ভাবিত গমনেব পূর্ব্বরাত্রিতে আমার গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগে দংশন-যন্ত্রণা হইতেছে, পিতাকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলাম। তিনি আমার যন্ত্রণা যথার্থই হইতেছে ভাবিয়া ঘাড় টিপিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার টিপনিতে আমার বেদনা অনুভব হইতে লাগিল, তথাপি যেন যাতনাব ন্যূনতা হইতেছে, এই ভাব প্রকাশার্থে আঃ! আঃ! করিতে লাগিলাম। রাত্রি অধিক হইলে নিদ্রা আসিয়া সকল চিন্তা ও যন্ত্রণার শান্তি করিল। প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পাছে বৈদ্য আসিয়া আমার শরীরের প্রকৃতাবস্থা বুঝিতে পারেন,—এই

ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যরাজ আসিলেন এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য হইয়াছে কহিলেন। ভাবিলাম, আজ ত বাঁচিলাম ; কল্য এরূপ গেলে আব কোনও চিন্তার বিষয় থাকিবে না। দিবসে অনশনে থাকিলাম। রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ ও শিরঃপীড়া ইত্যাদি জ্বরের অনেক লক্ষণ প্রকাশ হইল। বোধ হয় প্রগাঢ় চিন্তায় ও অকারণ উপবাসে এই জ্বরের আবির্ভাব হইল। পরদিবস বৈদ্য আসিয়া কহিলেন, স্পষ্ট জ্বর হইয়াছে। লোকের জ্বর ত্যাগ হইলে যেরূপ আনন্দ হয়, আমার জ্বর হওয়ায় সেইরূপ আনন্দ হইল। রোগযন্ত্রণা, অনশন ও ঔষধ-সেবন কষ্ট ইহার যে পরিণামফল হইবে, তাহা কিছুই মনে পড়িল না। উপস্থিত বিপদ হইতে যে রক্ষা পাইলাম, এই আনন্দরসে হৃদয় আর্দ্র হইতে লাগিল। তদানীন্তন সাধারণ বৈদ্যদের মনে এই স্থির ছিল যে, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা না হইলে কেহ বৈদ্যকে হাত দেখায় না। সুতরাং কেহ কৃত্রিম অসুস্থভাব ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে হাত দেখাইলেই তাঁহারা প্রায়ই কহিতেন যে, নাড়ীর কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য হইয়াছে, অদ্য আহার করিও না। বোধ হয়, তাঁহারা ভাবিতেন, একদিন অনাহারে থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি নাড়ীর চাঞ্চল্য না বলিয়া আহার করিতে বলি, আর পরে জ্বব হয়, তবে আমাকে মূর্খ চিকিৎসক কহিবে।

আমাদের বৈদ্যের নাম নসিরাম দত্ত, এবং বাস কৃষ্ণনগর। ইনি এখানে একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি আমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন ও বাটীতে পীড়া না থাকিলেও প্রায়ই একবাব আসিতেন। সে সময়ে প্রথম দিবসে জ্বরের কোন ঔষধ দেওয়া হইত না। বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থা অতি বিরল ছিল। বিরেচক ঔষধের ব্যবস্থাব প্রায় প্রথাই ছিল না। পাকস্থলীর রস পরিপাকার্থ স্ত্রীলোকেরা ইস্মূল, বিল্ববৃক্ষের ত্বক্ ইত্যাদি কয়েকটি দ্রব্য জল-সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইতেন। তৎপর দিবস হইতে পাঁচন দেওয়া হইত। যদি ৩।৪ দিবসের মধ্যে ইহাতেও জ্বর ত্যাগ না হইত তবে বৈদ্য কিঞ্চিৎ সামান্য ঔষধ দিতেন। তাহাতে যদি প্রতিকার না হইত, তবে অষ্টাহ

কবিবাজি চিকিৎসা

পরে কিঞ্চিৎ বিশেষ ঔষধের ব্যবস্থা হইত কিন্তু পাঁচনের ব্যবস্থা রহিত হইত না। যদি দ্বাদশ দিবসের মধ্যে রোগের শান্তি না হইত, অথবা অষ্টাহ পরে রোগ ভয়ানক আকার ধারণ করিত, তবে বিষ প্রয়োগ করা হইত। পীড়ার অবস্থা অনুসারে কখন অষ্টাহ মধ্যেও বিষ প্রয়োগ করা হইত। যাবৎ জ্বর থাকিত, তাবৎকাল ক্ষুধা থাকিলে শুষ্ক লাজ, পরে লাজান্ন, তৎপরে লাজমণ্ড, তৎপরে মুগের ডালের যূষ, মিষ্টান্নের মধ্যে বাতাসা ও মিছবি বা চিনি দেওয়া হইত। পানীয়ের মধ্যে কেবল সিদ্ধ জল ছিল এবং তাহাও কখন বিল্বত্বক্ দিয়া সিদ্ধ করা হইত। ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর না হইলে এরূপ পথ্য বা পানীয় দেওয়া হইত না। যে সকল চিকিৎসা আমি দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাই বর্ণন করিলাম।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর সহিত আমাদের বৈদ্যের চিকিৎসায় অনেক বিষয়ে ঐক্য আছে। উপবাস, ঔষধেব পরিমাণ ও পথ্যের নিয়ম উভয় প্রণালীতে একরূপ, কেবল আমাদের পাঁচন বাড়তি ছিল। নানা রোগের নানাপ্রকার পাঁচন ব্যবস্থা হইত। পীড়ার ন্যূনাধিক্যতানুসারে দশমূল চতুর্দ্দশ অষ্টাদশ ইত্যাদি নানাবিধ পাঁচনের ব্যবস্থা হইত। বিরেচন আবশ্যক হইলে আরকাদি পাঁচন দেওয়া হইত। চিকিৎসার প্রণালী যেরূপই হউক, তৎকালে প্রায় অষ্টাহ মধ্যে জ্বর ত্যাগ হইত। কিন্তু পিপাসায় ও ক্ষুধায় যে কষ্ট বোধ হইত, তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

তৃষ্ণা-কষ্ট

পশ্চাল্লিখিত দুইটি বিষয়ে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব্বকালীন বৈদ্য চিকিৎসায় রোগীর কি কষ্ট হইত ও কত অনিষ্ট ঘটিত। প্রায় ৬০ কি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজসংসাবে ন্যায়পঞ্চানন নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈদ্য ছিলেন। একদা তাঁহার অতি প্রবল জ্বর হইয়া পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তিনি ইচ্ছামত জলপান করিতে না পাইয়া মলত্যাগের ছল করিয়া পাইখানায় যান এবং সেখানে বসিয়া একটা গর্ত্তের অপবিত্র ও অস্বাস্থ্যকর জল একগাড়ু পান করেন। সে সময়ে তাঁহার হিতাহিত বা ধর্ম্মজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। আর একটি এমন

শোচনীয় ব্যাপার ঘটে, যে তাহা অদ্যাপি আমার স্মৃতিরূঢ় হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার একটি ভগিনীর ও একটি ভাগিনেয়ীর এক সময়ে জ্বর হয়। শেষোক্তটির বয়স ৪ কি ৫ বৎসর। সেটি একে দুর্ভাগা কুলীন দুহিতা, তাহার উপর আবার তিন ভাগিনেয়ের কনিষ্ঠা। ভাগিনেয় একে কুলীন পুত্র বলিয়া অতি আদরের ধন, তাহার উপর আবার তিন সহোদরের মধ্যে তিনি মাত্র জীবিত। সুতরাং সেইটির প্রতি সকলের অধিক মনোযোগ ছিল। প্রবল জ্বর তাড়নায় অত্যন্ত তৃষ্ণা হওয়াতে বালিকা ক্রমাগত জল চাহিয়াছিল। কিন্তু শেষ রাত্রি বলিয়া কিছুমাত্র জল দেওয়া হয় নাই, প্রভাত হইলেও বৈদ্যের প্রতীক্ষায় জল দেওয়া হইল না। বেলা চারি দণ্ডের সময় বৈদ্য পিতাম্বর কবিরাজ আসিয়া বালক বালিকার নাড়ী দেখিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। বালা যতবারই জল চাহিল, ততবারেই ঔষধ দিয়া জল দিতেছি প্রবোধ দেওয়া হইল। প্রথমে পুত্রকে ঔষধ সেবন করান হইল, তৎপরে কন্যার মুখে ঔষধ দিতে যাইয়া দৃষ্ট হইল যে, তাঁহার ঔষধ সেবনের শক্তি জন্মের মত রহিত হইয়াছে। আমি তৎকালে তথায় দণ্ডায়মান ছিলাম, এবং বালিকাও জল জল বলিতেছে, তাহাও শুনিতেছিলাম। সে সময় আমার বয়স ১৩ কি ১৪ বৎসর। তথাপি তাহার অবস্থা বুঝিবার জন্য তাহার গাত্র স্পর্শ করিলাম এবং নাড়ী দেখিলাম। গাত্রের বিলক্ষণ উত্তাপ আছে, কিন্তু নাড়ী কিছুমাত্র বোধ হইল না। তৎকালে পিতা বা অগ্রজ মহাশয় কেহ তথায় ছিলেন না। সুতরাং আমিই তাহাকে লইয়া বাহিরে গমনপূর্ব্বক বোধন বিল্ববৃক্ষ তলায় ক্রোড়ে করিয়া বসিলাম। কিন্তু যতক্ষণ তাহার শরীরে উত্তাপ থাকিল, ততক্ষণ আমি তাহাকে ভূমিশায়ী করিতে পারিলাম না। বৈদ্য যখন তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার মৃত্যুর কোন পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, এবং তাহার পরেও অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিবার উপযুক্ত কোন উপদ্রব দেখা যায় নাই। কেবল জল জল যে শব্দ করিতেছিল, তাহাই রহিত হইয়াছিল। আমার বোধ হয় যে, মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব্বেও তাহাকে কিঞ্চিৎ জল দিলে আর এই দুর্ঘটনা হইত না। ইটি

কুলীন-কন্যা

বালিকা না হইয়া যদি বালক হইত, তবে বোধ হয় যে, তাহার পিতা-মাতার ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের শোকের সীমা থাকিত না। ধন্য কৌলীন্য! তোমার অত্যাচারে বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশে যে অস্বাভাবিক ও নৃশংস ব্যাপার ঘটিয়াছে ও অদ্যাপিও ঘটিতেছে, তাহা কি মুসলমান, কি মহারাষ্ট্রীয়, কাহার দ্বারায় সম্পাদিত হয় নাই। এই দুঃখাবহ ঘটনার মূল—দেশের লোকের বা বৈদ্যের মূর্খতা তত দূর নহে, যতদূর কৌলীন্যের। কারণ এটি যদি কুলীন বালা না হইয়া কুলীন বালক হইত, তাহা হইলে তাহার যে প্রকার অসহ্য তৃষ্ণা হইয়াছিল, তাহাকেই অগ্রে ঔষধ দিয়া জল দেওয়া হইত।

চিকিৎসার দোষেই হউক, বা পীড়ার গতিক্রমেই হউক, আমার জ্বর ক্রমশঃ ভয়ানক আকার ধারণ করিল। অষ্টাদশ দিবসে আমার চৈতন্য হইলে দেখিলাম, আমার পিতা ও মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় আমার শয্যার উভয় পার্শ্বে বসিয়া আছেন, এবং সজল নয়নে একদৃষ্টিতে আমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বেলা ৪ দণ্ড আছে। জ্যেঠা মহাশয় পিতাকে বলিলেন যে "কোন ভয়ের বিষয় নাই, তুমি আহার করগে"। তৎকালে আমার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা স্মরণ নাই; দ্বাবিংশ দিবসে অন্ন পথ্য পাইলাম। একে অতিশয় দুর্ব্বল ছিলাম, তাহার উপর জ্বর আটকিয়া গেল, সুতরাং আমার পড়াশুনা আপাততঃ স্থগিত থাকিল। এত যে ক্লেশ পাইলাম ও পাইতে থাকিলাম, তথাপি কিছুমাত্র অনুতাপ বা দুঃখ হইল না।

কৃত্রিমজ্বরে সঙ্কট

হায়! সে সময় শিক্ষার কি ভয়াবহ বিকৃত প্রণালী ছিল। শিক্ষকের আলয়ে না যাইবার নিমিত্ত যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। গুরুমহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল, মক্তবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তকসকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে, অতি নির্দ্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন,

ভীষণ শিক্ষা পদ্ধতি

এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। কিন্তু তাহারা কি জন্যে শিক্ষায় বিমুখ থাকিত, তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে একবারও চেষ্টা করিতেন না। শুনিয়াছি, গুরু-মহাশয়ের ভয়ে এক বালক খর্জ্জুর বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। গুরুমহাশয়ের কোন কোন পড়ুয়া যাইয়া তাহাকে নামাইবার নিমিত্ত লোষ্ট্র প্রহার করিতে লাগিল। বালক নিরূপায় দেখিয়া অতি কাতর-স্বরে কহিল, "হে ঈশ্বর! যদি তুমি খেজুবের কাঁটায় আমার চক্ষু দুইটি অন্ধ করিয়া দাও, তবে আর আমায় পাঠশালায় যাইতে হয় না"। যে লেখাপড়া জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্য্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষা-প্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২।১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়স ১৩ হইতে ১৬ বৎসর

আমি ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইলে সৌভাগ্যক্রমে আমার মাতুল মহাশয় আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি পারস্য ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, ও শিক্ষাপ্রণালী সুচারুরূপে জানিতেন। তাঁহার উপদেশ প্রভাবে আমার শারীরিক ও মানসিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। আমি বাল্যাবধি প্রায় প্রতি বৎসরের কার্ত্তিক মাসে জ্বরাক্রান্ত হইয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ কবিতাম। তিনি আমার আহারের নূতন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং যেরূপে পাঠে আমার মনোনিবেশ হয়, তাহার যত্ন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে আমার সুস্থ ও সবল শরীর হইল, এবং পাঠেও বিলক্ষণ মন লাগিল। তিনিও গ্রন্থের অর্থ উর্দ্দু ভাষায় অভ্যাস করাইতেন, কিন্তু অগ্রে তাহা বঙ্গভাষায় আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়া মধ্যম দাদাকে ও আমাকে পড়িতে বলিতেন, বস্তুতঃ সে পুস্তকে আমার কোন অধিকার হইত না, মধ্যম দাদার নিকটেই থাকিত। মাতুল মহাশয় আমার এই অসুগম দেখিয়া দুই একখানি পুস্তক লিখিয়া দিতেন। কিছুকালের মধ্যে

আমি বিশেষ শ্রম ও যত্নপূর্ব্বক লিখিতে অভ্যাস করিয়া নিজেই পাঠ্য পুস্তকসকল নকল করিতে লাগিলাম। ইহাতে আমার বিশেষ ফল লাভ হইল। লিখন পঠন উভয়েই আমার আয়ত্ত জন্মিল। মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগির, সেকন্দরনামা, এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত হইলে ক্রমশঃ বাহারদানেশ, আল্লাসি জহুরি, আসর্ফি উর্ফি জাহির, হাফেজ এবং মোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত করেন। যে সময় দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্রপৌত্রদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য যুদ্ধ হয়, সেই সময় আজিমস্মানের পক্ষীয় একজন আমির আপন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে যে সকল পত্র লেখেন, তাহারই কতকগুলি পত্রের সঙ্কলনে ইয়ার মহম্মদ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহাতে ঐ যুদ্ধসংক্রান্ত অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়, কিন্তু পাঠকগণ শুদ্ধ পত্রের রচনা শিক্ষাব নিমিত্ত ইহা পাঠ করিতেন। আওরঙ্গজেব যে সকল পত্র স্বীয় পুত্রপৌত্র ও আত্মীয়স্বজনকে লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি লিপি একত্র করিয়া, একজন সম্রাটের পূর্ব্বনামে এই আলমগির গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সকল পত্রে সম্রাটের চরিত্রের ও হৃদয়ের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এ পুস্তক রচনা শিক্ষার জন্য পঠিত হইত।

সেকন্দরনামা পদ্যকাব্য। ইহা বীররসে পরিপূর্ণ। পারস্য সম্রাট দারার সহিত সেকন্দরের যে যুদ্ধ ও সন্ধি হয়, তাহা অত্যুজ্জ্বলরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং গ্রন্থকর্ত্তা তাহাতে যথেষ্ট কাব্যশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রচয়িতার নাম সওনানা নেজামি। অন্যান্য ভাষার বীরকাব্য পাঠে যেরূপ উপকার ও আনন্দ লাভ হয়, ইহাতেও সেইরূপ লাভ হইয়া থাকে। মিজান আরব্যভাষার ব্যাকরণের প্রথম ভ'গ।

বাহার দানেশ বৃহৎ গদ্যকাব্য। একটি মূল উপন্যাসের বহু শাখা উপন্যাস যোজনা করিয়া আরব্য উপন্যাসের ন্যায় এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মূলোপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে কোন রাজপুত্র এক তুতী পক্ষীর বাচনিক অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না এক রাজকন্যার

কথা শ্রবণে তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হন। রাজা প্রথমতঃ সতুপদেশ দ্বারা পুত্রের প্রেম রোগের শান্তি করণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেন।

তাঁহাদের যত্ন বিফল হইলে রাজকুমারকে নারীজাতির অসতীত্ব ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নিন্দনীয় চরিত্রের উপাখ্যান শুনাইতে তাঁহার বয়স্যদিগকে আদেশ দেন। কিছুতেই উপকার না হওয়াতে, পরিশেষে রাজা উক্ত রাজকুমারীর পিতাকে রাজনন্দিনীব সহিত বাজপুত্রের বিবাহের প্রস্তাব কবিয়া পত্র লেখেন। ইহাও নিষ্ফল হইয়া যায়। অবশেষে রাজতনয় সন্ন্যাসীর বেশে দেশত্যাগী হন। উপরিউক্ত তুতী মাত্র তাঁহার সঙ্গী ছিল। এই পক্ষীর মন্ত্রণানুসারে বহুদিনের পব কোন সিন্ধুতটস্থ নিবিড় অবণ্যমধ্যে এক তাপসের কুটীরে উপনীত হন। তথায় একটি সাবসপক্ষী ছিল। সে রাজপুত্রের দুঃখের বিবরণ শুনিয়া, কোন বিষয়ের আদ্যন্ত না জানিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক অনেকগুলি উপাখ্যান বলে।

যাহা হউক, বহু অলৌকিক ঘটনার পব রাজনন্দন রাজনন্দিনীর সমীপস্থ হন, এবং পূর্ণমনোরথ হইযা রাজকুমাবীব সহিত বাটী প্রত্যাগমন করেন। মূল গল্প ও সারস-বর্ণিত গল্পনিচয় যেমন সুন্দর, নারীনিন্দার কাহিনীগুলি তেমনি জঘন্য। শেষোক্ত গল্পের ন্যায় অশ্লীল গল্প এই ভাষায় বা অন্য কোন ভাষার গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহস্থল। ইহা বালকের পাঠ্যপুস্তক হওয়ার যোগ্য কোন মতেই নয়।

আল্লাসি গ্রন্থে তিন অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে সম্রাট আকবর ভিন্নদেশীয় কয়েক রাজাকে আপনার সংসারের বিবরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মন্ত্রীদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকখানি সঙ্কলিত আছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে আবওল ফজলের অনেকগুলি পত্র আছে; তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য বিষয় লিখিত হইয়াছে।

আল্লাসি গ্রন্থের মর্ম

উপরিউক্ত পত্রের মধ্যে আকবর যে দুইখানি তুরাণদেশাধিপতিকে লেখেন, তাহাতে প্রকাশ আছে যে শেষোক্ত অধিপতি প্রথমোক্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "আপনি বিধর্ম্মী হইয়াছেন, অতএব আপনার সহিত

আর কোন সম্বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই”। আকবর ইহার উত্তর এই লিখেন যে, “আপনি আমার বিধর্ম্মী হওয়ার কথা যাহা আমার শত্রুর নিকট শুনিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ; লোকে কি না বলিয়া থাকে, তাহারা যখন ঈশ্বরকে জন্মবিশিষ্ট বলিয়াছে এবং মহম্মদকে কুহকী বলিয়াছে, তখন আমাকে নাস্তিক বলিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি ? যাহা হউক, যাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধির ছায়া মাত্র পড়িয়াছে, তাহাদের যে কথা প্রত্যয় হইবার নয়, তাহা আপনার ন্যায় উচ্চপদস্থ ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস্য জ্ঞান হওয়া অতীব আক্ষেপের ও আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি হিন্দুদিগের মন্দিরসকল মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছি, এবং যেখানে পৌত্তলিকদের শঙ্খধ্বনি হইতেছিল, সেখানে মুসলমানদিগের নোমাজের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করাইয়াছি”।

অন্য মুসলমান রাজাদের কোপের ভয়ে অথবা তাহাদের সন্তোষের জন্য আকবর যাহাই লিখুন, তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা উপরিউক্ত পত্রে কৈফিয়ৎ তলপ হওয়াতে বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করুন বা না করুন, তাহার প্রতি যে তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না, তাহাও জানা গিয়াছে ; তবে এমন হইতে পারে যে, তাঁহার কোন ধর্ম্মই ঈশ্বরের প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী না থাকাতেই, এই সুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। যদি তাঁহার অধস্তন সমস্ত পুরুষেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথগামী হইতেন, তবে আর তাঁহার বংশের এরূপ অবস্থা হইত না, আওরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্ম নিপীড়নেই তাঁহার বংশের অধঃপতনের মূল স্থাপন হইয়াছিল।

হাফেজ ও আসফি প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাপ্রণালী

আল্লাসি গ্রন্থ পাঠের পর জহুরি ও তোগরা নামে যে দুইখানি পুস্তক পাঠ করি, তাহাতে কি কি বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। এই দুইখানি গদ্যকাব্য এবং এই দুইয়ের একখানিতে কাশ্মীরের শোভার অনেক বর্ণনা আছে, এইমাত্র স্মৃতিরূঢ় হয়। এই পুস্তক পাঠেই আমি কাশ্মীর দর্শনের জন্য উৎসুক হই ; ইহা

যথাস্থানে বিবৃত হইবে। আসফি উরফি জহির এবং হাফেজ পদ্য গ্রন্থ। ইহাকে খণ্ডকাব্য বা গাঁথা বলা যাইতে পারে। কারণ, এইসকল গ্রন্থের, বিশেষতঃ আসফি ও হাফেজের অনেক কবিতা সঙ্গীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গ্রন্থের রচনাপ্রণালী সংস্কৃত, বাঙ্গালা বা ইংরেজী ভাষায় দৃষ্ট হয় না। এসকল গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে দুই হইতে সপ্তদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত কবিতা সচরাচর দেখা যায়। বোধ হয়, এজন্য কোনও পদ্ধতি নাই ; আর প্রত্যেক অধ্যায়ে এইরূপ অনেক পরিচ্ছেদ, বোধ হয়, ইহাও কোন নিয়মবদ্ধ নহে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথম কবিতার দুই চরণের শেষে যে শব্দ থাকে, তাহা বাঙ্গালা ভাষার মিত্রাক্ষর পয়ার ছন্দের ন্যায় পরস্পর মিল থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতার বা তাহার পরবর্ত্তী কবিতার উভয় চরণের শেষে আর ঐরূপ ঐক্য থাকে না। কেবল প্রথম কবিতার শেষ শব্দের সহিত মিল থাকে ; আর প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষ কবিতায় আমাদের পূর্ব্বতন কবিগণের প্রথামত কবির নামের ভণিতা দেওয়া হয় ; এবং এইরূপ কতকগুলি পরিচ্ছেদে এক এক অধ্যায় সমাপ্ত হয়। আর বাঙ্গালা যেমন সর্ব্বপ্রথম শব্দের আদিতে ক অক্ষর আরম্ভ করিয়া ক্ষ অক্ষরে শেষ হয়, সেইরূপ ইহার প্রথম অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের সকল কবিতার শেষে এই ভাষার যে শব্দের শেষে আদ্যক্ষর অনেক থাকে, তাহাই দেওয়া হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সকল পরিচ্ছেদের সকল কবিতার অন্তিমে যে শব্দের শেষ "বে" অক্ষরে হয়, তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল অক্ষরের কবিতা হইলে গ্রন্থ শেষ হয়। এইরূপ গ্রন্থের এক কবিতার ভাবের সহিত দ্বিতীয় বা তাহার পরবর্ত্তী কোন কবিতার সম্বন্ধ নাই।

প্রত্যেক কবিতারই স্বতন্ত্র ভাব। আর একটি দেখা যায় যে, এইরূপ সকল গ্রন্থের কবিতায় প্রেমভাব ভিন্ন প্রায় ভক্তিভাব নাই। আমাদের দেশের গ্রন্থে যেমন ঈশ্বরকে কখন মাতৃ সম্বোধন কখন পিতৃ সম্বোধন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই প্রণালীর গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। প্রেমবিহ্বল নায়ক স্বীয় প্রাণাধিকা প্রণয়িণীর প্রতি যেরূপ প্রেম প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব এইসকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার

সকল স্থানেই ঈশ্বর প্রণয়িণী বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। বোধ হয়, মুসলমানদিগের মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, শ্রদ্ধাস্পদ ও ভক্তিভাজন গুরুজনের প্রতি যিনি যতদূরই ভক্তি প্রকাশ করুন, কিন্তু রমণীপ্রেমে তিনি যত দূর মজিবেন, গুরুজনের ভক্তিতে ততদূরই কখন মজিবেন না ; আর প্রেমের জন্য লোকে যেপ্রকার পাগল হয়, ভক্তির জন্য সেপ্রকার হয় না।

মনশব গ্রন্থ সেখ সাদির কৃত আরব্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগ। পারস্য ভাষার কোন ব্যাকরণ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিল না। এ ভাষা এতই সহজ যে, তাহা পড়িবারও বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বিনা ব্যাকরণে লেখাপড়া চলিত। যাঁহার এ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভের ইচ্ছা হইত, তিনি আরব্য ব্যাকরণ পড়িতেন। আমাদের পাঠারম্ভের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কোন সাহেবের আদেশানুসারে চাহার গোলজার নামে একখানি পারস্য ব্যাকরণ প্রস্তুত হয়।

মাতুল মহাশয়ের আরও কয়েকজন ছাত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে আমাদের ভাগিনেয় সম্পর্কীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র লাহিড়ীর সহিত আমার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য জন্মে।

যদিও তৎকালে আমাদের সম্পত্তির অবনতি হইতেছিল, তথাপি কর্ত্তারা অন্নদানে কাতর হইতেন না। আমরা পূর্ব্বাহ্ণে বেলা তৃতীয় প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত মাতুল সন্নিধানে পড়িতাম। তাহার পর আমি ও আর একজন ছাত্র রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পাঠ করিতাম ও তদনন্তর পূজার কোঠাতেই শয়ন করিতাম। বৃহস্পতিবাবে ও শুক্রবারে নূতন পাঠ হইত না। বৃহস্পতিবাবের বৈকাল হইতে শুক্রবারের পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত পাঠ এককালে নিষিদ্ধ ছিল। বৃহস্পতিবারের বৈকালে প্রায়ই আমরা কৃষ্ণনগরে আসিতাম।

আমাদের অবস্থার অবনতি

এক বৎসর পরে আমাদের অবশিষ্ট বিভবের এককালে অবনতি হইল। আমাদের যে দুই দরপত্তনি তালুক ও এক নীলের কুঠী ছিল, তৎসমুদয় লইবার মিমিত্ত খাল বোয়ালীয়ার নীলকুঠীর অধিকারী ফ্রান্‌সিস্ হ্যারিক সাহেব

আমাদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে তাহার সহিত একটি হাঙ্গাম হইয়া এক ফৌজদারী মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার স্বপক্ষ হওয়াতে পরিশেষে তালুক ও কুঠী নীলকরের নিকট বিক্রয় কবিতে হইল।

দুঃসময় উপস্থিত হইলে যে বিবিধ বিপদ দেখা দেয়, আমাদের তৎকালীন অবস্থা তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টান্তস্থল। ঐ সময় আমাদের বহুল নিষ্কব ভূমি যাহা পুরষানুক্রমে সংসাবের বহু সাহায্য করিতেছিল, তাহা গবর্ণমেণ্ট অসিদ্ধ বৃত্তি বলিয়া আত্মসাৎ কবিলেন। দশ বাবটি গোলাবাটীতে অনেক টাকার ধান্য আছে. কর্ত্তাদেব এইরূপ বোধ ছিল। কিন্তু এক্ষণে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, কতক ধান্য গোমস্তাগণ হরণ করিয়াছে, কতক অনুপযুক্ত অধমর্ণকে ঋণ দেওয়াতে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার অনুপায় হইয়াছে। কর্ত্তাবা তালুক, কুঠী, ধান্য, বৃত্তি সকলেতেই এককালে বঞ্চিত হইলেন। যে যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকিল, তাহাতে সংসাবযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতি কষ্টকর হইল। কর্ত্তাদের তৎকালীন অবস্থা মনে পড়িলে অদ্যাপি হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাঁহারা দোল দুর্গোৎসব নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া, কত বাহুল্য অতিথিসেবা, অকাতরে দান, আত্মীয়স্বজনের উপকার বাল্যকালাবধি করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের আজ নিজের পারিবারিক প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পাদন করাও দুষ্কর হইল। প্রায় সকল হিন্দু পরিবারেব মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, যাবৎ অবস্থা উন্নত থাকে, তাবৎ পরিবারগণের মধ্যে বিলক্ষণ সুহৃদ্ভাব থাকে, কিন্তু যেই অবস্থা অবনত হইতে আরম্ভ হয়, অমনই কলহ উপস্থিত হইয়া বিচ্ছেদের সূত্রপাত করে।

হিন্দু পরিবারগণের বিচ্ছেদের কারণ

বাটীর গৃহিণীরা এই বিচ্ছেদের প্রধান প্রবর্ত্তক হন। কর্ত্তাদের মধ্যে যতই স্নেহ ভাব থাকুক, কর্ত্রীরা ইচ্ছা করিলেই গৃহ ভাঙ্গিতে পারেন। বিশেষতঃ যেখানে সকল সহোদরের উপার্জ্জন-ক্ষমতা সমান নয়, সেখানে অবিলম্বেই গৃহ-বিচ্ছেদের আগমন হয়। উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির গৃহিণী

ভাবেন যে, স্বামী এত পরিশ্রম করিয়া ধন আহরণ করিবেন, আর তাঁহার ভ্রাতারা বসিয়া খাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নয়। তিনি প্রথমে পতির ভ্রাতৃপত্নীদের সহিত অকারণ কলহ করিতে আরম্ভ করেন, ও মর্ম্মান্তিক কথাসকল কহিতে থাকেন। ক্রমশঃ ভ্রাতৃপত্নীরাও নিতান্ত ব্যথিত হৃদয় হইয়া ভাবেন যে এ যন্ত্রণা অপেক্ষা ভিক্ষোপজীবী হওয়াও ভাল। সহোদরগণ পরিশেষে কর্ত্রীদের উত্তেজনায় পৃথক্ হইতে প্রবৃত্ত হন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতেন। এবং মধ্যমতাত মহাশয় তালুকের ও কুঠীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের হস্তে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন ছিল। পিতাঠাকুর প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন, সুতরাং তাঁহার হস্তে ধনাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আবার তাঁহারই পরিবার সকলের অপেক্ষা অধিক ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এক পুত্র ও তিন কন্যার পর আমার জন্ম হয়। আমার পরে পিতার আর পাঁচ কন্যা জন্মে। ইহার মধ্যে তিনটার শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হয়। অগ্রজের ও জ্যেষ্ঠা তিন ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। ভগ্নীপতি তিনজনই প্রায় আমাদের বাটীতে থাকিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন এবং আমাদের অন্যান্য কুটুম্ব মধ্যে মধ্যে আসিতেন। সুতরাং এক বৃহৎ পরিবার হইয়াছিল। পিতা বহু কষ্টে এই সংসার চালাইতে লাগিলেন। যেদিন নিত্য ব্যয় নিষ্পাদনে অসমর্থ হইতেন, সেদিন মাতাঠাকুরাণী কোন দ্রব্য বন্ধক বা বিক্রয় করিয়া আহারের সংস্থান করিতেন।

এই কষ্টের উপর আর এক কষ্ট উপস্থিত হইল। আমার অবিবাহিতা দুই ভগ্নীর বিবাহকাল উপস্থিত হওয়াতে পিতাঠাকুর অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন। বহুকালাবধি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কোন কন্যা শ্রোত্রিয়ে সম্প্রদান হয় নাই। তথাপি মাতাঠাকুরাণী তাঁহার কন্যাদ্বয়কে কোন দুই ধনবান কাপ বা শ্রোত্রিয় সুপাত্রের সহিত বিবাহ দিবার গাঢ় ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীকে কোন মতেই সম্মত করিতে পারিলেন না।

বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন হইলে দেশের যে কতপ্রকার অমঙ্গল

ঘটে, তাহা বর্ণনা হয় না। আমাদের প্রচলিত কুলীনের নিয়ম যদিও নিতান্ত ভ্রমমূলক, তথাপি তাহার উদ্ভাবন বোধ হয় মঙ্গল কামনায় হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন থাকিতে বর্ত্তমান কুলীনদের ব্যবহারদর্শনে স্বদেশীয় রাজা অবশ্যই ইহার সদ্বিধান করিতেন। সহস্র দোষে দোষী হইলেও শুদ্ধ কুলীনসন্তান বলিয়া যে কাহারও কৌলীন্য-মর্য্যাদা অটল থাকিবে, ইহা কখনই ঘটিত না। বঙ্গবাসিগণ বহুকাল হইতে আপনাদের হিতাহিত চিন্তা করণে অক্ষম হইয়াছে, এবং রাজাজ্ঞাও ব্যবহার ধর্ম্ম বোধ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেন রাজাদের আদেশ ও তাহার পোষক ব্যবহার শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষাও মান্য হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালীন লোক কৌলীন্য-মর্য্যাদাকে সাংসারিক সম্মানের প্রধান বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শ্রোত্রিয় শ্রীমান বিদ্বান সচ্চরিত্র রাজপুত্রকেও কন্যা দান না করিয়া কদাকার মূর্খ অসচ্চবিত্র দরিদ্র কুলীনপুত্রকেও দান কবিতে ব্যস্ত হইতেন। পিতাঠাকুর অতি শান্তস্বভাব ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। তাঁহার বিবাহিতা তিন কন্যার সন্তান হইল, তবু গৃহিণীরা স্বাধীন হইতে পাবিলেন না। বাপের বাটী পরাধীন থাকিয়া দিনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল দুর্দ্দশা দেখিয়াও এবং তাহাদের মনোদুঃখ জানিয়াও তিনি আপনাব ভ্রান্তিমূলক পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগে সমর্থ হইলেন না।

কৌলীন্য-প্রথা

গুরুজনেরা সেকালের লোক ছিলেন। তাঁহাদের ত এরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে। কিন্তু ইদানীন্তন সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে এরূপ কৌলীন্যাভিমানী হন, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? ইহারা পূর্ব্বকালীন কুলীনের ন্যায় কৌলীন্যের দোহাই দিয়া কি না করিতেছেন? ইহারাও কুলীন ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের পুত্রকে কন্যা দিতে পরাঙ্মুখ রহিয়াছিলেন। পুত্রের বিবাহে কন্যাকর্ত্তার নিকট যথাসাধ্য ধন লইতেছেন, এবং বৈবাহিক বা শ্বশুরের নিকট নানা বিষয়ের দাওয়া কবিতেছেন। আর তৎসমুদায় লব্ধ না হইলে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেছেন। পূর্ব্বকালীন কুলীনদের ন্যায় ইহাদেরও সকল নীচ স্পৃহাই বলবতী রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও দুঃখ উপস্থিত হয়। একদা মাতুলমহাশয়

পিতাঠাকুরকে কহিলেন যে, তোমাদের অবনতি এক্ষণও প্রকাশ হয় নাই। কিঞ্চিৎ ধন হইলেই কুলীন পাত্র মিলিবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা সকলের গোচর হইলে কন্যা পাওয়া দুষ্কর হইবে। তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে। মাতুলের কথা কতদূর ন্যায় বা অন্যায়, কিছুই বিবেচনা না করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। যদিও তখন আমি পারস্যভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তথাপি উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সাহায্য করি, এরূপ ক্ষমতা আমার হয় নাই। এ সময় বিবাহ হইলে ধনাভাব-বশতঃ পিতার আরও কষ্ট হইবে, ইহা একবারও মনে হইল না। কিরূপেই বা হইবে? তৎকালে আমাদের অপেক্ষাও দুরবস্থাপন্ন বালকবৃন্দের বিবাহ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছিলাম! বাল্যবিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না; তদ্বিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না এবং সকলকেই বালকবালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।

বিবাহ

আমার বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণ হইতে লাগিল। এক্ষণে যেমন অগ্রে কন্যাটির সৌন্দর্য্য দেখিতে হয় ও পরে তাহার কুল শীল জানিতে হয়, সেরূপ প্রথা সেকালে ছিল না। সে সময়ে প্রথমে কন্যার পিতৃ মাতৃ উভয় কুল নির্দ্দোষ কি না, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতেন। যদি সে বিষয়ে কোন দোষ দৃষ্ট না হইত, তবে কন্যা সুন্দরী কি না, দেখিতেন। উৎকৃষ্ট কুলোদ্ভূতা কন্যা শ্রীমতী না হইলেও তিনি সাদরে গৃহীতা হইতেন। কিন্তু দোষসংযুক্ত বংশের কন্যা, রূপে ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি কোন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের গৃহে আদৃতা হইতেন না। কন্যাপক্ষীয় গুরুজনেরাও ঐরূপ প্রণালীতে পাত্র স্থির করিতেন।

বিশেষ বিবেচনা করিলে এ রীতি উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু বালকবালিকার অপক্ব চরিত্র দেখিয়া, অথবা তাহাদের পিতামাতার ব্যবহার দর্শন করিয়া, তাহাদের ভাবী চরিত্রের বিষয় স্থির করা যায় না। অধিকাংশ সন্তান জনকজননীর দোষগুণের অধিকারী ও অধিকারিণী হয় বটে, কিন্তু কখন কখন দৃষ্ট হয় যে, কোন কোন সন্তান পিতামহের বা মাতামহের দোষগুণও পাইয়া থাকে।

এই হেতু পূর্ব্বতন ভদ্রবংশোদ্ভব লোকেরা পাত্র ও পাত্রীর তিন চারি পুরুষের পরিচয় লইয়া সম্বন্ধ স্থির করিতেন। এই প্রথানুসারে বিবাহ স্থির করিলেই যে আশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে, এরূপও নয়। তবে যতদূর দেখা যাইতে পারে, ততদূর চেষ্টা করা হইত। আমার ভাবী স্ত্রী সুন্দরী না হইলেও তাঁহার জনকজননীর বংশ দেখিয়া আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

যদিও পাত্রপাত্রীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের কুলশীল দেখিবার পদ্ধতি ছিল, কিন্তু বর্ণিত কালের সকলেই এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতির তাৎপর্য্য ভালরূপে জানিতেন না এবং সন্তানে পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণ বর্ত্তে,—ইহার কারণও বিশেষরূপে বুঝিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের স্বভাবের ও ব্যবহারের বিষয় বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহাদের বংশে কুলকার্য্য হইয়াছে কিনা ও যদি হইয়া থাকে, তবে কয় পুরুষে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের নিকট সম্বন্ধীয়দিগের বংশে ঐরূপ আছে কি না, ইহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইতেন। তাঁহাদের আচারব্যবহার ধর্ম্মসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলের বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যেও এমন কোন কোন কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন যে, তাঁহারা জলে স্থলে দস্যুবৃত্তি করিতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পদগৌরব বিনষ্ট হইত না। সকলে এ বিষয় যেন শুনিয়াও শুনিতেন না, জনিয়াও জানিতেন না। সুতরাং অধিকাংশস্থলে কৌলীন্য-সংস্রবের পরিমাণ দেখিয়াই বংশের গৌরব বা অগৌরব অবধারিত হইত।

হায়! প্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা বঙ্গের কতই অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আলোককে অন্ধকার দেখাইতেছে, এবং অন্ধকারকে আলোক দর্শন করাইতেছে। অতি সচ্চরিত্র বিশিষ্ট সিদ্ধ বা কষ্ট শ্রোত্রিয়ও বংশে অনাদৃত হইতেছে, এবং যৎসামান্য জঘন্য দুশ্চরিত্রান্বিত কুলীন বংশ অতীব সমাদর পাইতেছে। এমন কি, ইহা ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের জ্যোতি তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং ধীমান সদ্বিদ্বানের জ্ঞান-চক্ষুতেও ধূলি দিতেছে।

আমার তৎকালীন ভাবী শ্বশুর (১) আমাদের একজন জ্ঞাতির সহিত দুহিতার বিবাহ স্থির করিতে আসিয়া আমাকে দেখেন, এবং বাটী প্রত্যাগত হইয়া আমাকে কন্যা-সম্প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জ্ঞাতিপক্ষের ঘটক ইহা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী-পরিবার-দিগকে কহে যে, তাঁহাদের (অর্থাৎ আমাদের) সম্পত্তি দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু ১৪।১৫ সহস্র টাকা ঋণ আছে। যাহাকে সাদাসিদা লোক কহে, ভাবী শ্বশুর সেইরূপ ছিলেন। তিনি উত্তর করেন যে, যাঁহাকে লোকে এত টাকা কর্জ্জ দিয়াছে, তিনি কখনই নির্ধন নন। অতএব আমি তাঁহারই ঘরে কন্যা দিব।

বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার পূর্ব্বে, তৎকালে পাত্রীর পক্ষের লোক আসিয়া শ্রোত্রীয় পাত্রের বিদ্যার পরীক্ষা করিত।

সে সময় এ অঞ্চলে ইংরাজী বিদ্যার শিক্ষা প্রায়ই হইত না, এবং পারস্য বিদ্যার চর্চ্চাও অধিক ছিল না। বঙ্গভাষায় একখানি পত্র লিখিতে ও দুই একটি অঙ্ক কষিতে পারিলেই পাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত! সুতরাং যখন পারস্যভাষায় আমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তখন আর আমার পরীক্ষা দিবাব প্রয়োজন কি? বোধকরি এই বিবেচনায় আমার পরীক্ষা দিতে হইল না। একবারেই কন্যাপক্ষীয় একজন আসিয়া বিবাহের পত্র করিয়া যাইলেন।

কিছুদিন পরে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমার অগ্রজের ও মধ্যম দাদার বিবাহে যে সমৃদ্ধি ও সমারোহ হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশের একাংশও হইল না, এ কারণ মনোমধ্যে যদিও দুঃখ হইতেছিল, তথাপি যখন বাহকেরা বিবাহের পালকি স্কন্ধে করিল, সম্মুখে ও পার্শ্বে আলোকরাজি নয়নগোচর হইল, এবং রোশনচৌকির সুমধুর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, এবং বোধ হইল, যেন এত সুখ আর কখন হয় নাই। আর এই পরিণয়বৃক্ষে যে কত সুমধুর ফলফুলই ফলিবে, এই চিন্তায় মন যেন বিহ্বল হইল। আহা! মানবজাতি কি অদূরদর্শী। কতই আশা করে ও কতই

(১) ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের সহযোগী অদ্বৈতপ্রভুর বংশোদ্ভূত

নিরাশ হয়। কত দেখে ও শুনে, তথাপি আপনার সময়ে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়। যে বিষয়ে কত শত লোককে অসুখী হইতে দেখিয়াছে, সেই বিষয়ে আপনি সুখী হইব, মনে করে। অন্যকে পরামর্শ দিবার সময় বিজ্ঞবর হন, কিন্তু নিজের সময় গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকেন। এই পরিণয়-কুণ্ড হইতে অমৃত না উঠিয়া গরলও উত্থিত হইতে পারে, এ সন্দেহ আমার মনে একবারও স্থান পাইল না। বরং বোধ হইল, যেন সংসারের সারপদার্থ পাইলাম, এবং জীবনের সার্থকতা লাভ করিলাম।

বিবাহের এক বৎসর পরে জামাই-ষষ্ঠী উপলক্ষে আমি একবার শ্বশুরালয়ে যাই, এবং অষ্টাহ যাপন করি। এই কয়েক দিন আমার এতই সুখে যায় যে, দিবারাত্রি কোথায় দিয়া গিয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। আমার স্ত্রীর বাল্যসখীরা অরুণোদয় হইতে রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কখন আমার নিকট থাকিতেন, কখন আমার নিমিত্ত

জামাই ষষ্ঠী

নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার পত্নীর ভগ্নীসম্পর্কীয় তিনজন ও ভ্রাতৃজায়া-সম্পর্কীয় একজন ছিলেন। সে সময় তাঁহার ভগ্নীদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ এবং ভ্রাতৃবধূর বয়স চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ। প্রায় প্রতি বৈকালেই আরও অনেক প্রতিবাসিনী বালিকা ও যুবতী আসিয়া আমার সহিত হাস্যপরিহাস করিতেন।

আমার শ্বশুরবাটীতে শয়নের ভাল স্থান না থাকাতে রাত্রিতে উপরিউক্ত ভ্রাতৃজায়ার নিকেতনে আমার শয্যা প্রস্তুত হইত।

মধুরালাপে সুখ-যামিনী

তৎকালে তাঁহার স্বামী ও শাশুড়ী প্রভৃতি কেহই বাটীতে ছিলেন না। রাত্রিতে আমি শ্বশুরবাটীতে আহার সমাপন করিয়া তাঁহাদের বাটীতে যাইতাম। আমার স্ত্রী ও তাঁহার ভগ্নীরাও সেই সময় তথায় উপস্থিত হইতেন। তখন আমার স্ত্রী তাঁহাদের সাক্ষাতে আমার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতেন, এবং কখন কখন সহচরীদিগকে দুই একটা কথা বলিতেন। তাঁহার ভাইজ ভগ্নীরা রাত্র প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমার সহিত নানাবিধ হাস্যপরিহাস

করিতেন। কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক বালিকা অতি মৃদুস্বরে গীতও গাইতেন। আমাদের সকলেরই চিত্ত আনন্দে এত অধিক অভিভূত হইত যে, যামিনীর নিয়মিত গতির দিকে কাহারও মনের নয়নপাত হইত না। নিদ্রা যে এক সংজ্ঞা আছে, তাহা আমাদের স্মৃতিপথে আসিত না।

আমি যে দিবস প্রত্যূষে শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাগমন করি, সে দিবস অদ্যাপি স্মরণ করিলে হৃদয় হর্ষবিষাদে অভিভূত হয়। যাত্রা-কালে বর্ণিত বালিকারা সকলেই উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা কহা দূরে থাকুক, গুরুজন সম্মুখে থাকাতে নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারিলেন না; চক্ষুর জল চক্ষুতেই রাখিতে হইল, এবং তৎকালে মনের কথা মনেই থাকিল। "তোমাদের নিকট এক্ষণে বিদায় হই" একথা আমিও বলিতে পারিলাম না, এবং বহুকষ্টে নয়নজলের পথ রোধ করিয়া রাখিলাম। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আলাপ করিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহা চরিতার্থ করিতে এ দেশস্থ নরনারী উভয় জাতিই ইচ্ছা করিয়া থাকেন; কিন্তু এ বাসনা পূর্ণ করিতে এদেশের পুরুষেরা যেরূপ সক্ষম হইতেন, কুলকামিনীরা সেরূপ সক্ষম হইতেন না।

বিদায়ে হর্ষ-বিষাদ

পুরুষেরা বেশ্যাদিগের সহিত আলাপ করিয়া এ অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কুলবালাগণ কেবল নিজ পরিবারের বা অতি সন্নিহিত স্বসম্পর্কীয় প্রতিবেশীর নূতন জামাতার সহিত আলাপ করিয়া আমোদিত হইতেন। সে আলাপও আপন ভগ্নীপতি বা স্বামীর ভগ্নীপতি ভিন্ন অন্যের সহিত ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। কোন সুশীল সরলস্বভাব ও মিষ্টভাষী জামাতা পাইলে, তাঁহাদের আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। তাঁহারা হৃদয়ের দ্বার তাহার সমক্ষে খুলিয়া দিতেন, এবং সকলেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে ও তাহার ভালবাসা পাইতে যত্ন করিতেন। আর যে নারীর যে গুণ থাকিত, তাহা ঐ জামাতাকে দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। চন্দ্র দেখিলে চকোর যেমন পুলকিত হয়, বা বহুকালের দরিদ্র অপর্য্যাপ্ত ধন লাভ করিলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়, সেইরূপ

জামাতা ও কুলবালাগণ

কুলস্ত্রীরা সুশ্রী ও তরুণবয়স্ক জামাতৃদর্শনে আহ্লাদিত হইতেন। জামাতার বয়স অধিক না হইলে প্রেম-অনভিজ্ঞ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকাগণও তাহাকে ভালবাসিত। কি বালিকা, কি যুবতী, কাহারও হৃদয়ে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইত না। তাঁহারা অতি নির্ম্মল চিত্তে ঐ জামাতার সহিত আলাপ করিতেন। যখন আমাদের কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে পরস্পরের পত্নীর সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ আরম্ভ হইল, তখন আমাদের ও স্ত্রীদিগের অপার আনন্দ লাভ হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বয়স ১৭ হইতে ২২ বৎসর

আমার বিবাহের এক বৎসর কি দুই বৎসর পরে কাছারির কার্য্য শিক্ষার্থ আমি এখানকার জজ আদালতের রিটরন্ নবিশের সেরেস্তায় লেখাপড়া করিতে লাগিলাম। কিছুদিনের পরে যে একজন নূতন রিটরন্ নবিশ হইলেন, তিনি পারস্যভাষা জানিতেন না।

আমাব চাকুবী

জজের নিজের লোক বলিয়া তিনি এই কর্ম্ম পান। সাহেবেরা মনে করিলে মনুষ্য কেন পশুকে দিয়াও কার্য্য চালাইতে পারেন। তাঁহার কার্য্য আমি করিতাম, তাঁহার বেতন আমাকে দিতেন, উপরি-লাভ আপনি লইতেন।

ইহার কয়েকদিন পরেই গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে এদেশের সমস্ত রাজকার্য্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদব এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রম-পূর্ব্বক যে-কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্ম্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে

আদালতে ইংরাজী প্রচলন

আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যা-শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজীবিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

বিলম্বে ইংরাজী শিক্ষা

শ্রীপ্রসাদ কলিকাতার মহাত্মা হেয়ার সাহেবের স্কুলের একজন প্রধান ছাত্র ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটী আসিয়া অবস্থিত হন। শ্রীপ্রসাদ যেমন বুদ্ধিমান্, তেমনই দেশহিতৈষী ও পরোপকারী ছিলেন। তৎকালে গোয়াড়ীতে পাদরী সাহেবদের একমাত্র স্কুল ছিল। দূরতা-বশতঃ তাহাতে তাঁহার প্রতিবাসী বালকদের পড়িবার সুবিধা ছিল না। এ কারণে তিনি আপন বাটীতে একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সঙ্গে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্ররূপে পড়িতে লাগিলাম। শৃগাল-কুক্কুরের গল্প পাঠে পাছে আমার ইংরাজী বিদ্যায় বিতৃষ্ণা জন্মে, একারণ একখানি শিশুবোধক পুস্তক পাঠের পরেই শ্রীপ্রসাদ আমাকে টেলিমেকাস (Telemachus), ক্যাম্বেলের প্লেজারস্ অব্ হোপ (Pleasures of Hope) পড়াইতে লাগিলেন। তিনি পুস্তকদ্বয়ের প্রত্যেক শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতেন, এবং অতি সুন্দররূপে তাহার মর্ম্ম বুঝাইতেন।

শ্রীপ্রসাদের স্কুল

এ দেশস্থ তদানীন্তন প্রায় সকলেরই মনে এই ধারণা ছিল যে, ইংরাজীতে পশুর ও বালকের গল্প ব্যতীত উচ্চাঙ্গের কোন সুমধুর গল্প নাই। সে সময় এ অঞ্চলের যে দুই একজন এ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সম্বৎসরই কলিকাতায় থাকিতেন, এবং তাঁহারা বাটী আসিলেও তাঁহাদের সহিত বহুলোকের আলাপ হইত না। সুতরাং যে দুই একজন কেরাণীকে দেখিতে পাইতাম, তাঁহারা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর বালকের পাঠ্যপুস্তক দুই একখানি পড়িয়া, যাহাতে হস্তাক্ষর সুন্দর হয়, তাহাতেই প্রায় মনোযোগ দিতেন। উচ্চাঙ্গের গল্প পাঠের ইচ্ছা থাকিলেও তাহা পূর্ণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

যেহেতু তৎকালে কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও হুগলি ব্যতীত, এ প্রদেশে অন্য কোন স্থানে স্কুল ছিল না। নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, প্রতাপচন্দ্র পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী আরব্যোপন্যাস ও অন্যান্য কয়েকখানি ভাল ভাল গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, এবং শুদ্ধরূপে ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিতে পারিতেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার এতদূর বিদ্যা হইয়াছিল। তিনি সুবিখ্যাত বাবু রামতনু লাহিড়ীর অগ্রজ ছিলেন। তিনিই রামতনু, রাধাবিলাস, শ্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ, ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ক্রমশঃ কলিকাতায় লইয়া যাইয়া স্কুলে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। রামতনুবাবুর পূর্ব্বে বা তাঁহার সময়ে, এ জেলার আর কেহ হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন কি না, তাহা আমি জানি না।

ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ ৪ জন

যখন পারস্যভাষা রাজকার্য্যে অব্যবহৃত হয় তখন আমি টেলিমেকাস ও ক্যাম্বেলের প্লেজারস্ অব্ হোপ পড়িতেছিলাম। রীতিমত না পড়িলে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত দুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম, এবং নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যোপযোগী পুস্তকসকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম ; এবং একবৎসর মধ্যে তিনখানি রিডর ও একখানি "গ্রামার" পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এবং কয়েকমাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। ৩৷৪ মাস গত হইলে প্রথমশ্রেণীভুক্ত হইলাম। এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক কয়েকখানি আমার সহপাঠীরা দ্বিতীয়বার পড়িতেছিলেন। শ্রীপ্রসাদ আমার সুগমের জন্য অল্প অল্প পাঠ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অপ্রতিভ করিবার মানসে অধিক পাঠ লইতে লাগিলেন। এত অধিক পাঠ অভ্যাস করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইল। শ্রীপ্রসাদ তাঁহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া এই শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণী করিয়া

বিদ্যায় লজ্জাত্যাগ

আমার নিমিত্ত নূতন একটি প্রথম শ্রেণী করিলেন, আর কহিলেন, যে শ্রেণীভুক্ত কার্ত্তিক (আমি) থাকিবেন, সেই শ্রেণীতে আমার বিশেষ মনোযোগ থাকিবে। যদি ইচ্ছা হয় ত এই শ্রেণীভুক্ত তোমরাও হইতে পার। প্রথমে আমার আত্মীয় তারিণীচরণ রায় ও ভুবনমোহন মল্লিক এই শ্রেণীতে উঠিলেন। কিছুদিন পরে আমার বিদ্বেষী দুইজনও আমাদের সহাধ্যায়ী হইলেন। এই শ্রেণীতে আমাদের সকলেরই অপঠিত পুস্তক ব্যবস্থাপিত হইল। সুতরাং যদিও আমার সহপাঠীরা ছয়-সাত বৎসর পড়িতেছিলেন, এবং আমি কেবল দুইবৎসর মাত্র পাঠারম্ভ করিয়াছি, তথাপি আমাদের সকলের পক্ষেই পাঠ্যপুস্তক নূতন হওয়াতে আমি তাঁহাদের সহিত সমান ভাবে পড়িতে লাগিলাম, এবং তাঁহাদেরও কোন অসদ্ভাবের কারণ রহিল না।

কালীচরণ ও রামতনু

শ্রীপ্রসাদের কনিষ্ঠ কালীচরণও আমাকে যারপরনাই ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তকসকল আনিয়া দিতেন এবং বাটীতে অবস্থানকালে আমার পাঠের বিষয়ে নানারূপ সদুপদেশ দিতেন।

তিনি আমার অধীত পারস্য গল্প শুনিতে অতিশয় ভালবাসিতেন। আমি যেমন তাঁহাকে এই সকল গল্প শুনাইতাম, তিনিও তেমনি আমায় পড়া বলিয়া দিতেন। তিনি কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ বাবু রামতনু লাহিড়ী সে সময় হিন্দু কালেজের একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বৎসরের মধ্যে যে কয়েকদিন বাটী থাকিতেন, সে কয়েকদিন মধ্যে মধ্যে আমাদের পরীক্ষা লইতেন; এবং বহু সদুপদেশ দ্বারা আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে যত্ন করিতেন।

পৌত্তলিকতা ধর্ম্মে

প্রথমে শ্রীপ্রসাদ ও আমার স্বদেশীয় প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। আমরা যথাবিধি ইষ্টদেবতাব পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতাম না, আমাদের ৩৩ কোটী দেব দেবী মানিতাম, এবং প্রেত প্রেতিনী বিশ্বাস করিতাম। রামতনু বাবু যখন পৌত্তলিক ধর্ম্মের অলীকতার বিষয়

কহিতেন তখন ভাবিতাম যে, ইংরাজী পাঠ ও ইংরাজী সংসর্গে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছে। প্রথমে আমরা তাঁহার কথায় মনে মনে উপহাস করিতাম, এবং পুস্তকে পৃথিবীর আকার, গতি, আকর্ষণ প্রভৃতি যাহা পড়িতাম, তাহার কিছুই প্রত্যয় করিতাম না। কুক সাহেবের অবনীভ্রমণ নিতান্ত অমূলক ভাবিতাম।

যে সংস্কার পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে, যে সংস্কার স্বদেশেব সমস্ত লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে এবং যে সংস্কার আমারও হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সহসা নিরাকৃত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু কাল-সহকারে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ক্রমশঃ আমাদের সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল, এবং স্বদেশীয় ধর্ম্মের ও আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতিতা হ্রাস হইতে লাগিল। আত্মীয়-বন্ধুর সহিত সর্ব্বদাই এই বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করিতে বিশেষ যত্ন হইল, এবং মিথ্যাকথন, উৎকোচ-গ্রহণ, ইন্দ্রিয়দোষ, ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। আর ইংরাজী বিদ্যার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদেব বাহ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পবিবর্ত্তন ঘটিল।

গণিকালয়ের ইতিহাস

এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এমন কি গণিকালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত পুণ্যসমূহ বহির্দ্বারে রাখিয়া যাইতে হয়, এবং তজ্জন্য সেই বহির্দ্বারের ভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা দুর্গাপূজাব মহাস্নানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীন-দিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইত না।

কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে কয়েকঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয়সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে, ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা

ইহার পূর্ব্ব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহরাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন।

সঙ্গীতানুবাগ

বাল্যকালাবধি আমার সঙ্গীতবিদ্যায় অতিশয় অনুরাগ ছিল। ১০।১২ বৎসর বয়সেই আমি ঢোলক ও তবলা কিছু কিছু বাজাইতে পারিতাম। গীতশ্রবণে বড়ই আনন্দ হইত, কিন্তু স্বয়ং গাইতে কখনও চেষ্টা করিতাম না। আমার সমবয়স্ক ও স্বসম্পর্কীয় শান্তিপুরনিবাসী জনৈক যুবা আমাদের গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে আইসেন। তিনি বাঙ্গালা ১০।১২টি গীত কোন গায়কের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং তাহা অতি সুন্দররূপে গাইতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরূপে তোমার মিষ্ট স্বর হইল। তিনি উত্তর করেন যে, ওস্তাদের উপদেশানুসারে স্বর সাধিতে আমার ঐরূপ স্বর হইয়াছে। অমিও তাঁহার উপদেশানুসারে স্বর সাধিলাম। এবং দুইমাস মধ্যে তাঁহার অভ্যস্ত গীত কয়েকটি শিখিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যে আমার স্বরের প্রসংসা হইল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আমার সঙ্গীতে আনন্দিত হইতেন। আমাদের তৎকালীন রাজকুমার শ্রীশচন্দ্রকে শ্রীপ্রসাদ যখন ইংরাজী পড়াইতে যাইতেন, তখন আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে রাজবাটী যাইতাম। একদিন রাজপুত্র শ্রীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমাদের মধ্যে কেহ গাইতে পারেন ?" শ্রীপ্রসাদ আমাকে দেখাইলেন। রাজনন্দনের অনুরোধে

আমি একটি গীত গাইলাম। তিনি আমার স্বরের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার গায়ক মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট গীত অভ্যাস কর।" মাধবের নিকট ভৈরবী রাগিণীর সারে গম একটি, ভৈরব রাগের খেয়াল একটি, আর আলাইয়া রাগিণীর খেয়াল তিনটি শিখিলাম। যদিও সন্ধ্যার পর রাজবাটী যাইতাম, তথাপি পড়াশুনার ক্ষতি হইবে একারণ সঙ্গীতশিক্ষায় বিরত হইলাম। কিন্তু রাজপুত্র অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া কখন কখন রাজভবনে যাইতাম ও নানারূপ সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম। ইহাতে এ-শিক্ষায় অনেক ফল হইত।

পড়িবার অনেক সময় নষ্ট হয় বলিয়া আপাততঃ সঙ্গীত শিক্ষা রহিত করিলাম বটে, কিন্তু ইহার অভিলাষ এককালে ত্যাগ করিলাম না। একবর্ষ পরে পুনরায় মহেন্দ্রচন্দ্র খাজাঞ্চি মহাশয়ের নিকট অনেকগুলি খেয়াল ও টপ্পা শিখি। কয়েক বৎসরান্তর কলিকাতার হচ্ছু খাঁ নামক একজন গায়কের নিকট ৪০।৫০টি খেয়াল শিক্ষা করি। এই পর্য্যন্তই আমার শিক্ষার সীমা হয়।

বোধ হয় এক্ষণে আমার ২০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। যে কয়েক বৎসর আমি ইংরেজী পড়ি সে কয়েক বৎসর আমার বড়ই সুখে অতিবাহিত হয়। শ্রীপ্রসাদ, কালীচরণ, তারিণীচরণ রায়, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র লাহিড়ী, ভুবনমোহন মল্লিক, ভগবানচন্দ্র দত্ত, প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইঁহারা সকলেই আমাকে যারপরনাই ভালবাসিতেন। আমি সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট থাকিতাম। দিবসে আহার করিবার নিমিত্ত একবার বাড়ী যাইতাম। রাত্রিতেও মধ্যে মধ্যে শ্রীপ্রসাদের বাটীতে থাকিতাম ; আমাদের মধ্য কেবল কালীচরণ কলিকাতায় থাকিতেন। কিন্তু ছুটী পাইলেই বাটী আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশিতেন। আমরা প্রায় সকলেই দিবাযামিনী একত্র থাকিতাম। কয়েকজনই পরস্পরকে সহোদর জ্ঞান করিতেন। কখন কখন অতি প্রত্যূষে বা বৈকালে শ্রীবনে বা লালবাগানে বেড়াইতে যাইতাম। কখন কখন সেই স্থানে বসিয়া নভেল পড়িতাম, কখন গীত গাইতাম। একজনের পীড়া হইলে অন্য কয়েকজন দিবারাত্রি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা

সখা-সুখ

করিতেন। আমাদের চরিত্র দর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন, এবং আমাদের প্রণয়কে অকপট পবিত্র প্রেম বলিয়া প্রশংসা করিতেন। ইদানীন্তন যুবকগণ আমাদের প্রণয়ের কাহিনী শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রসাদ আমাকে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ কহিতেন। আমাকে সুখী দেখিলে সুখী হইতেন, দুঃখী দেখিলে দুঃখী হইতেন। তাঁহার যে খাদ্য ভাল লাগিত, তাহার কিয়দংশ আমাকে না দিলে তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইত না। কালীচরণ বড় খোস্ পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি, উড়ানি ও বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাটী আসিতেন, তখন ইহার কোন কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন, আর কহিতেন, "ছোট দাদা, এসকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায়, তেমন আমার অঙ্গে দেখায় না।" আবার কখন কখন আমার মোটা বস্ত্র লইয়া তাঁহার ভাল বস্ত্র আমাকে দিতেন।

যদি বিবেচনা করা যায় যে, তাঁহারা আমার পিস্তুতো ভাই, সুতরাং আমাকে ত তাঁহাদের ভালবাসিবার সম্পর্ক, কিন্তু অন্যান্য নিঃসম্পর্কীয় বান্ধবগণ যে আমার কি গুণ দেখিয়া আমাকে এত ভালবাসিতেন, তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারি না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। একই ব্যক্তিতে এতাদৃশ যুগপৎ স্নেহ ও ভক্তি প্রায় দৃষ্ট হয় না। অতি অশান্ত ও সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। যে সময় আমি মেডিকেল কালেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় থাকি, সে সময় আমরা যে বাটীতে থাকিতাম, প্রসিদ্ধ মদনমোহন তর্কালঙ্কারও সেই বাটীর একাংশে অবস্থান করিতেন। রামলাল ও শ্যামলাল নামে তাঁহার দুই বিখ্যাত দুরন্ত খুড়তত ভাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তাহারা কাহারও বাধ্য ছিল না, কিন্তু আমার বশীভূত হইয়াছিল, এবং আমাকে গুরুর ন্যায় মান্য করিত ও আমার সকল কথা শুনিত। আর একটি এইরূপ দৃষ্টান্ত না লিখিয়া ক্ষান্ত

স্নেহ ভক্তি সৌভাগ্য

হইতে পারিলাম না। আমার কোন স্বসম্পর্কীয় পরিবারের মধ্যে একটি কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্তা বধূ ছিলেন। ইনি কাহারও বাধ্য ছিলেন না; সংসারের কার্য্য স্বেচ্ছামত করিতেন। কিন্তু কোন দিন রন্ধন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, আমি তাঁহাদের বাটীতে আহার করিব শুনিলে, রন্ধন করিতে যাইতেন। একদিন তিনি রন্ধনকরণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে, তাঁহার শাশুড়ী কহিলেন, "তবে তোমার ঠাকুরপো উপবাস করিয়া থাকুন।" ইহা শ্রবণমাত্র তিনি পাকগৃহে যাইয়া রন্ধন করিলেন। কিন্তু পরিবেশনকালে আমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত রুষ্টা হইলেন। ইহার পর ইচ্ছা না থাকিলে আর কাহারও কথায় বিশ্বাস না করিয়া আমাকে না দেখিলে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট হইতেন না। এক্ষণে কখন কখন ভাবি যে, সে সময় অপেক্ষা আমার আকার-গত বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহা দেখিতেছি, কিন্তু যে গুণে আমার প্রতি আত্মীয়দের স্নেহ ও ভক্তিভাব ছিল, তাহার তিরোধান কিরূপে হইল, তাহা বুঝিতে পারি না।

বায়ুগ্রস্তা কুলবধূ

আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি স্বরের জন্যই হউক, অথবা এইসকল কারণের সমষ্টিতে হউক, আমাকে স্ত্রীলোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শুনিয়াছি, বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ হয় যে, আমার স্বরের গুণেই কামিনীকুল আমাকে এত ভালবাসিতেন। কারণ, তৎকালে আমাদের মধ্যে আমা অপেক্ষা অনেক সুপুরুষ ও মিষ্টভাষী ছিলেন। যখন দেখা যায় যে, পুরুষের মধ্যে যাহার হৃদয় যে পরিমাণে কোমল, তিনি সেই পরিমাণে সঙ্গীতানুরাগী হন, তখন কোমল রমণীহৃদয় যে সঙ্গীতবিলাসী হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? পশ্বাদির মধ্যে যে হরিণ জাতি সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়, তাহারও কারণ বোধ হয় ঐ কোমল স্বভাব। ব্রজবালারা শ্রীকৃষ্ণের রূপে ততদূর মুগ্ধ হয় নাই, যতদূর তাঁহার বংশীর ধ্বনিতে হইয়াছিল। সুকণ্ঠনিঃসৃত স্বরে কখন কখন পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়াছে। আমার

রমণীগণের ভালবাসার হেতু

জ্যেষ্ঠতুতো ভ্রাতার এক মাতুলের অতি সুমধুর স্বর ছিল। তিনি

সঙ্গীত ও দস্যু

একদা রাত্রিতে প্রসিদ্ধ তস্কর বিশ্বনাথের হস্তে পতিত হন। তাঁহাকে বধ করা স্থির হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জন্মের শোধ একবার মায়ের (কালীর) নাম করিবার প্রার্থনা করেন। দস্যুরাজ তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলে, তিনি "এবার বাজি ভোর হল" এই প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী গীত আরম্ভ করেন। তাঁহার গীত শুনিয়া তস্করদিগের নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। তাহারা তাঁহাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল, এবং সঙ্গে লোক দিয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিল।

আমি যেখানেই যাইতাম, সেইখানেই আমি সকলের প্রিয় হইতাম। বন্ধুবর্গের সভায় আমি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহারা

এখন আর তখন

আমার সমাগমাভাবের জন্য কতই বিষাদ প্রকাশ করিতেন। আহা! সে সুখের কাল অনেক দিন বিগত হইয়াছে, এত যে প্রিয়তম পুত্র কন্যা পাইয়াছি, অপেক্ষাকৃত ধন ও মান প্রাপ্ত হইয়াছি, উদ্যান করিয়া বাল্যাভিলাষ পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আর সে অভাব দূর হইতেছে না। এক্ষণে যেন আর এক পৃথিবীতে রহিয়াছি। সে পৃথিবীতে যে সকল নয়নসুখকর ও হৃদয়রঞ্জক বস্তু দেখিয়াছি, এ পৃথিবীতে যেন তাহার কিছুই নাই। পূর্ব্বে যে সকল প্রিয়তম বান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ জীবিত আছেন; কিন্তু তাঁহাদেরও ত আর পূর্ব্বমত প্রণয় দেখিতে পাই না। অথবা আমারই মন আর সে প্রণয়ের সুখানুভব করিতে পারে না। কখন ভাবি আমার যে দশা হইয়াছে, তাঁহাদেরও সেই দুরবস্থা ঘটিয়াছে! বোধ হয়, যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখই তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যে সকল সুখভোগ করিয়াছি, সে সব সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র যেন পলাইয়া যায়। ধরিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তৎসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা হয় না। স্পৃহা দূরে থাকুক, তাহার নামও উল্লেখ করা যায় না। যে কয়েকজন বান্ধব জীবিত আছেন, তাঁহাদের আর

বন্ধুদর্শনাভিলাষ দৃষ্ট হয় না ; যে রমণীরা আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত কতই ব্যাকুল হইতেন, এবং আমাদের সহিত আলাপ করিয়া কতই সুখ ও আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা আর ত আমাদের নামও করেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদের বাটীতে যাইলে গুরুজনের ভয়ে সহসা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না, তথাপি নানা কৌশল করিয়া আমাদিগকে দর্শন দিতেন। এক্ষণে তাঁহারাই বাটীর প্রধানা হইয়াছেন, গুরুজনের ভয় করিতে হয় না। তথাপি হঠাৎ চারি চক্ষু একত্র হইলে মুখ ফিরাইয়া যান। শুদ্ধ তাঁহাদের দোষ দেওয়া অন্যায়, আমাদেরও ত সেই ভাব হইয়াছে। তাঁহাদের দর্শনে ও কথনে আমরা যে স্বর্গলাভ করিতাম, সে স্বর্গের জন্য আর ত এক্ষণে ব্যস্ত হই না। যেমন বসন্তাবসানের সঙ্গে মলয়ানিলের স্নিগ্ধকর হিল্লোল, কুসুমকাননের শোভা, এবং কোকিলের সুমিষ্ট স্বর তিরোহিত হয়, তেননই বোধহয় যৌবনের সঙ্গে জীবনের সকল সুখ পলায়ন করে।

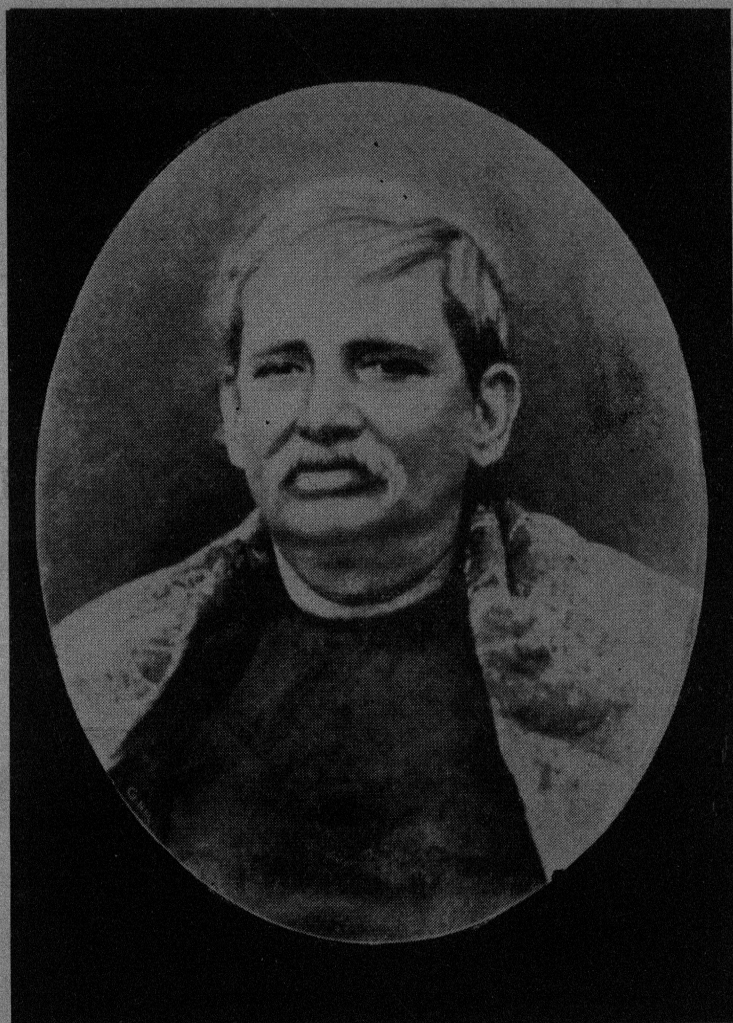
বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। এককথা শেষ করিলে আর এককথা স্মৃতিপথে আইসে। হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দূষণীয় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইত না। মিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরতা ছিল না। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের সকল ভাবই যেন নির্ম্মল রসে পূর্ণ থাকিত। বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনী মূর্ত্তি দিনযামিনী হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল, সে মূর্ত্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা হইত না। দৈবাৎ স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিত্রভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎসর। এ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধবর্ত্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। হাসিলে তাঁহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যেমন নয়নরঞ্জন করিত, হাসির মধুর ধ্বনিতে কর্ণকুহরে তেমনই সুধাবর্ষণ হইত। তিনি আমার সঙ্গীতে যেরূপ পুলকিত

মনোমোহিনী কামিনী

হইতেন, আমিও তেমনই তাঁহার মধুর মনোহর স্বরে মোহিত হইতাম। কিন্তু তিনি যেমন আমার গান ইচ্ছা করিলেই শুনিতে পাইতেন, আমাদের দুর্ভাগা দেশের প্রথাবশতঃ আমি তাঁহার গীত সেরূপ শুনিতে পাইতাম না। তিনি যখন নিভৃত স্থানে সঙ্গিনীমণ্ডলে মধুকরের ন্যায় মৃদুমধুর স্বরে গান করিতেন, তখন আমি লুক্কায়িত থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে তাঁহার গীত শ্রবণ করিতাম। কখন কখন তিনি আমার সমাগম বুঝিতেও পারিতেন, অথচ যেন জানিয়াও জানিতেন না। যদি কোন সখী কহিত যে, কেহ চুরি করিয়া তোমার গান শুনিয়াছে, তিনি যেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেন, "কি লজ্জা! আর ত আমি কখনও গাহিব না।" কিন্তু আমি যেরূপ তাঁহাকে গান শুনাইতে ভালবাসিতাম, তিনিও তেমনই আমাকে তাঁহার গান শুনাইতে ভালবাসিতেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

আহা! দেশ বিজাতীয় শাসনের অধীন হওয়াতে আমরা কত প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইয়াছি। ভদ্রমহিলার সঙ্গীত কর্ণগোচর হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের মুখমণ্ডল নয়নগোচর হওয়াও নিষিদ্ধ। সকল পুরাণ ও নাটক আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছে যে, পুরাকালীন রমণীরা বিনা অবগুণ্ঠনে সাধারণসমক্ষে আসিতেন, কথোপকথন করিতেন। মহোৎসব বা তীর্থদর্শনে যাইতেন, এবং পুরুষদিগের প্রায় সকল আমোদেরই অংশিনী হইতেন। রাজকন্যারা জনাকীর্ণ সভায় আসিয়া আপনাদের রূপলাবণ্য দেখাইতেন। এবং দেখিয়া শুনিয়া পাত্রের গলদেশে বরমাল্য দিতেন, নৃত্যগীত অভ্যাস করিতেন, এবং তদ্বিষয়ের নৈপুণ্য দেখাইতেন। মহাভারতের কোন স্থানে বর্ণিত আছে যে, দ্রৌপদী ও সুভদ্রা প্রভৃতি রাজমহিষীরাও কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতি পুরুষদিগের সহিত জলকেলি করিতে যমুনায় যান, এবং ইচ্ছামত সুধাপান করিয়া বিবিধ প্রকার আমোদ করেন। তবে ইউরোপীয় কামিনীকুলের যতদূর স্বাধীনতা আছে ততদূর হিন্দু মহিলাগণের ছিল না। শ্বেতাঙ্গনাগণ যেরূপ স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, বর্ম্মে বাজারে পরপুরুষের সহিত আলাপ করেন, এবং যেরূপ অন্য পুরুষের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া নাচেন, সেরূপ স্বাধীনতা তাঁহাদের ছিল না।



স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়

ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে মুসলমানদিগের দীর্ঘব্যাপী শাসন ছিল না, সেই সেই প্রদেশে অদ্যাপিও পূর্ব্বতন নিয়ম অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এক্ষণেও মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পৌরাণিক প্রথা প্রচলিত আছে। বম্বেতে অদ্যাপি মহারাষ্ট্রীয় কামিনীরা রাজবর্ত্মে বিনা অবগুণ্ঠনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অশ্বচালনায় নৈপুণ্য দেখান। সেদিন ঝান্সীর রাণীও এ বিষয়ের কি চমৎকার নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। নিকটের মধ্যে মণিপুর অঞ্চলে এক্ষণেও পূর্ব্ব ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আমি বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের পিতা বাবু রামলোচন ঘোষের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি যৎকালে ঐ অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একদা মণিপুরের রাজভবনে কৃষ্ণলীলা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া প্রথমে রাজাকে এক মোহর নজর দেন। রাজা তাহা গ্রহণ করেন। পরে রাণীর সম্মুখে ঐরূপ নজর ধরিলে তাহাও রাজা লন, ও ঘোষ বাবুকে কহেন যে, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষ স্পর্শ করেন না। কিঞ্চিৎ পরে রাজমহিষী ও রাজপরিবারস্থ অন্যান্য কামিনীরা সভামধ্যে নৃত্যগীত করেন। উৎসব শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনাদের দেশে এরূপ আমোদ হইয়া থাকে কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমাদের দেশে স্ত্রীদিগের সভামধ্যে আসিবার রীতি কখনও প্রচলিত নাই।" রাজা কহিলেন, "এ রীতি কখনও নাই, একথা কহিবেন না। আপনি বিজ্ঞ হইয়া মহাভারতের কাহিনী কিরূপে বিস্মৃত হইলেন? ভারতবর্ষে বহুকালাবধি এ রীতি প্রচলিত আছে, তবে যে যে অঞ্চলে যবনেরা উপনিবেশ করিয়াছে, সেই সেই অঞ্চলে এ রীতি তিরোহিত হইয়াছে।"

মণিপুরের রাজমহিষীর নৃত্য

ঘৃণাস্পদ বারবনিতার গীতে যে আমোদ হইয়া থাকে, তদপেক্ষা পবিত্র কুলকামিনীর সঙ্গীতে কতই অধিক আনন্দ হইতে পারে। যদি কোন উৎসবে গণিকার পরিবর্ত্তে কুলস্ত্রীর সঙ্গীত হইবার নিয়ম হয়, তবে নির্ধনীর ভবনেও শুভকর্ম্মে এ পবিত্র সুখলাভ হইতে পারে। ইংরেজী রীতির অনুকরণের যেরূপ লালসা হইতেছে,

ও স্বদেশস্থ কোন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এ পবিত্র প্রথার যেমত সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে, এ হৃত সৌভাগ্যটির পুনঃপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বহুকাল থাকিবে না।

পূর্ব্বে যে রমণীর কথা বলিতেছিলাম, তিনি স্বামীকেও যথেষ্ট ভালবাসিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তবে বোধ হইত, যেন আমাকে কিঞ্চিৎ অধিক ভালবাসিতেন। তিনি যে আমাকে ভালবাসিতেন, তাহা তাঁহার স্বামীও জানিতেন। হোরির সময় তাঁহার পতি ও আমি একত্র তাঁহার গাত্রে আবির দিতাম। আমার তের বৎসর বয়স হইতে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ সুখের অবস্থা ছিল। তাহার পর সহসা এ সুখের সাগর শুকাইয়া গেল। বোধ হয়, তাঁহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল। কতদিন তাঁহার মনের এ ভাব হইয়াছিল তাহা আমি জানিবার চেষ্টা করি নাই। তাঁহার চরিত্রের প্রতি আমার অন্তরে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে পবিত্র নয়নে দেখিতাম এবং পবিত্র মনে ভালবাসিতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে কেন এত ভালবাসিতাম এবং তিনিই বা আমাকে কেন এত ভালবাসিতেন, তাহা একবারও ভাবিতাম না। এক দিবস তাঁহার কিঙ্করী সহসা আমাকে কোন কৌশলে তাঁহার মনের ভাব জানাইল, আমি অত্যন্ত বিরক্তভাবে তাহাকে কহিলাম যে, "তাঁহাকে আমি মায়ের মতন জ্ঞান করিয়া থাকি, তাঁহার এরূপ অভিলাষ কখনই হইতে পারে না। তুই নিতান্ত মিথ্যাকথা কহিতেছিস্; তাঁহার স্বামীকে তোর ব্যবহারের কথা বলিয়া দিব।" আমার কথায় সে অতিশয় ভীত হইল এবং নিজ দোষক্ষালনের জন্য, কি কি কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

প্রণয়ে জীবনের প্রথম পরীক্ষা

দাসীটিও যুবতী ছিল, এ কারণ ভাবিলাম যে, তাহার নিজের অভিলাষ পূর্ণ করণার্থ আমাকে এই ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমার এ সন্দেহ অচিরাৎ দূরীভূত হইল। ইহার পর হইতেই ঐ রমণী আর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না; এবং আমার সম্মুখ দিয়াও যাইতেন না। এমন কি, আর আমার নামও করিতেন না।

তাঁহার ভালবাসা গেল, কিন্তু আমার ভালবাসা পূর্ব্বমতই রহিল। তাঁহার জন্য বড়ই দুঃখ হইত ; কিন্তু তাঁহার প্রতি ঘৃণা একবারও হইত না। তাঁহাকে আর পূর্ব্বমত বাহিরে দেখিতে পাইতাম না। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি দুইটি সন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মলমূত্র সহিত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রার খাটে তুলিয়া দেই।

উপরি উক্ত ঘটনাটি আমার জীবনের এক প্রধান পরীক্ষা বলিয়া আমি তাহার এত বাহুল্য বর্ণনা করিলাম। আমার সেই বয়সে ও সেই সময়ে, আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপপঙ্কে পতিত হই নাই, ইহা অদ্যাপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়।

আমি পূর্ব্বে একস্থানে লিখিয়াছি যে, পারস্য গ্রন্থে কাশ্মীরের স্বাভাবিক শোভার প্রশংসা পড়িয়া, তদ্দেশ দর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থের একস্থানে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আকবর কাশ্মীরের প্রধান দ্বারের শিরোভাগে এই কবিতা খোদিত করাইয়া দেন যে,—

কাশ্মীর-দর্শনেচ্ছা

"যদ্যপি ধরণী 'পরে থাকে সুরালয়,
এই—এই সেই স্বর্গ জানিবে নিশ্চয়।"

এতদ্ব্যতীত সম্রাটের পত্রনিচয়ের মধ্যে যেখানেই কাশ্মীরের উল্লেখ আছে সেখানেই তিনি তদ্দেশকে স্বর্গসম, চিরবসন্ত ইত্যাদি রূপে বিশেষণ দিয়াছেন। সুতরাং এই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের বিষয়ে যাহার গাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহার হৃদয়ে যে ঐ দেশ দর্শনের কৌতূহল জন্মিবে, ইহার অসম্ভাবনা কি ? তবে আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম যে, যদি কখনও সুবিধা ঘটে, তবে নিশ্চয় ঐ দেশে যাইয়া নয়ন সার্থক করিব। এক্ষণে বান্ধবদের মধ্যে তারিণীচরণ রায়, ভুবনমোহন মল্লিক ও সীতাপতি মুখোপাধ্যায়ের সহিত অতি সঙ্গোপনে দেশভ্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলাম। তৎকালে সীতাপতি ব্যতীত আমাদের সকলেরই বয়স ১৮।১৯ বৎসর। সীতাপতির বয়স ২৪ কি ২৫ বৎসর। সে সময় তাঁহারই বাটীতে আমাদের মিলনস্থান ছিল। তিনি ইংরাজী পড়েন নাই, কিন্তু

গোপনে পরামর্শ

অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার সহিত আমাদের হঠাৎ প্রণয় হয়।

একদা রামতনুবাবুর পূর্ব্ব স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়াতে, আমাদের রাত্রিজাগরণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটায় মনঃসংযোগ না হইলে রাত্রি কাটান যায় না; একারণ আমি সুশ্রাব্য উপন্যাস বলিতাম। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেই তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতেন। রজনীর দিকে কাহারও মন থাকিত না। কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় আহার করিয়া আসিতেন, কেহ বা অধিক রাত্রিতে বাটী যাইতেন। ৩।৪ নিশি এইরূপে অতিবাহিত করা যায়। সীতাপতি এই কয়েক রাত্রিতেই গল্প শুনিতে আসিতেন। এবং আমাদের সংসর্গে সাতিশয় সুখী হন। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত আমাদের যথেষ্ট প্রণয় হইয়া উঠে এবং গোলযোগ না থাকাতে তাঁহার বাটী আমাদের সম্মিলনের স্থান হয়।

কিছুদিন পরে আমাদের দেশপর্য্যটনের পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। আমরা বস্ত্র, পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য স্ব স্ব বাটী হইতে সীতাপতির আলয়ে রাত্রিযোগে লইয়া যাইতে লাগিলাম। কাশী পর্য্যন্ত জলপথে যাওয়া স্থির হইয়া একখানি নৌকা ভাড়া হইল। আমাদের অভিসন্ধি প্রকাশ না পায়, এ কারণ নিজ নিজ বাটীতে কল্পিত বাক্য বলা গেল। নির্দ্ধারিত রাত্রিতে আমাদের দ্রব্যজাত নৌকায় উঠিল। সীতাপতি ও ভুবন সন্ধ্যার পরেই নৌকায় যাইয়া স্বয়ম্ভুনগরের নীচে থাকিবেন, আমি ও তারিণী একত্রিত হইয়া শেষরাত্রিতে তথায় যাইব, এইরূপ স্থির হইল। ঐ রাত্রে আমি শয়ন করিলে, আমার স্ত্রী আমার দেশান্তরে যাওয়া বুঝিতে পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এবং কোন কথাই বিশ্বাস না করিয়া জাগরিত থাকিলেন। রজনীশেষে উভয়েরই নিদ্রা আসিল। কিঞ্চিৎকাল পরে জাগরিত হইয়া দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। অমনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাত্রা করিলাম। পত্নীর প্রতি নেত্রপাত করিবারও সময় পাইলাম না। দ্রুতবেগে দৌড়িতে লাগিলাম। অর্দ্ধপথে তারিণীর সহিত একত্রিত হইয়া স্বয়ম্ভুনগরে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তরণী দেখিতে

নিষ্ক্রমণ

পাইলাম না। অতি কষ্টে খড়িয়ার ধারে ধারে চলিলাম এবং শেষে নবদ্বীপে সীতাপতির ও ভুবনের সাক্ষাৎ পাইলাম। তথা হইতে অবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দিলাম এবং তৃতীয় দিবসে নাবিকের গ্রাম ডাঁইহাটে পৌঁছিলাম। নৌকার সংস্কার ও দাঁড়ির যোগাড় করিতে তথায় তিন দিন গত হইল।

এক মাসের প্রয়োজনমত আহারীয় সামগ্রী সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। প্রাতে নিত্যক্রিয়াসমাপনান্তে আমরা পড়িতে থাকিতাম। মধ্যাহ্নে একটা চরে রন্ধন করিয়া আহারাদি করিতাম। তাহার পর কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাইতাম। বৈকালে পুনর্ব্বার পাঠে মনোযোগ দিতাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে তীরে উঠিয়া পদব্রজে যাইতাম, তরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত। কখনও দৌড়িতাম, কখনও নৌকার গুণ টানিতাম, কখনও বা ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিতাম। সন্ধ্যা হইলে নৌকার ছাতের উপর বসিয়া প্রায় রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত কখনও গগনমণ্ডলের শোভাসন্দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তাব মহিমা কীর্ত্তন কবিতাম, কখন বা কয়জনে সমস্বরে গীত গাইতাম। কোন রাত্রিতে রন্ধন হইত, কোন রাত্রিতে মিষ্টান্ন দ্বাবা ক্ষুধার নিবৃত্তি করা যাইত।

এই কয়েক দিবস আমাদের বড়ই সুখে গিয়াছিল। দিবাযামিনী সকলে একত্রে থাকা যাইত, পরস্পবের মনেব কথা ও ভাব সঙ্গোপন বিনা পরস্পরের কর্ণগোচর হইত। কাহারও নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইতে বা কোন বিষয় গোপন করিতে হইত না। সকল কথা ও কার্য্য স্বাধীনভাবে চলিত। একখানিও অপ্রিয় মুখ দৃষ্টিপথে আসিত না। একটিও অসুখকব কথা কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না। কত দেশ দর্শন করিব, কতপ্রকার আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্ম দেখিব, সঙ্গীত শিখিব, ও পারস্য বিদ্যা আরও পড়িব, এবং পরিশেষে যদি কোন স্থানে উপযুক্ত কর্ম্ম পাওয়া যায়, তবে কয়েক বান্ধবে একত্রে থাকিতে পারিব, ইত্যাদি কত বিষয়ের অভিলাষ রাত্রিতে শয়নাবস্থায় চিত্তে উপস্থিত হইত। অর্থাৎ, অপ্রবীণ যুবক-হৃদয়ে যে যে আশার উদয় হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই আমার মানস-ক্ষেত্রে বিচরণ করিত।

বন্ধুসহ ভ্রমণে সুখ

কয়েকদিন পরে পলাশীর সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রের নীচে আমাদের নৌকা উপনীত হইল। এই স্থান দর্শনে কতপ্রকার ভাবই মনে উদয় হইল। এই স্থানে প্রচণ্ড প্রতাপশালী, দুরাচারী সিরাজউদ্দৌলার সকল দর্পের ও দৌরাত্ম্যের অবসান হইয়াছিল। মীরজাফরের ও তাঁহার পরিবারের হৃদয়ে কতই সৌভাগ্যের আশা জন্মিয়াছিল, প্রপীড়িত ভূম্যধিকারীদের আশু শান্তির ও ভবিষ্যৎ সুখের কতই ভরসা হইয়াছিল, এবং ধূর্ত্তচূড়ামণি ইংরেজ জাতির চিত্তক্ষেত্রে কতরূপ নবাশার অঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেরই সকল আশা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ; কেবল ইংরেজদিগের দীর্ঘাকাঙ্ক্ষার তেজ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। কৃতঘ্ন মীরজাফরের বংশের আশাবৃক্ষ ক্রমেই শুকাইতে আরম্ভ হইল, এবং বঙ্গবাসী ভূম্যধিকারীদের আশা-ভরসার বিপর্য্যয় ঘটিল।

পলাশী-ক্ষেত্র

যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের উচ্ছেদকরণে উদ্যোগী হন, তাঁহাদিগকে ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্যগণ নিতান্ত অসার, অধার্ম্মিক এবং অপরিণামদর্শী বিবেচনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ লিখিয়াও মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন ; "পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা কবিবব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিতান্ত অবিজ্ঞ ও রাণী ভবানীকে অসাধারণ দূরদর্শিনী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি অতীব হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কোমলস্বভাবা কামিনীকুলের সুন্দর বদনের রসনাব্যক্ত সামান্য সুবিবেচনার কথাও জনসমাজে আদরণীয় হয়। যখন বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার বিষম বিপদুদ্ধারের গাঢ় মন্ত্রণা হইতেছে, যখন ঐ তিন বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করণের পরামর্শ চলিতেছে ; তখন রাণী ভবানী ব্যঙ্গচ্ছলে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষদিগের মন্ত্রণাকে সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ বলেন, এবং মহারাষ্ট্রীয় দ্বারা স্বদেশ স্বাধীন হইবে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন। এইটি অতি সুমধুর রচনা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রচয়িতা যদি সেই সময় এই গ্রন্থ রচনা করিতেন, তবে আর রাণীর রসনা দিয়া উক্ত কথা ব্যক্ত

পলাশী যুদ্ধ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা

করাইতে পারিতেন না। একালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যেরূপ আচার-ব্যবহার দেখিতেছেন, সেরূপ সেকালে ছিল না। সে সময় তাঁহারা এ দেশ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগকে প্রপীড়িত করিয়াছিল। এদেশস্থ লোকে তাহাদিগকে রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান করিত। সুতরাং এ অত্যাচারীদের দ্বারা বিপদুদ্ধারের উপায় হইবে, ইহা কাহার মনে উদ্ভাবিত হইতে পারে? আর এরূপ উদ্ভাবনা হইলেই বা কার্য্যসিদ্ধির কি সম্ভাবনা ছিল। নবাব আলিবর্দ্দির সময় মহারাষ্ট্রীয়গণও বারম্বার এই তিন রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইয়াছিল? প্রতিবারেই শেষে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা যে এক্ষণে বঙ্গ অধিকার করিয়া আমাদের দুর্দ্দশা দূর করিবে, তাহার কি সম্ভাবনা হইয়াছিল? কৌশলে নবাবসৈন্যকে অকর্ম্মণ্য করিতে না পাবিলে সিরাজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় ছিল না, এবং মীরজাফরের আনুকূল্য ব্যতীতও এ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার অসম্ভাবনা ছিল। সুতরাং একমাত্র মীরজাফরই সকলের ভরসাস্থল হইয়া উঠেন।

মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিয়া স্থির হইল যে, জগৎশেঠ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতিও কৃতঘ্ন? যখন সিরাজ তাহাদের প্রতি কোন বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই, তখন তাঁহারা বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধী কিরূপে হইতে পারেন? আর যখন তাঁহারা সিরাজকর্ত্তৃক পীড়িত ব্যতীত উপকৃত হন নাই, তখন তাঁহাদের উপর কৃতঘ্নতাদোষও কিরূপে বর্ত্তিতে পারে? এসকল রাজ্য সিরাজের পূর্ব্বাধিকারীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না।

আলিবর্দ্দি, সম্রাটের দুর্ব্বলতা দর্শনে, তাঁহার বশ্যতা হেলন করিয়া একরূপ স্বাধীন হন, এবং রাজ্যের হিতাহিত না চিন্তিয়া অসঙ্গত স্নেহবশতঃ এক দুরাত্মার হস্তে কোটি কোটি লোকের জীবন, মান, ধন ও ধর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যান। এই সকল লোকের একমাত্র উপায় জাফরের সহায়তা করা কি স্বাভাবিক নহে? জাফর নেমকহারাম বলিয়া কি ইহারাও নেমকহারাম হইল? আর, কি পুরাণে, কি ইতিহাসে, কোথায় এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয় না?

সে যাহা হউক, যদি নবাবের পরিবর্ত্তে ইংরাজের রাজ্য হওয়াতে আমাদের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, তাহা বিভিন্ন ঘটনাক্রমে হইয়াছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি কেহই ভাবেন নাই যে, এই সকল অধিকার নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়া ইংরাজকরস্থ হইবে। ইঁহারা কেন, ইংরাজেরাও ভাবেন নাই যে, তাঁহারা এসকল দেশের অধিপতি হইবেন। সুতরাং এসকল দেশের ইংরেজ-অধিকারের নিমিত্ত ইঁহারা দোষাস্পদ হইতে পারেন না।

মুরসিদাবাদ

পলাশী হইতে আমাদের নৌকা মুরসিদাবাদে উপনীত হইল। আমরা কেহই পূর্ব্বে এ বৃহৎ ও বিখ্যাত নগর দেখি নাই। যে নগর বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, যে নগরে এই তিন প্রকাণ্ড প্রদেশের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা বিরাজ করিতেন, যে নগরে কারাগারে এ কয়েক দেশস্থ বিপুল ভূম্যধিকারী ও বিশাল প্রতাপশালী লোক বন্দী থাকিতেন, যে নগরের রাজসিংহাসনের সম্মুখে ইংরেজ ফরাসিস প্রভৃতি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত জাতীয়গণ অবনতশির হইতেন, সেই নগরে কতই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিবার আশা ছিল। কিন্তু তথায় নয়নরঞ্জক বা হৃদয়ানন্দদায়ক কি বিস্ময়কর কোন চমৎকার বস্তু দেখিলাম না। নবাববাটীতে বড় কুঠী নামে একটি প্রাসাদ মাত্র দর্শনযোগ্য বোধ হইল। আর আর যাহা দেখিলাম, তাহাতে আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিষাদে হৃদয় অভিভূত হইল। নগরের যেন আধিপত্যের সঙ্গে জীবনও বিগত হইয়াছে। কাসিমবাজার দেখিয়া অন্তঃকরণে অতীব অসুখ উপস্থিত হইল। যেসকল বৃহৎ বৃহৎ

কাসিমবাজার

প্রাসাদে কতই বিষয়কার্য্য, কতই উৎসব, এবং কতই নৃত্যগীত হইয়াছে, সে সমুদয় এক্ষণে মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক বাটীর দ্বার প্রাচীর দিয়া এককালে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজপথে যে কয়েকজন অধিবাসী দেখিলাম, তাহাদের সকলেরই শরীর জীর্ণ ও কুৎসিত। নগরটি যেন যথার্থ ভূতপ্রেতের আবাসস্থল হইয়াছে। সেস্থানে অধিকক্ষণ থাকিতেও ইচ্ছা হইল না।

আমরা বাল্যাবস্থা হইতে এই কাসিমবাজারের অনেক ভূতপ্রেতেব গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলাম। যাঁহারা তথায় যাইতেন, তাঁহারাই আসিয়া নানাবিধ প্রেতযোনির গল্প করিতেন। যদি আমাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমবাও অনেক ভূত দেখিতে পাইতাম, এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহাদেব গল্প সকলকে শুনাইতাম। কবিকুলই যে কেবল অলৌকিক গল্পেব একচেটিয়া করিয়া রাখেন, এমত নহে। অন্য লোকও, ছন্দে বচিতে না পারুন, সাধাবণ বিশ্বাস্য অনেক অদ্ভুতকাহিনী কল্পনা করিয়া প্রকাশ কবেন। আমি ঐরূপ যেসকল গল্প শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি নিম্নে লিখিতেছি। ইহার বক্তা অতি ভদ্রলোক ছিলেন, এবং তাঁহার বর্ণিত ভূত তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ইহা শপথপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন।

ভূতের গল্প

ভূতবক্তা কহিলেন যে, "একদা মুবসিদাবাদ হইতে আসিবাব সময় সন্ধ্যাব প্রাক্কালে আমি কাসিমবাজাবে উপনীত হইলাম। দুই এক বাটীতে যে লোক দেখিলাম, তাহাবা আমাকে স্থান দিল না। এ স্থানেব ভৌতিক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শ্রুত থাকাতে, আশ্রয় পাইতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, আমি ততই ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলাম। শেষে ঠিক সন্ধ্যাকালে একটি বাটীতে প্রবেশ কবিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলাম যে, 'স্থানাভাবে ব্রহ্মহত্যা হয়; আমাকে একটু স্থান দিয়া প্রাণদান করুন।' বাটীর মধ্য হইতে কেহ কহিল যে, 'আপনি এই দিকে আসুন'। আমি আহ্লাদিতচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলাম। কিন্তু ব্যক্তিমাত্র দেখিলাম না। একটি কুঠাবি হইতে কেহ কহিল, 'ঐ ঘরে অতিথিসেবাব সমস্ত সামগ্রী আছে; আপনি যাইয়া প্রদীপ জ্বালুন ও হাত পা ধুইয়া বিশ্রাম করুন। ঘবে তামাক টিকা দেসেলাই আছে। আমি পীড়িত ও আমাব আব কেহ নাই।' এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, যাহাই হউক, ভূতের গ্রামে একটা স্থানও পাইলাম। প্রদীপ জ্বালিয়া পা ধুইলাম ও তামাক সাজিয়া খাইলাম। ভাবিলাম, রাত্রিতে আহার নাই হইল। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ ব্যক্তি কহিল, 'আমার বাটী অতিথি উপবাসী থাকিতে পারিবেন না। ঐ চালায় গাভী আছে; তাহার দুগ্ধ দুহিয়া ও কুলুঙ্গিতে যে চা'ল ও

চিনি আছে, তাহা দিয়া পরমান্ন রন্ধন কর। দুইজনের মত যেন হয়।' আমি উত্তর করিলাম, 'আমি ব্রাহ্মণসন্তান, গাই দুহিতে জানি না।'

তিনি কহিলেন, 'গরুটি আতি শান্ত, দুহিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। যদি না পার, তবে প্রস্থান কর।' আমি সে রাত্রিতে কোথায় যাই ? সুতরাং গাই দুহিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিলাম, এবং দুই পাথরে ঢালিলাম। পীড়িত ব্যক্তির নাকীস্বর হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এ লোকটি একবারও আমার নিকট আসিল না ও আমাকে নিকটে ডাকিল না। ভূতই বা হবে, এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমত সময় ঐ ব্যক্তি কহিলেন যে, 'তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঠিক ; কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিলে তোমার কোন বিপদ হইবে না। পরমান্ন একপাত্র রোয়াকে রাখিয়া দাও, দ্বিতীয় পাত্র তুমি খাও। ইহা না করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।' আমি ইচ্ছা না থাকিলেও আহার করিলাম এবং রোয়াকে সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে শুনিয়া বুঝিলাম যে, ভূতমহাশয়ও ভোজন করিতেছেন। হঠাৎ বহির্দ্দিকে দেখি ২৪।২৫ হাত পরিমাণ একখানি হস্ত রোয়াক হইতে নিকটস্থ গর্ত্তের জলে পাথর ধুইয়া তুলিতেছে! আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। 'যা করেন মা দুর্গা' বলিয়া শয়ন করিলাম। ভূতমহাশয় পুনরায় কহিলেন, 'পশ্চিম দিকে আমার ভাইয়ের বাটী আছে। প্রাতে তথায় যাইয়া তাহাকে কহিবে, যেন গয়ায় যাইয়া শীঘ্র আমার পিণ্ড দেয়।' আমি উত্তর করিলাম 'আচ্ছা তাহাই করিব'। নিদ্রা কিছুমাত্র হইল না। প্রভাত হইবামাত্র যাত্রা করিলাম। কিন্তু গ্রামের বাহিরে যাইবামাত্র এক ভয়ঙ্কর আকার সম্মুখে আসিয়া কহিল, 'আমার ভাইকে যে কথা বলিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলে তাহা বলিয়া আইস, নতুবা তোমার ঘাড়, মটকাইয়া দিব।' আমি কহিলাম, 'ভূতমহাশয়! তোমরা দিবসেও বাহির হইয়া থাক, তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, তোমার ভাইয়ের কাছে চলিলাম।' ভূত তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। অমি পুনরায় নগরে যাইয়া ভূতের ভাইকে ঐ কথা বলিয়া প্রস্থান করিলাম।"

সেকাল ও একালের ভূত

এই অদ্ভুত গল্প শুনিয়া এক্ষণকার সকলেই উপহাস করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসকল প্রেতাত্মার ব্যাপার ঘটিতেছে, তৎসমুদয় কেহ বা শ্রদ্ধার সহিত শুনিবেন, কেহ বা কহিবেন যে, আমি ইহার সত্যাসত্যের কিছু বুঝিতে পারি নাই। ফলতঃ অল্প লোকেই ইহাতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন। যেমন পূর্ব্বকালীন লোকেরা ভূতপ্রেত দেখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন, ইদানীন্তন অনেক সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ লোকও স্পষ্টাক্ষরে সেইরূপ কহিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যেমন ভূত ও ব্রহ্মদৈত্য আসিত, ইঁহাদের মধ্যেও তেমনি অশিষ্ট ও শিষ্ট প্রেতাত্মা আসিয়া থাকে। সেকালে যেমন মনুষ্যবিশেষের শরীরে ভূতের আবির্ভাব হইত, একালেও তেমনই মানবদেহে ভূতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তবে তাঁহারা যাহাকে "ভূত" বলিতেন, ইঁহারা তাহাকে "প্রেতাত্মা" বলিয়া থাকেন; তাঁহারা যাহাকে "ভূত-পাওয়া" বলিতেন, ইঁহারা তাহাকে "মিডিয়ম্" নাম দিয়া থাকেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, ভূতে পেলে শীঘ্র ছাড়িত না, প্রেতাত্মা অধিকক্ষণ থাকে না। ইদানীন্তন যেমন একজন সুবিখ্যাত, সুশিক্ষিত এবং সুপ্রবীণ কহেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর প্রেতাত্মা পূর্ব্বস্নেহবশতঃ অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে কি প্রতি রাত্রিতেই তাঁহার শয়নাগারে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন, সেকালেও ভালবাসার জন্য কোন কোন স্ত্রীর প্রেতাত্মাবা তাহার স্বামীর শরীরে প্রবেশ করিত; তবে ইনি যেমন স্ত্রীর প্রেতাত্মার সংসর্গে সুখী হন, সেকালের স্বামীরা তাঁহাদের স্ত্রীর প্রেতাত্মার আবির্ভাবে সুখী হইতেন না, এবং তাহাদিগকে রাখিতে চেষ্টা করিতেন না, বরং তাড়াইবার জন্য ওঝার সহায়তা লইতেন, আর পুরাকালীন ভূতের চরিত্রের প্রশংসা শুনা যাইত না, ইদানীং তাহা শুনা যাইতেছে। কিন্তু এ বিভিন্নতাও অবোধ্য নহে। কারণ এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্বে লোকের যেরূপ স্বভাব, জ্ঞান ও চরিত্র ছিল, তাহাদের প্রেতাত্মারও ঐ সকল সেইরূপ হইয়াছিল। একালে লোকের সভ্যতা যেরূপ হইতেছে, তাহাদের প্রেতাত্মারও সভ্যতা সেই পরিমাণে

বাড়িয়াছে। বিবেচনা করিতে গেলে যদি পূর্ব্বেকার ভূতগণ আসিয়া আমাদের সহিত ঐরূপ তর্ক করে যে, যদি তোমরা একালের ভূত-যোনির অস্তিত্ব স্বীকার কর, তবে কি অপরাধে আমরা অস্তিত্ববিহীন হই? আমার সামান্য বুদ্ধিতে ত এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর উদ্ভাবিত হয় না।

জঙ্গীপুরে পথরোধ

মুরসিদাবাদে আমরা এক দিবারাত্রি অবস্থান করিলাম। ইহার দুই দিবস পরে আমাদের তরণী জঙ্গীপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। এইখানে টোলঘাট থাকাতে আমাদের ছাড় করিবার প্রয়োজন হইল। তারিণীর এক পিসতুত দাদা ঐ ঘাটের একজন মোক্তার ছিলেন। তারিণীর গুরুজনেরা কিরূপে আমাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এবং অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের নৌকার আকার ও মাজির নাম জানিয়া ঐ মোক্তারমহাশয়কে লেখেন। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র দুই দিবসাবধি উজানবাহিনী সমস্ত তরণী ঘাটের দারোগা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখেন। আমাদের নৌকা যখন ঘাটে পৌঁছে, তখন তিনি তথায় ছিলেন, এবং দর্শনমাত্র তরী চিনিতে পারিলেন। পরে বলপূর্ব্বক আমাদিগকে স্বস্থানে লইয়া গেলেন, এবং

বাটী প্রত্যাগমন

প্রায় নজরবন্দি করিয়া রাখিলেন। আমাদের কোন অনুরোধ শুনিলেন না, এবং কয়েকদিন পরে জনৈক লোক সঙ্গে দিয়া ঐ নৌকাতেই আমাদিগকে প্রত্যাগমনে বাধ্য করিলেন। আমাদের সকল কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল, এবং লজ্জা-নম্র-মুখে বাটী আসিতে হইল।

মুরসিদাবাদ ও জঙ্গীপুর

মুরসিদাবাদের সঙ্গে সমান না হউক, জঙ্গীপুরও তৎকালে অস্বাস্থ্যকর ছিল দেখিলাম, সেখানেও অনেক পুরাতন বাটী শূন্য রহিয়াছে এবং বিধবা রমণীর ন্যায় স্বামীবিরহে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। এ নগরও পূর্ব্বে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। অত্যল্প ভাড়ায় বৃহৎ বাটীসকল পাওয়া যাইত। আমাদের কয়েকজনেরই শরীরের ভাবান্তর হইয়াছিল।

এই বৎসর আমি কালীবাবুর পরামর্শানুসারে কলিকাতায়

মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম। ইহার একবৎসর পূর্ব্বে কালী ঐ কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কলিকাতায়ও আমি কালীর আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম; সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। নূতন বান্ধবগণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতালাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠন্ঠনিয়ার একটি বৃহৎ বাটীর কোন অংশে রামতনুবাবু থাকিতেন, কোন অংশে মদন তাঁহার দুই পিতৃব্যের সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতনুবাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম। মদনের সহিত প্রণয় হইলে তিনিও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। তিনি ও বিদ্যাসাগর তৎকালে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবাজারে কোন স্থানে বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে মদনের সঙ্গে যত শীঘ্র প্রণয় হয়, তত শীঘ্র প্রণয় হয় নাই।

মেডিকেল কলেজে প্রবেশ

একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বর্ম্মের পার্শ্বস্থ প্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্ব্বদা উত্থিত হইত। অভ্যাসবশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট বোধ হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এসকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত। এমন কি, নাসিকা-দ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত। রাত্রিতে কোনরূপ আলোক সঙ্গে না থাকিলে গলি-রাস্তায় অন্ধের ন্যায় চলিতে হইত, এবং পুলিশের সুনিয়ম অভাবে দস্যুভয়ে অনেক গলিতে যাইতেও সাহস হইত না। শুনা যাইত যে, তস্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া পথিকের গাত্রে পড়িত, এবং তাহার শাল বা ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিত।

কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা

জাহ্নবীতীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহু লোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনেন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্লচিত্তে অবগাহন করা যাইত না। আমি কলিকাতায় যাইয়া অবধি পুষ্করিণীতে স্নান করিতাম। একদা কোন যোগে আত্মীয়গণের সহিত জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু জলের অবস্থা দেখিয়া আমার স্নান করিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল না। সেদিন আমাকে অস্নাত থাকিতে হইল।

লোনা-লাগা

তৎকালে মফঃস্বলের যেসকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ পীড়াকে 'লোনা-লাগা' কহিত। যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোনা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন, এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্যল্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত। একারণ আমি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি দুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্মিল,

আমার পীড়া

এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক-দিন লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক্ উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ঔষধ-সেবনে কোন উপকাব না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্থ দিবসে বাটী উপনীত হইলাম, এবং বিনা ঔষধে একমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া কলিকাতায় পুনর্গমন করিলাম।

কিন্তু যে কামনায় তথায় গিয়াছিলাম অবোধতাবশতঃ তাহা পূর্ণ করিতে পাবিলাম না। মেডিকেল কলেজের তৎকালীন ছাত্রগণের মধ্যে অধিকাংশ অতি অবিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোন কোন অধ্যাপকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং শেষে কলেজ ত্যাগ করিলেন। আর

তাহার পরদিবস আপনাদের মনঃকল্পিত দুঃখের বিবরণ পত্রদ্বারা শিক্ষাসমিতির গোচর করিলেন। মহাত্মা ডেবিড হেয়ার সাহেব তাঁহাদিগকে কলেজে লইয়া যাইবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সদুপদেশ কেহই গ্রহণ করিলেন না। দুই কি তিন দিন পরে শিক্ষাসভার সভ্যগণ ছাত্রদিগকে এক নির্দ্ধারিত দিবসে কলেজে উপস্থিত হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, এবং আপনারাও আগমন করিলেন। তৎকালে সার এডওয়ার্ড রায়ান সাহেব উক্ত সমাজের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে কহিলেন যে, তোমাদের অভিযোগের কোন কথাই সঙ্গত নহে, এবং তোমাদের ব্যবহারও ভদ্রোচিত নহে। শিক্ষাবিষয়ে আমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের কথা কহিবার কোন অধিকার নাই ;—তোমাদের অবস্থা আমরা যেরূপ জানি তাহাতে বোধ হয় যে কোন কোন ছাত্রের ছাত্রবৃত্তি তাহার সংসারযাত্রানির্ব্বাহের প্রধান উপায়। তোমাদের দেশের উপকারার্থ এই কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যদি ইহাতে কেহ অধ্যয়ন না করে, ইহা উঠিয়া যাইবে ; তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না, যে ক্ষতি তোমাদেরই হইবে। অতএব যাহার ইচ্ছা হয় থাকিবে, যাহার অনিচ্ছা হয় চলিয়া যাইবে। ইত্যাদি অনেক-প্রকার ভর্ৎসনা করিলে পর এই গোলযোগের প্রধান প্রবর্ত্তক কয়েকজনের অপরাধের পরিমাণানুসারে ছাত্রবৃত্তি রহিত করিতে আদেশ দিলেন।

মেডিকেল কলেজ ত্যাগ ও তাহার কারণ

পূর্ব্বে এই ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা সংসারে হতমান হইয়া থাকা অপেক্ষা জীবনত্যাগ করাও কর্ত্তব্য ইত্যাদি মনের মাহাত্ম্য বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা আগ্রহের সহিত তাহা শুনিয়া করতালি দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে একজনেরও কথা কহিবার সাহস হইল না, সকলেরই মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। যাহা হউক, সাহেবেরা গমন করিলে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কলেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হইব না, এবং যদি হই, তবে কেহ কাহারে ছাড়িয়া আসিব না। কিন্তু তৃতীয় দিবসে শুনিলাম যে, রাজেন্দ্রলাল

মিত্র ও তদীয় বন্ধু মাধবচন্দ্র বসাক ব্যতীত, আর আর সকলেই কলেজে গিয়াছে। তথাপি কালীর ও আমার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় থাকিল।

তৎকালীন ছাত্রগণের অধিকাংশ নীচকুলোদ্ভব অথবা অত্যন্ত দরিদ্রদশাপন্ন ছিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র অতি অপ্রশংসিত ছিল। একারণ পূর্ব্বেই তাঁহাদের সঙ্গত্যাগের নিমিত্ত কলেজ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত। এক্ষণে এই ঘটনায় সে ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। কালী ও আমি যাহাতে কলেজ ত্যাগ না করি, তদ্বিষয়ে রামতনুবাবু অনেক সদুপদেশ দিলেন ও বহু যত্ন করিলেন। কালী তাঁহার কথায় অবাধ্য হইতে না পারিয়া কলেজে গমন করিলেন, কিন্তু আমি দুর্ব্বুদ্ধিপরবশ হইয়া কলেজে আর প্রবিষ্ট হইলাম না। সেই সময় আমাদের তৎকালীন রাজকুমার শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর কলিকাতায় ছিলেন। তিনিও প্রথমে কলেজ ছাড়িতে আমাকে নিষেধ করিলেন। শেষে আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চল, যতদিন আমি আহার পাইব, ততদিন তুমিও পাইবে। কয়েকদিন পরে তাঁহার সমভিব্যাহারে আমি বাটী আসিলাম।

আমার জীবনে যত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই কলেজ ত্যাগ করাটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিজ্ঞ গুরুজনের উপদেশ তুচ্ছ করিয়া নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিলে কত কষ্ট সহ্য করিতে ও কত মনস্তাপ পাইতে হয়, তাহা বলা যায় না। কোনও কোনও যুবক আপন বিবেচনাগুণেও বিদ্যা-উপার্জ্জন ও প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার সংখ্যা অধিক নহে। অপূর্ণ বয়সে স্থিরপ্রতিজ্ঞার ও বিজ্ঞতার প্রায় অভাব থাকে। প্রথমে যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, সেই বিষয়েই সুসিদ্ধ হইবেন ভাবেন কিন্তু তাহার সাধনে কিছু কষ্ট বা অসুগম হইলে অমনই বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করেন। দ্বিতীয় বিষয়ে আবার অসুগম বোধ করিলে তৃতীয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হন। শেষে সকল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়েন। যেমন প্রত্যেক বিষয়েই কৃতার্থ হইয়া সুখী হইবেন মনে করেন, তেমনই কোন বিষয়েই পূর্ণমনোরথ

অপরিপক্ক বুদ্ধির ফল

হইতে না পারিয়া শেষে হতাশ হন ও অনুতাপ করিতে থাকেন। ইহা অন্যের অবস্থায় যতদূর সঙ্গত হউক না হউক আমার জীবন ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্তস্থল। আমি যখন কলেজে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন বিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইব, ধন ও মান লাভ করিব, কত উপয়াহীন দুঃখী দরিদ্রের পীড়ার শান্তি করিব ইত্যাদি কতই মহদ্ভাব মনে উদিত হইয়াছিল। আবার যখন ইহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন মুনসফী, সদর-আমিনী বা ডেপুটি কালেক্টারি পদের ন্যায় চিকিৎসকের পদের সম্মান নাই, সকলের বাটীতেই যাইতে হয়, মলমূত্র পরীক্ষা করিতে হয়, কত লোকের মন যোগাইতে হয়, রাত্রিতেও অবসর নাই, ইত্যাদি নানারূপ অকিঞ্চিৎকর ভাবে চিত্তবিকৃত হইল। রাজকুমার আমাকে যেরূপ ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, তাহাতে কখনই আমার দুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাও মনে হইতে লাগিল। এইরূপ অবিবেচনায় যে ফললাভ হইল, তাহা শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ

কলেজ ত্যাগ করিয়া বাটী আসিবার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীশচন্দ্র পূর্ব্বে শ্রীপ্রসাদের নিকট যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজী পড়িয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমার নিকট পুনরায় পড়িতে লাগিলেন। এক বৎসর এইরূপ গত হইল। সে সময় রাজসরকারের এরূপ দুরবস্থা ছিল যে, যৎসামান্য বেতন নিয়মিতরূপে পাইবার উপায় ছিল না। বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে কুমারের পড়িবার অধিক সময় হইত না বটে, কিন্তু যাহা হইত তাহারও প্রায়াংশ অনর্থক গল্পে কাটাইতেন। সুতরাং এ অবস্থায় আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। রাজবাটী গমনাগমন ত্যাগ করিলাম।

আমাদিগের একালীন অবস্থা

সে সময় আমাদের অবস্থাও মন্দ হইয়াছিল। পিতৃদেবের উপার্জ্জনের কাল অতীত হইয়াছিল। অগ্রজ মহাশয় ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু আয়ের দিকে মনযোগ ছিল না। সাংসারিক কষ্টদর্শনে মনোমধ্যে বড়ই দুঃখ হইতে লাগিল; অথচ ইহা দূর করিবার কোনও উপায় ও সাধ্য হইল না। শ্রীপ্রসাদ এই সময় এখানকার সরসরী মুন্সীর পদে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল হইল

কিন্তু আর কয়েক জন বান্ধবের আমার ন্যায় দুর্দ্দশা থাকিল। সকলেরই বিবাহ হইয়াছে, চাকরীর বয়স হইয়া উঠিয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক নিজ ব্যয়ের জন্য গুরুজনের নিকট কিছু কিছু চাহিতে হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল মনের অসুখ সত্ত্বেও, যখন আমরা কয়েক বান্ধবে একত্রিত হইতাম, তখন আর কোন অসুখই মনে থাকিত না। ভাবিতাম, যেন সংসারে আমাদের কোন অভাবই নাই।

সেকালের অবস্থা যাহাই স্মরণ হয়, তাহাই না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না ; তাহা লেখাতে কোন ফল না থাকিলেও লিখিতে ইচ্ছা হয়।

দাম্পত্য-সুখ

তৎকালে আমাদের কাহারও সন্তান হয় নাই। পত্নীদের আমরাই সর্ব্বস্বধন ছিলাম। তাঁহারা শাশুড়ী-ননদের যতই বিষদৃষ্টিতে থাকুন না, গৃহে যতই কেন অসুখ হউক না, জনকজননীর ও ভ্রাতাভগ্নীর স্নেহ যতই কেন মনে পড়ুক না এবং বাল্যসখীদের সুধাময় সখ্যভাব যতই কেন হৃদয়ে উদিত হউক না, স্বামিসন্দর্শনে সকলই বিস্মৃত হইতেন। পতি স্নেহনয়নে দৃষ্টি করিলে আভরণ পরিচ্ছদ প্রভৃতি কিছুরই অভাবে দুঃখিতা থাকিতেন না। যদি সাংসারিক কোন বিষয়ে বিষাদিতা হইতেন, তবে যেমন সূর্য্য-উদয়ে অন্ধকার থাকে না, তেমনই পতির দর্শনে মনের সে সকল মালিন্য থাকিত না এবং পুরাকালীন সমুদ্র-নাবিকের ন্যায় কেবল স্বামী-তারার দিকে দৃষ্টি থাকিত। একারণ নিঃস্বার্থ বান্ধবদিগের সংসর্গে যেমন সুখী থাকিতাম, পতিপরায়ণা পত্নীসহবাসেও তেমনই সুখী হইতাম। এইরূপ সুখের কাল যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী স্বর্গ হইয়া উঠিত। ইংরেজেরা কহেন যে কোর্টশিপ কালে তাহাদের যত সুখ হয়, বিবাহের পর আর তত সুখ থাকে না। ইহার কারণ বোধ হয় যে প্রথমোক্ত অবস্থায় নায়ক-

বাল্য-বিবাহ ও কোর্টশিপ

নায়িকার স্নেহ কেবল পরস্পরের প্রতি বদ্ধ থাকে, উভয়ের পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে শীঘ্রই সন্তান জন্মে, এবং জননীর যে স্নেহ শুদ্ধ জনকের অধিকারে থাকে, তাহার কতকাংশ ঐ সন্তান অধিকার করিয়া লয়।

সুতরাং শেষোক্ত অবস্থায় আর নায়কের পূর্ব্বরূপ সুখলাভ হয় না। আমাদের বাল্য-বিবাহ প্রথার অনেক দোষ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এ অবস্থায় যাদৃশ সুখানুভব হয়, কোর্টশিপ অবস্থায় তাদৃশ সুখলাভ হইতে পারে না। কোর্টশিপ-কালে "সে আমার, আমি তার" এ ভাব উভয়ের চিত্তে স্থিরনিশ্চয় হয় না। কারণ কোর্টশিপ-কালে নায়ক-নায়িকার প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিলেও ঘটনাক্রমে কখন কখন উদ্বাহসম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং আমাদের বিবাহিত অবস্থায় প্রথমকালের সুখের সঙ্গে তাঁহাদের কোর্টশিপ-কালের সুখের তুলনা হয় না।

কৃষ্ণলীলা ও মানব-যাত্রার তুলনা

কেবল নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই বাল্যলীলা, মধ্যলীলা এবং শেষলীলা ছিল, এরূপ নহে। বর্ণনা করিতে গেলে সকলেরই জীবনের ঐরূপ কয়েক লীলা আছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলার ভাব যত সুমধুর, তাঁহার মথুরার মধ্যলীলার ভাব তত সুমধুর নয়। তাহার কারণ এই যে, ব্রজে তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে কেবল সখ্যের ও প্রেমের রাজত্ব ছিল। মথুরায় তাঁহার চিত্তে স্বার্থপরতা, বৈরনির্য্যাতন প্রভৃতি সাংসারিক বিবিধ ভাব প্রবেশ করিয়াছিল। একারণ তাঁহার মধুর বাল্যলীলা যতদূর ভক্তবৃন্দের আরাধ্য বস্তু ও কবিকুলের চিন্ত্যস্থল হয় ততদূর মধ্যলীলা হয় নাই। মধ্যলীলা যে সম্পূর্ণ নীরস, তাহাও নহে; তবে বাল্যলীলার কাল যেরূপ একমাত্র সখ্য ও প্রেমরসে পূর্ণ থাকে, সেরূপ মধ্যলীলায় থাকে না। এ মিষ্ট রসের সহিত সাংসারিক কোন কোন তিক্ত রসও মিশ্রিত হইয়া যায়। আজি আমার যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে আমার আদ্যলীলা বটে, কিন্তু বাল্যলীলা নহে। যেহেতুক আমার একবিংশ কি দ্বাবিংশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই সুখের স্রোত নিরন্তর রহিয়াছিল। তাহার পরও ৪৫শ বৎসর পর্য্যন্ত আমার এ সুখের প্রবাহ রোধ হয় নাই। তবে ২২শ বৎসর পর্য্যন্ত এ প্রবাহ যেমন সুস্থির ছিল, তাহার পর আর সেরূপ ছিল না।

আমার সুখদুঃখ

সুখের শত্রু চিন্তা ও মনস্তাপ বাত্যাতে কখনও কখনও ইহা আলোড়িত করিত, কিন্তু তাহারা দীর্ঘস্থায়ী হইত না।

সুতরাং আমার মধ্যলীলা আদ্যলীলার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন সুখময় না হউক, সুখশূন্য ছিল না। সাংসারিক সুখের প্রধান লোভ, আমাকে কখন বশীভূত করিতে পারে নাই। কোন বিষয়ের জন্য কখনও কাহারও সঙ্গে বিবাদ বা মনান্তর হয় নাই। আর বহু বংশ-সৌভাগ্য-সংহারক মোকর্দ্দমার জঘন্য ব্যাপারে আমি কখনও প্রবৃত্ত হই নাই। পৈতৃক সম্পত্তির ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, তথাপি কোন অধর্ম্ম বা জ্ঞাতির নামে অভিযোগ করি নাই।

মিত্রতা-সুখ

আমি অল্প লাভেই অধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি। যদিও অপেক্ষাকৃত ধনাগমের উপস্থিত উপায় নির্ব্বোধিতার বা অন্য কোন কারণে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তজ্জন্য কখনও চিত্তে বিশেষ অনুতাপ হয় নাই। কখনও কখনও হৃদয়াকাশে চিন্তামেঘ উত্থিত হইয়াছে; কিন্তু অধিককাল তিষ্ঠিতে পারে নাই। মিত্রতা-সুখই আমার মনের প্রধান সুখ ছিল, এবং সৌভাগ্যক্রমে হৃদয়ভাণ্ডারে এ ধনের যথেষ্ট সমাগম হইত। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং মধ্যে মধ্যে ইহার কিছু কিছু অপহৃত হইত বটে, কিন্তু যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত ধন যাইত, অমনই তাহার স্থানে নূতন ধন আসিত। অর্থাৎ হৃত বান্ধবের স্থলে নূতন বান্ধবের অধিষ্ঠান হইত। দ্বাদশ মাস বাটীতে থাকিতাম, গুরুজনের দর্শন পাইতাম, সংসারসারভূত সুহৃদ্বরে বেষ্টিত থাকিতাম, প্রাণোপম সন্তানগণকে সম্মুখে লালনপালন করিতে পারিতাম, প্রভুর ও তদীয় পরিবারবর্গের আদরের ও স্নেহের পাত্র ছিলাম, স্বাভিমত ধর্ম্মপালনে সক্ষম হইতাম, এবং স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিতাম; বস্তুতঃ, সাংসারিক মানবের সুখের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক, প্রায় তৎসমুদায়ই আমার ছিল।

জীবন-খেলায় লাভালাভ

যাঁহারা বাজার করিতে যান, তাঁহারা গৃহে আসিয়া কোন্ দ্রব্য ক্রয়ে জিতিয়াছেন ও কোন্ দ্রব্যতে ঠকিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন। যোদ্ধা রণাবসানে শিবিরে আগমন করিলে সমরের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়া আপনার কোন্ কার্য্য যথাকর্ত্তব্য ও কোন্ কার্য্য বিগর্হিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া দেখেন। যিনি সতরঞ্চ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত

হন, তিনিও খেলার পর তাহার কোন্ চাল কেমন হইয়াছে তাহার চিন্তা করিয়া থাকেন। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফলানুসারে আনন্দিত ও বিষণ্ণ হন। সেইরূপ এই সংসারের সকলেই তাঁহাদের শেষাবস্থায় কখনও কখনও আপনাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ও বিগত জীবনের সমালোচনে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে আমিও মধ্যে মধ্যে স্বীয়কৃত কার্য্যের সমালোচনা করিয়া থাকি। আমার নিজ বিবেচনায় আমি যে যে কার্য্যে ঠকিয়াছি, তাহার গড়পড়তা করিলে, এক্ষণ পর্য্যন্ত জিত ব্যতীত ঠকা বোধ হয় না ; কিন্তু এক্ষণও আমার শেষ লীলা সমাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং ইহার পর কি হইবে, তাহা বলা যায় না।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণ

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজবাটীতে রীতিমত বেতন না পাওয়াতে ও শ্রীশচন্দ্রের ইংরেজী পাঠে অমনোযোগ দেখাতে, রাজবাটী যাওয়া-আসা রহিত করিয়াছিলাম। ইহার কিয়ৎকাল পরে, ১২৪৮ বঙ্গাব্দে রাজা গিরীশচন্দ্র পরলোকে গমন করিলে, শ্রীশচন্দ্র তাঁহার বিষয়াধিকারী হইলেন। এই ঘটনার সময় আমি স্থানান্তরে ছিলাম। বাটী আসিয়া শুনিলাম, রাজা শ্রীশচন্দ্র আমাকে ডাকিতে বারম্বার লোক পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি কহিলেন, "পিতৃবিয়োগে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছি, অতএব তোমার আমার নিকট সর্ব্বদা থাকিতে হইবে।" তাঁহার বসিবার গৃহের পার্শ্বস্থ এক প্রকোষ্ঠ আমার বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি দিবসে কেবল একবার মাত্র আহার করিতে বাটী আসিতাম, আর সমস্ত দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিতাম।

খাস সেক্রেটারী

তিনি আমাকে খাস সেক্রেটারী পদবী দিলেন, এবং যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজা গিরীশচন্দ্রের আদ্যকৃত হইয়া গেল। তৎকালে সুখময় সিংহ দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি কোন কার্য্যের ভার ছিল না। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক একজন রাজকুটুম্ব আমিনী পদে নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত বিষয়কার্য্য করিতেন। তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বাধিকারী হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি দেওয়ানের বংশোদ্ভূত, কর্ম্মে পারগ এবং রাজার প্রিয়, একারণ রাজা পাছে আমাকে দেওয়ানী

পদ দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা উভয়েই আমাকে রাজবাটী হইতে দূরীভূতকরণে যত্নবান হইলেন। কালীপ্রসাদবাবু আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে কহিতেন, "রাজসংসারের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর কাহারও এসংসারে থাকিয়া মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার কোনও বিদ্যা নাই, আর এই বৃদ্ধাবস্থায় কোথায়ই বা যাই, সুতরাং এখানে পড়িয়া রহিয়াছি। তুমি বিদ্বান ও যুবা, তোমার এখানে থাকা উচিত নহে।" তাঁহার ভাব বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু কথা মিথ্যা নহে। সুখময় আর এক প্রকার সুহৃদ্ভাব প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, "রাজা তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।" কালীপ্রসাদের কথায় কেবল হাসি আসিত, কিন্তু ইঁহার আত্মীয়তায় শরীর জ্বলিয়া যাইত। যাহা হউক, তাঁহাদের আশঙ্কা ত্বরায় দূরীভূত হইল। আমি দুই তিন মাসের মধ্যেই রাজবাটী ত্যাগ করিয়া মুন্সেফের পরীক্ষা দিবার জন্য আইন অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মাধবচন্দ্র মল্লিক ও তাঁহার আমাদিগের সহিত সহানুভূতি

উপরিউক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতানিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দু কলেজের একজন সুশিক্ষিত ছাত্র এই জেলায় ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আইসেন। রামতনুবাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং আমরাও তাঁহাকে গুরুজনের ন্যায় জ্ঞান করিতাম। তিনি চাঁদ সড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া গেলেন, এবং তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান হইলেন। আর আমরা এখানকার যুবকবৃন্দের কুসংস্কারনিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারিণী ও ভুবন ঐ স্কুলের শিক্ষকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

রেটার চাষ

যদিও ইদানীং আমরা অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক হইয়াছিলাম তথাপি আমাদের কয়েক বান্ধবের মধ্যে এতই প্রগাঢ় প্রণয় ছিল যে, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। আমরা সকলেই ভাবিতাম যে অতি

সামান্যরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেও, পরস্পর পৃথক হইব না। আমাদের সঙ্কল্প শুনিয়া মাধববাবু কহিতেন, তোমাদের এ বাসনা কখনই পূর্ণ হইবার নয়। তবে যদি তোমরা সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পার, তাহা হইলে এ মনোরথ সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। তাঁহার পরামর্শানুসারে আমিই প্রথম রেঢ়ীর চাষ আরম্ভ করিলাম। ধান্য, সর্ষপ, মসীনা, অড়হর প্রভৃতি শস্যের চাষে যে লাভ হয়, তাহাতে ভদ্রলোকের সংসারযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম ; রেঢ়ীর চাষেও আশানুরূপ লাভবান হইলাম না।

মুন্সেফী পরীক্ষার উদ্যোগ ও হতাশা

এক্ষণে মুন্সেফী পরীক্ষা দিবার মনস্থ করিলাম। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কালের দুই মাস পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীদের আপন আপন জেলার জজ সাহেবের নিকট নিজ বংশের ও চরিত্রের প্রশংসাপত্র লইতে হইত। প্রথম শ্রীপ্রসাদ ও আমি সার্টিফিকেটের নিমিত্ত দরখাস্ত দিতে যাইয়া শুনিলাম যে, সাহেব মঙ্গলবার ভিন্ন অন্য বারে কোন আবেদনপত্র লন না। আগামী মঙ্গলবারে দুই মাসের ন্যূনতা হইবে দেখিয়া সেবার আর দরখাস্ত দেওয়া হইল না। ছয়মাস অন্তর এই পরীক্ষা হইত, এবং দ্বাবিংশবর্ষ পূর্ব্বে এ পরীক্ষা দিবার নিষেধ ছিল। এবার আমি উপযুক্ত সময়ে দরখাস্ত করিলাম কিন্তু জজ সাহেব আমাকে ২২শ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক অনুমান করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়স ২৩ হইতে ৩৪ বৎসর

কুমার সতীশচন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ

আমার যখন ২৩শ বৎসর বয়স, তখন শ্রীশচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রের বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। রাজা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “আর পলাইতে পারিবে না, কুমারকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।” তিনি আমাকে তাঁহার সংসারে রাখিতে কখনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। তবে অর্থাভাবে নিয়মিতরূপে বেতন দিতে পারিতেন

না বলিয়া, আমি না যাইলে লজ্জাবশতঃ আমাকে ডাকিতেন না। ইচ্ছা করিলে তিনি আমার অপেক্ষা উত্তম শিক্ষক পাইতেন, কেবল ভালবাসার জন্যই আমাকে শিক্ষকপদে মনোনীত করিলেন। আমি বেলা নয় ঘণ্টা হইতে রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজবাটীতে থাকিতাম। রাজপুত্র অতি শান্তস্বভাব ছিলেন। তাঁহাকে আমি সাতিশয় ভালবাসিতাম, এবং তাঁহার শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতাম। তিনিও আমাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন এবং ভালবাসিতেন। তাঁহাকে কখনও কখনও ভয়প্রদর্শন করিতে হইত বটে, কিন্তু কখনও পীড়ন করিতে হইত না।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের ধর্ম্মসংস্করণের চেষ্টা

রাজা অবকাশ পাইলেই আমার নিকট আসিয়া বসিতেন; ইউরোপের ধর্ম্মনীতির, রাজনীতির ও ব্যবহারনীতির বিবরণ শুনিতেন, আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তৎসমুদায়ের ফলাফল বিচার করিয়া দেখিতেন। এইরূপে আমাদের দেশের যে সকল কুসংস্কার তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল, সে সকল ক্রমে ক্রমে উন্মূলিত হইতে লাগিল। শেষে বহুবিবাহের নিবারণ, বিধবাবিবাহের চলন, বেদবিহিত ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন ইত্যাদি স্বদেশহিতজনক বিষয়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় হইল। তিনি স্থির করিলেন যে, শাস্ত্রশাসন ব্যতীত শুদ্ধ কেবল যুক্তি অবলম্বনে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। এবং ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের কথায় কোনও উপকার দর্শিবে না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন, ইংরেজী পড়েন নাই, এবং প্রচলিত আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথায় ও দৃষ্টান্তে সাধারণের পূর্ব্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি নবদ্বীপের গোলোক ন্যায়রত্ন, বহিরগাছির লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার, ভাটপাড়ার রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত আনাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এই সকল বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন; এবং প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্যামাচরণ চৌধুরী, হরচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দুধর্ম্মাভিমানী পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিকে বেদ ও ভগবদ্গীতা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত করাইলেন। ইঁহারা রাজার সন্তোষার্থে বেদের মহিমাকীর্ত্তন ও

পৌত্তলিকতার দোষ প্রচার করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে ভাব আন্তরিক ছিল না। সাকার উপাসনা ব্যতীত যে কেহ নিরাকার উপাসনার অধিকারী হইতে পারেন, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাসের অতীত ছিল।

পৌত্তলিকতা

বস্তুতঃ বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে এদেশস্থ লোকের যে সংস্কার হইয়া আসিয়াছে, সহসা তাহার দূরীকরণ সহজ ব্যাপার নহে। ভারত-আর্য্যদের মধ্যে প্রথমে নিরাকার উপাসনারই আধিক্য ছিল; তবে এই পৌত্তলিকতা কেন প্রবল হইল। ইহা দেশান্তর হইতে আইসে নাই। এই দেশেই ইহা জন্মিয়াছে এবং বেদেরই বংশোদ্ভূত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। আর ক্রমশঃ ইহার বংশবৃদ্ধি এত অধিক হইয়াছে যে, তাহারা ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সংস্থাপন পূর্ব্বক বিবিধরূপে অধিবাসীদের চিত্তে রাজত্ব করিতেছে; এবং তাহারা স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে এত অধিক প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের উপাসকগণের মধ্যে যাঁহারা বেদকে তাঁহাদের ধর্ম্মের আদি পুরুষ বলিতেছেন, তাঁহারাও বেদের নামও উচ্চারণকরণে বিমুখ হইয়াছেন। যেমন কেহ কেহ পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধকে "মরা গরুর ঘাস কাটা" মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনই বেদবিহিত উপাসনাকে ঐরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভাবেন পৌত্তলিক ধর্ম্মের দেব-দেবীকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয় না, অনায়াসে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে; তাঁহাদের সমাগমে যথেষ্ট আমোদ-প্রমোদ হয়, সাংসারিক সুখভোগেরও কোন প্রতিবন্ধক নহে; তবে ইঁহাদের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে দেবতা বাক্য-মনের অগোচর, যাঁহার উপাসনায় কোন আমোদ নাই, যাঁহার চিন্তা করিতে কষ্ট হয়, তাঁহার আরাধনা করিবার এত প্রয়োজন কি? যে পথে পিতৃপিতামহ চলিয়াছেন, সেই পথেই চলিব। আর "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই বচনটির উল্লিখিত মহাজনের অর্থ —আপনাদের ও প্রতিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ এদেশীয় লোকের মনে বেদের সহিত পৌত্তলিকতার কল্পিত সংস্রব যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বেদকে ঈশ্বর-প্রণীত

বলিয়া দেশে রাখিব, অথচ পৌত্তলিকতাকে নির্ব্বাসিত করিব, এ অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার নহে। তবে যদি মগধরাজা অজাতশত্রুর ন্যায়, আমাদের রাজাও শাক্যসিংহের ন্যায় বৈদিকধর্ম্মের প্রচারক অবতীর্ণ হন, তবেই এ মহৎ কল্পনা সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন উপযুক্ত চিকিৎসক ও উপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত কোন রোগের প্রতীকার হয় না, তেমনই উপযুক্ত রাজা ও উপযুক্ত প্রচারক ব্যতীত ধর্ম্মের সংস্কার হইয়া উঠে না। এক সময়ে যে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা রাজার প্রভাবে ও প্রচারকগণের যত্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালীন নৃপতিগণ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে, কখনও এ ধর্ম্মের এত অধিক বিস্তার হইত না। আবার যখন শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং সেই সাময়িক রাজা ঐ ধর্ম্মের সহায় হইলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হইল। প্রচারকের যত্ন থাকিলেও রাজার সহায়তা ব্যতীত এই উভয় ধর্ম্মই প্রবল হইত না।

ধর্ম্মে রাজশক্তি

অন্যান্য দেশেও রাজা অথবা তত্তুল্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সাহায্য ব্যতীত কোনও নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপন বা প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কার হয় নাই। ইয়ুরোপে মহা বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ লুথর ও উযিকালিফ প্রভৃতি মহাজনের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও, প্রোটেস্‌টাণ্ট মত স্থাপন করিতে পরাক্রান্ত রাজাদের কত আনুকূল্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কত শোণিতপাত হইয়াছে, কত বিপ্লব ঘটিয়াছে, তথাপি ইউরোপের অনেক রাজ্যে অদ্যাপি ক্যাথলিক মত প্রচলিত রহিয়াছে। যে যে রাজ্যে প্রোটেস্‌টাণ্ট মত অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানেও অনেক পূর্ব্বমতাবলম্বী আছেন। আর যখন খৃষ্টীয়ধর্ম্মের মূল প্রচার স্থাপিত হয়, সে সময়ও যে পর্য্যন্ত রোমের সম্রাটরা এ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মের প্রায় কোন তেজই ছিল না। মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তারের মূল অন্বেষণ করিতে গেলেও দেখা যায় যে, যাবৎ ঐ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিক্রম বৃদ্ধি হয় নাই তাবৎ তাহাদের ধর্ম্মেরও বল খর্ব্ব ছিল। পরে তাহাদের পরাক্রমের সহিত ধর্ম্মের বিস্তারের বৃদ্ধি হয়।

কিন্তু আমরা যে সময়ে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারকরণে প্রবৃত্ত হই, তখন রাজা শ্রীশচন্দ্রের এবং অনেকের মনে হইয়াছিল যে, এক্ষণে সুশিক্ষিত যুবকবৃন্দের এ বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে এদেশস্থ ধন ও মানযুক্ত প্রধান প্রধান লোকের সহায়তা হইলে, বেদ-প্রণীত সনাতন ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অবশ্যই পুনঃ বিকীর্ণ হইবে; এবং পৌত্তলিকতার তেজ ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিগর্হিত প্রথাসমূহও তিরোহিত হইবে। রাজা যে সকল পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেন, তাঁহারা তাঁহার অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিতেন, এবং প্রশংসিতও বলিতেন; কিন্তু সাধারণ-সন্নিধানে তাঁহারা এই মত প্রকাশ করিলে, পাছে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রহিত হয়, এইজন্যই কুণ্ঠিত হইতেন। একারণ শ্রীশচন্দ্র বর্দ্ধমানের ও নাটোরের রাজাকে প্রথমে স্বাভিমতে আনিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং শ্রীশচন্দ্রের পত্র দিয়া তাঁহাকে আমাদের অভিসন্ধির বিষয় জানাইলাম। তিনি প্রথমে কহিলেন যে, "বেদ, কোরাণ ও বাইবেল, কিছুই ঈশ্বর-প্রণীত নহে, তবে আর কেন ধর্ম্মবিষয় লইয়া গণ্ডগোল করা যায়। যেরূপ চলিতেছে তাহার প্রতিবন্ধকতা করিবার কোন ফল দেখি না। কারণ, আমরা বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বী রাজার অধিকারস্থ হইয়াছি। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করি, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। আমাদের প্রস্তাবিত গুরুতর কার্য্য দেশাধিপতির সাহায্য ব্যতীত কোনরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য।" আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজা যাহা কহিলেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। আমরা পরাধীন হওয়াতে দেশের মঙ্গলসাধন বড়ই দুষ্কর হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজার অভাব বলিয়া দেশের যে কিছু দুর্দ্দশামোচন, দেশের প্রধান প্রধান লোকদ্বারা হইতে পারে, তাহাও কি হইবে না? তাঁহারা কি এ বিষয়ের জন্য

বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ

ধর্ম্মবিষয়ে বর্দ্ধমান-রাজার সহিত তর্ক-বিতর্ক

একবারও চেষ্টা করিয়া দেখিবেন না? বিবেচনা করিয়া দেখুন সাধারণ অবস্থাপন্ন কয়েকজন স্বদেশীয় লোকের দ্বারা এ বিষয়ের কতদূর উন্নতিসাধন হইয়াছে! যদি ইহাদের দ্বারা এতদূর কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, তবে মহারাজার ন্যায় প্রতাপশালীগণের যত্নে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে!" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "আমাদের দ্বারাই বা কতদূর কার্য্য হইবে? কর্ত্তাভজা প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায় আছে, সেইরূপ আমাদের আর একটি সম্প্রদায় হইবে, তাহাতে বাঙ্গালার কি উপকার হইবে?" আমি কহিলাম, "সকল কার্য্যেরই প্রথমে সূত্রপাত হয়, পরে ক্রমশঃ তাহার উন্নত অবস্থা হইয়া উঠে। বৃক্ষ রোপণ করিলে একদিনেই তাহা ফলবান হয় না। সকল বিষয়ই কালে পরিণত হয়। আপনাদের চেষ্টায় যতদূব হইতে পারে তাহা করিয়া যান। পরে আপনাদের পরপুরুষেরা তাহা সমাধা করিবেন। সৎকর্ম্ম যতদূর করিতে পারা যায়, ততদূর করা কি কর্ত্তব্য নহে? যদি একশত লোককে সৎপথে আনা যায়, তাহা কি আনন্দের বিষয় নয়?" প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হওয়ার পরে, তিনি এই বলিয়া বাক্য শেষ করিলেন যে, "আমি কোন ধর্ম্ম ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করি না। যথাসাধ্য পরোপকার করিব, কাহারও অপকার করিব না, এবং সত্য কথা কহিব, এই আমার ধর্ম্ম। তাঁহাকে (রাজা শ্রীশচন্দ্রকে) বল, এক্ষণে আমাদের উভয়েরই মাতা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের জীবদ্দশায় প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপণ করা হইবে না। তাঁহাদের পরলোকপ্রাপ্তির পর এ বিষয়ের যথোচিত চেষ্টা করা যাইবেক।"

বর্দ্ধমান রাজবাটীতে ব্রহ্মমন্দির

তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। তিনি বৃক্ষ রোপণ করিয়া বর্দ্ধিত না হইতেই তাহার মূলোৎপাটন করিলেন। তদীয় মাতৃবিয়োগের পর তিনি রাজধানীতে ব্রহ্মমন্দির একটি নিজের নিমিত্ত, আর একটি সাধারণের নিমিত্ত স্থাপন করিলেন; বেদজ্ঞ উপাচার্য্য নিযুক্ত করিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার মনের ভাবান্তর হইল। আপনাকে হিন্দুস্থানী

দেখান, এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আবুরায় স্বদেশে যে সম্প্রদায় ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া, এই দুই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ হইল। আর আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে তাঁহার লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল।

বর্দ্ধমান রাজবংশ

আবুরায় ও তৎপুত্র বাবুরায় পাঞ্জাবী ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই দেশানুযায়ী নাম ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসী হওয়াতে এই রাজবংশের পর-পুরুষের নাম বাঙ্গালার প্রথানুসারে রাখা হইয়াছিল। যথা, বাবুরায়ের পুত্র ঘনশ্যাম, তৎপুত্র কৃষ্ণরাম, তৎপুত্র জগৎরাম, তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র, তৎপুত্র চিত্রসেন, তৎপিতৃব্যপুত্র ত্রিলোচন, তৎপুত্র তেজচন্দ্র, তৎপুত্র প্রতাপচন্দ্র ও দত্তক-পুত্র এই মহাতাপচন্দ্র। বাবুরায় হইতে তেজচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল পুরুষেই আপন আপন পুত্রের বাঙ্গালা নাম রাখিয়াছিলেন; এমন কি, বাবুরায়ও স্বীয় পুত্রের বাঙ্গালা নাম রাখিতে লজ্জিত হন নাই। কিন্তু এই মহারাজা বাঙ্গালা নামে লজ্জা বোধ করিয়া, পিতার দত্ত নাম মহাতাপচন্দ্রকে মহতাব চন্দ করিলেন; এবং আপন দত্তক-পুত্রের নাম আফতাব মহতাব চন্দ রাখিলেন। রাজা হিন্দুস্থানী নামের অপেক্ষাও আপনার ও তনয়ের নামের গৌরব বৃদ্ধি করণার্থ পারস্য নাম রাখিলেন। পারস্য ভাষায় আফতাব শব্দের অর্থ সূর্য্য ও মহতাব শব্দের অর্থ চন্দ্র। বোধ হয়, শুদ্ধ আফতাব মহতাব থাকিলে নামটি বড় বিশ্রী হয়, এইজন্য চন্দ্রকে চন্দ করিয়া রাখিলেন। যৌবনাবস্থা পর্য্যন্ত রাজা আপনাকে হিন্দুস্থানী ভাবিতেন না, এবং বঙ্গবাসীকেও অপাত্র বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেন না। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং বঙ্গদেশকে আপন দেশ মনে করিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে আমি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আসি।

১২৫০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে আমার একটি কন্যা জন্মিল। পুত্রলাভ না হইয়া প্রথমেই দুহিতা ভূমিষ্ঠা হওয়াতে, স্বদেশীয় কুসংস্কারবশতঃ অতিশয় বিষাদিত হইলাম। কিন্তু কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে অথবা স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে, দ্বিতীয় দিনেই আমার বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল।

আমার কন্যা

প্রায় দুইমাস অতীত হইলে কন্যাটি পীড়িতা হইল। তৎকালে ডাক্তারের মধ্যে কেবল একজন সিবিল সার্জ্জন এখানে ছিলেন। সে সময় এ প্রদেশে আদৌ ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হয় নাই। বৈদ্যেরাও এত অল্পবয়স্ক শিশুর চিকিৎসা জানিতেন না, কি করিতেন না। আমি একখানি শিশুচিকিৎসার পুস্তক পাঠ করিয়া যেরূপ বুঝিলাম, সেইরূপ চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। কন্যার মৃত্যু হইল। তৎকালে কালীবাবু মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করেন নাই। তিনি বাটী আসিয়া যদিও কহিলেন যে, এরূপ পীড়া প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে, তথাপি যথোচিতরূপ চিকিৎসা না হওয়াতে দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইলাম না।

সেকালের শিশু-চিকিৎসা

সে সময় দুই-এক মাসের শিশুর চিকিৎসা বৈদ্য দ্বারা হইত কি না, তাহা স্মরণ হয় না। প্রধানা স্ত্রীলোকেরাই এরূপ বালক-বালিকার চিকিৎসক ছিলেন। সূতিকাগারে সন্তান পীড়িত হইলে প্রায়ই ওঝার হস্তে অর্পিত হইত। তাহারা প্রায়ই কোন ঔষধ দিত না; কেবল ঝাড়াইত। আর কিঞ্চিৎ অর্থলাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার কৌশল ও প্রবঞ্চনা করিত। শিশুর পীড়া হইলে তাহার শরীরে পেঁচো নামে একরূপ ক্ষুদ্র ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে, এইরূপ স্থির হইত। তথায় কোন পুরুষের যাইবার প্রথা ছিল না। সুতরাং ওঝার ও প্রতারিত অবলাদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কাণ্ডের কথা প্রকাশ হইত, তাহাই সকলে বিশ্বাস করিতেন। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ, উদরস্ফীত, অক্ষুধা বা বিবর্ণ ইত্যাদি হইলেই তাহার প্রতি উপরিভাব অর্থাৎ পেঁচোর আবির্ভাব হইয়াছে ভাবিয়া ওঝাকে ডাকিতে হইত। ওঝার আদেশে নবপ্রসূত বসিয়াছে, দাঁড়াইয়াছে, এদিক ওদিক করিয়াছে, ইত্যাদি কতরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড শুনিতে পাইতাম এবং বিশ্বাসও করিতাম। আমাদের বাটীতে এইরূপ অনেক অনেক কাণ্ড অনেকবার হইয়া গিয়াছিল। যে সময় আমার কন্যার পীড়া হয়, সে সময় আমাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধদিগের ও স্ত্রীলোকদের এ বিশ্বাস বিলক্ষণ

ছিল। আমার অজ্ঞাতসারে দুই-এক ওঝা আসার কথা পরে শুনিয়াছিলাম।

কালীবাবু কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হইলে, আমাদের বাটীতে পেঁচোর বা ওঝার আগমন হয় নাই। তাঁহার ব্যবস্থানুসারে পীড়িত শিশুকে একটু ক্যাষ্টর অইল দিলে, অথবা উষ্ণ জলে স্নান করাইলে, এরূপ রোগের শান্তি হইতে আরম্ভ হয়। ইদানীং অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকও সন্তানের পীড়া হইলে ঐরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

প্রাচীনদিগের ভূত-বিশ্বাস

সেকালে শিশুকে যেমন পেঁচোয় পাইত, যুবক-যুবতীদিগের শরীরে তেমনই ভূত-প্রেতিনীর আবির্ভাব হইত, এ বিশ্বাস বাল্যকালে আমাদের মনেও দৃঢ়ীভূত ছিল। বহুকালাবধি আমাদের বাটীর ছাতের উপর কখন যেন কেহ বেড়াইতেছে, কখন যেন কেহ ডাঁটা খেলাইতেছে, এইরূপ শব্দ শুনা যাইত। কি কারণে এই শব্দ হয়, ইহা জানিবার নিমিত্ত সাহসী কেহ কেহ ছাতের উপর যাইতেন, কিন্তু কখন কিছু দেখিতে পাইতেন না। প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন যে, এক জটাধারী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদৈত্য নিকটস্থ কাণা-পুষ্করিণী-সন্নিহিত গাববৃক্ষে থাকেন। তিনিই রাত্রিতে কখনও কখনও ছাতের উপর আসিয়া বেড়ান। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ কহিতেন যে, ঐ দিকে বালকের ক্রন্দনধ্বনি কখন কখন গভীর নিশিতে শুনিতে পাইয়াছেন। প্রাচীনদিগের মুখে ব্রহ্মদৈত্য, ভূত-প্রেতিনী, শাকিনী, কতপ্রকার কাহিনী শুনিতে পাইতাম। ইংরেজী পুস্তক পাঠে ও রামতনুবাবুর উপদেশে যখন আমাদের এই-সকল বিষয় মিথ্যাজ্ঞান হইল, তখন তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলাম, এবং যাহাতে তাঁহাদের মন হইতে ভূতের বিশ্বাস দূর হয়, তাহার যত্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল স্থানে ভূতের বাসস্থান বলিয়া তাঁহারা ভয় করিতেন, সেই সেই স্থানে আমরা রাত্রিতে যাইতাম, এবং তাঁহাদের ভয়ের অলীকতা জানাইতাম।

আমাদের বাটীতে ভূতের দৌরাত্ম্য

স্ত্রীলোক গর্ভিণী বা মৃতবৎসা হইলে ভূতের ওঝা আনীত হইত। আমার জেঠাঠাকুরাণীর সন্তান শৈশবাবস্থায় গতাসু হইত বলিয়া

ঐরূপ এক ওঝা আইসে। ইষ্টকালয়ে ভূতের অবতরণ হওয়ার কোন বাধা আছে বলিয়া, বাহিরের একখানি তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকা-গৃহে আবশ্যক উদ্যোগ করিল। গৃহের মধ্যে একপার্শ্বে জেঠাঠাকুরাণী একজন দাসীর ক্রোড়ে বসিলেন। ওঝা দ্বারে বসিয়া ভূতকে আহ্বান করিল। গৃহের চারিদিকে ইষ্টক পড়িল, চাল মড়মড় শব্দ করিতে লাগিল; সকলের শরীর শিহরিয়া উঠিল। গৃহের পিঁড়াতে অনেক লোক বসিয়া ছিলেন। তাঁহারা একদৃষ্টিতে দ্বারদেশে ওঝার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ওঝা কহিল, "বাবা আসিতেছেন, আপনারা সাবধানে থাকিবেন। উপহাস করিলে বিপদ ঘটিবে।" গৃহমধ্য হইতে কেহ বিকট নাসিকার-স্বরে একটি শ্লোক পড়িয়া বলিল, "বাবা আমাকে কেন ডাকিলে?" ওঝা উত্তর করিল যে, "এই স্ত্রীলোকের সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না—ইহার কারণ বল, এবং ঔষধ দাও।" ভূত কহিল, "আমি পারিব না।" ওঝা বলিল, "তবে তুমি যাও।" আবার ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইল, চাল মচ্‌মচ্‌ করিয়া উঠিল। ওঝা পুনরায় কহিল যে, "এবার যিনি আসিতেছেন, তাঁহার বড় উগ্র স্বভাব। কেহ হাসিলে বা উপহাস করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মুণ্ডছেদ হইবে।" ক্ষণপরেই কেহ অতি ভয়ানক কর্কশ স্বরে উরূ উরূ উরূ উরূ শব্দ করিয়া কহিল, "বাবা দাসী বেটী হাসিতেছে, তাহার মুণ্ডপাত করিয়া দেই।" ওঝা কহিল, "তাহার নাম কি?" ভূত কহিল, "শ্রীমতি ঘোষাণী।" ওঝা পুনর্ব্বার কহিল, "ঐ ঘোষাণী যাঁকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে, তাঁহার নাম বল দেখি।" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "হীরামতী।" ওঝা বিনয়ে কহিল, "ঘোষাণীর সামান্য অপরাধ ক্ষমা কর, আর হীরামতীর সন্তান বাঁচে না, তাহার ঔষধ দাও।" ভূত কহিল, "তাঁহাকে আঁচল পাতিতে বল।" জেঠী অঞ্চল প্রসারণ করিলে, তাহাতে একটি মূল পড়িল। ভূতও বিদায় হইল। সকলে কহিতে লাগিলেন যে যথার্থ ভূত না হইলে হীরামতী নাম কিরূপে জানিল, এবং কিরূপেই বা অন্ধকারে ঠিক তাহার অঞ্চলে ঔষধ দিল। তখন আমরা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করিতাম না, তথাপি বারম্বার গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। এ সকল কাণ্ড

ওঝার কৌশল

ভৌতিক বলিয়া প্রত্যয় করিলাম না, কিন্তু যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের আর এক বাটীতে ঐ ওঝা ভূত নামায় ও ঐরূপ অনেক ভৌতিক কাণ্ড করে। সেখানেও এ বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত কেহ বুঝিতে পারে নাই। নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ওঝার কৌশল প্রকাশ

পরবৎসর কৃষ্ণনগরের চৌধুরী-বাটীতে ঐ ওঝা পূর্ব্বমত ভূত অবতরণ করায়। সেখানে এক সাহসী ও বলবান পুরুষ, ওঝার অগোচরে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভূতকে সাপটিয়া ধরিলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, ওঝাই একবার নিজের কার্য্য, একবার ভূতের কার্য্য করিতেছে। ক্রমশঃ ওঝাদের সকল চাতুরী ও কৌশল জানিতে পারিলাম। ওঝা প্রথমে সকলের সমক্ষে দ্বারদেশে আসীন হয়, ও ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লৌহশলাকা ব্যাধদিগের আঠার নলার ন্যায় পরস্পর সংযোজিত করিয়া দুইগাছি যষ্টি প্রস্তুত করে ও আপনার উভয়পার্শ্বে ঐ দুইগাছি পুঁতিয়া তাহার উপর নিজের গাত্রবস্ত্র রাখিয়া দেয়। যখন ওঝার কার্য্য করে, তখন ঐ বস্ত্রের নিকট বসিয়া কথা কহে,—আর যখন ভূতের কর্ম্ম করিতে হয়, তখন গৃহের মধ্যে যাইয়া ভিন্ন স্বরে কথা কহে। সঙ্গে যে একগাছি চর্ম্ম-রজ্জু থাকে, তাহা ঘরের আড়ায় বাধাইয়া রাখে। তাহাদ্বারা কখন আড়ায় উঠিয়া সেখানকার দ্রব্য বলপূর্ব্বক নিম্নে নিক্ষেপ করে, কখন পদদ্বারা সবলে আড়া নড়াইয়া ঘরের মচ্‌মচ্‌ শব্দ করায়, এবং কখন তাহা হইতে বিকৃত স্বরে কথা কহে। সকলেই ওঝার বস্ত্রকে ওঝাজ্ঞানে তাহার উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। সুতরাং ওঝা যে ভিতরে যায় ও আড়ায় উঠে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেন না। তাহার দুই তিন জন সঙ্গী গোপনীয় স্থান হইতে গৃহের উপরে ও পার্শ্বে ইষ্টক প্রক্ষেপ করিত। ভূত-প্রত্যয়ী দর্শকেরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া ইহার কোন অনুসন্ধান করিতেন না। যখন এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকার এইরূপ মনুষ্যকৃত ভৌতিক কাণ্ড বিশ্বাস হইতেছে, তখন আমাদের দেশস্থ

পুরাতন লোকদিগের যে এসকল কাণ্ডে বিশ্বাস থাকিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

পূর্ব্বে আমাদের বাটীর ছাতের উপর রাত্রিতে যে নানারূপ শব্দ হওয়ার কথা বলিয়াছি, তাহারও কারণ এক সময় প্রকাশ পাইল। এইরূপ শব্দ হইলেই আমি ছাতে যাইতাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতাম না। এক জ্যোৎস্না-রজনীতে ঐরূপ শব্দ হওয়াতে, কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিলাম যে, একটি বিড়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড পদদ্বারা তাড়াইতেছে, এবং সেসকল কিছুদূর গড়াইয়া যাইলে পুনরায় ধরিতেছে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করাতেই গড়র-গড়র শব্দ হইতেছে। আর এক যামিনীতে এইরূপ দেখিলাম যে, একটা হনুমান বারম্বার এদিক-ওদিক বেড়াইতেছে, এবং তাহাতেই নিম্নতলায় বোধ হইতেছে যেন কোন ব্যক্তি ছাতে বেড়াইতেছে। সাধারণের ভূত-বিশ্বাস থাকাতে চোরেরা ও লম্পটেরা ভূতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া লোকের অনিষ্ট করিত। আমার এক বন্ধু তারিণীচরণ রায়ের বাটীতে সন্ধ্যার পর ইষ্টক পড়িতে লাগিল। তাঁহার ভূত-বিশ্বাস না থাকাতে তিনি গুরুজনদিগকে বলেন যে, এ কাণ্ড ভূতের নহে, দস্যুকর্ত্তৃক হইতেছে। গুরুজনেরা তাঁহার কথা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। কর্ত্তারা বাহিরে থাকিতেন, এবং স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কেহই পৃথক্ থাকিতেন না। সকলেই রন্ধনশালায় যাইতেন, এবং আহারের পর একত্রিত হইয়া শয়নাগারে আসিতেন। তারিণীও আহারের সময় বাটী যাইতেন। এক রাত্রিতে সকলে আহারের পর স্ব স্ব গৃহে যাইয়া দেখিলেন যে, অনেক দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। চোরেরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘিয়া বাটী প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন, এবং তারিণীর কথা বিশ্বাস করিলেন। আমাদের দৃষ্টান্তে প্রাচীন ও মধ্যবয়স্কদিগের মন হইতে ভূত-বিশ্বাস গিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের মুখে আর প্রেত-প্রেতিনীর গল্প শুনা যাইত না।

ভূত নয়, চোর

সেকালে ডাইনীর প্রভাবের প্রতিও সাধারণের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল। নরনারী উভয় জাতির শরীরে তাহার আবির্ভাব হইত। বালক-

বালিকার জ্বর হইলে পাছে তাহাদের প্রতি ডাইনের দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে সন্ধ্যার পর মন্ত্রপূত জল পান করান হইত। যদি রোগী নিমীলিত নয়নে থাকিত, বা দুই একটি অসঙ্গত কথা কহিত, তাহা হইলে রাত্রিতে ডাইনের ওঝা দ্বারা তাহাকে ঝাড়ান হইত। ভদ্রলোকের মধ্যেও কেহ কেহ জলপড়ার মন্ত্র জানিতেন। আমার পিতা কখন কখন আমাদিগকে জল পড়িয়া দিতেন। একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে একটা লৌহদ্রব্য দ্বারা জল আবর্ত্তন করিতেন, এবং মন্ত্র পড়িতে থাকিতেন। বোধ হয়, ডাকিনীর অপভ্রংশ ডাইনী শব্দ। ডাইনীরও যে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতাম, তাহাও বিস্ময়কর বোধ হইত। আমার জেঠতুত দাদার যে স্ত্রী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় সুশীলা ও লজ্জাবতী নারী কেহ কখন দেখেন নাই। একদা তাঁহার শরীরে ডাইনীর আবির্ভাব হইয়াছে স্থির হওয়াতে, ওঝা আসিয়া তাঁহাকে ঝাড়িতে থাকে। তিনি শ্বশুর, ভাসুর প্রভৃতি সকলের সমক্ষে নিতান্ত লজ্জাহীনা হইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চৈস্বরে গালি দেন। দুইজন পুরুষ ওঝার দত্ত মন্ত্রপূত অশ্বত্থপত্রের দুইটি খিলি ঐ রমণীর কর্ণদ্বয়ে সংযুক্ত করিয়া ধরিলে, তিনি চীৎকারধ্বনি করেন, এবং পরিশেষে "ছাড়ি ছাড়ি" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হন। ক্ষণপরে চৈতন্য হইলে তিনি তাঁহার নির্লজ্জাবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হন, এবং অশেষবিধ আক্ষেপ করেন। আমাদের বাটীতে আর একটি রমণীর এরূপ অবস্থা হয়। তিনি যদিও পূর্ব্বোক্ত কামিনীর ন্যায় লজ্জাশীলা ছিলেন না, কিন্তু অতি সুশীলা ও লক্ষ্মী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ নির্লজ্জ ভাব প্রকাশ করেন, ইহা কাহারও বোধ হয় নাই। আরও কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষের এইরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি, তাহাতেও কোন কৃত্রিম ভাব বোধ হয় নাই। এই সকল ঘটনার সময় আমরা বালক ছিলাম, এবং ডাইনীর কাণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। পরে যখন এ বিষয়ে আমাদের অবিশ্বাস জন্মিল, তখন আমরা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রথমে কেহ কেহ বায়ুরোগ অনুমান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে যখন মেসমেরিজমের আশ্চর্য্য ব্যাপারসকল শুনিতে

ডাইনী

ও দেখিতে লাগিলাম, তখন ডাইনীর কাণ্ডও কোনপ্রকার মেসমেরিজম অনুমান করিলাম। শেষে ডাইনীর কাণ্ড এককালে স্থগিত হইলে এ বিষয়ের আর আন্দোলন করা যায় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়েও আমাদের অবিশ্বাস হওয়াতে ক্রমশঃ অনেকেরই অবিশ্বাস হইল।

কন্যা-বিয়োগে শোক

আমার কন্যার বিয়োগে আমি সাতিশয় শোকাকুল হই। দিবা-রাত্রি হৃদয়ের মধ্যে কেমন একপ্রকার অসুখ হইতে লাগিল। সুমিষ্ট নভেল পাঠে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। নিজ গ্রামের যুবকবৃন্দের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যে, তাঁহার নিকট হৃদয়ের যাতনা জানাইলে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করি। কৃষ্ণনগরনিবাসী যেসকল সুহৃদ্বর আমার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই আসিলেন না। তৎকালে তাঁহাদের কেহই সন্তানবিয়োগ-যন্ত্রণা জানিতেন না। পাছে কেহ আমাকে শোকপরবশ দেখিয়া উপহাস করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের সমীপস্থ হইতে আমারও ইচ্ছা হইল না। যদি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতাম, স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেই শোক উছলিয়া উঠিত। মানসিক যন্ত্রণায় শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। রক্তামাশয়ে ক্লেশ পাইতে লাগিলাম। একদিবস জনৈক সুহৃদ্বর আসিয়া আমাকে একখানি পুস্তক দিয়া কহিলেন যে,

জ্ঞানের প্রভাব

"এইখানির কোন কোন অংশ পাঠ করিলে তোমার মনের অনেক কষ্ট দূর হইবে।" ঐ গ্রন্থের নাম স্মরণ নাই। রোমদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিসিরোকে তদীয় এক বন্ধু যে এক পত্র লেখেন, তাহা ঐ পুস্তকে পাঠ করিলাম। ঐ পত্রের যে একটু ভাব মনে আছে,—তাহা এই, "তোমার (সিসিরোর) প্রিয়তমা দুহিতার পরলোকগমন-সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইলাম, এবং তাঁহার বিয়োগে তোমার যে এত অধিক শোক হইয়াছে, তাহাতে আরও দুঃখ পাইলাম। যাঁহার উপদেশে সহস্র সহস্র লোকের শোকতাপ দূরীভূত হয়, তাঁহার নিজের উপর যে শোকের ঈদৃশ প্রভাব হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই। কালেতে শোক-দুঃখ সকল ভুলিতেও হইবে। অতএব যাহা কালে সম্পাদন করিতে পারে, তাহা যদি জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন না

হয়, তবে কি আক্ষেপের বিষয়!" এই পত্র পাঠে আমার শোকের অনেক শান্তি হইল। আহা! পণ্ডিতদিগের সদুপদেশের কতই প্রভা, কতই মোহিনী শক্তি! হৃদয়বেদনার এমন ঔষধ আর কিছুই নাই।

আমার প্রতি রাণীর শ্রদ্ধা

পরবৎসর (১২৫১ বঙ্গাব্দে) আমার এক পুত্র জন্মিল, এবং কন্যা-বিয়োগ শোক এককালে তিরোহিত হইল। রাজ-বাটীতে পূর্ব্বমত গমনাগমন করিতে, এবং রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। আমাকে রাজা যেমন ভাল-বাসিতেন, রাণীও তেমনই ভালবাসিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, অথচ পিতার ন্যায় ভক্তি দেখাইতেন। মনের সকল সুখদুঃখ আমাকে জানাইতেন। স্বামীর প্রতি যদি কখনও বিরক্তা হইতেন, আমি অনুরোধ করিলেই তাঁহার বিরক্তি দূর হইত। যেসকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেন, তাহার কিয়দংশ আমাকে না দিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন না। ষষ্ঠী-পূজা উপলক্ষে আমাকে কখন কখন বস্ত্র প্রদান করিতেন। পীড়া হইলে রাজকুমারদিগকে আমার নিকট রাখিতেন। রাণী ঠিক আমার সমবয়স্কা ছিলেন। সুতরাং আমাকে এত ভালবাসেন বলিয়া, পাছে রাজার মনে কোন ঈর্ষাভাব উপস্থিত হয়, এজন্য আমি কখন কখন অতি কুণ্ঠিত হইতাম। কিন্তু রাজার যেরূপ উন্নত চিত্ত ছিল, ও আমাকে তিনিও যেপ্রকার ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাতে বোধ হয় না যে, কখনও তাঁহার মনে কোন নীচ ভাবের উদয় হইত। বরং রাণী আমাকে ভালবাসাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। যখন তিনি রাণীর ক্রোধ-শান্তির কোন উপায় না দেখিতেন, তখন তাঁহাদের কলহে আমি রাজবাটী-ত্যাগে উদ্যত হইয়াছি,—এইরূপ ষড়যন্ত্র দ্বারা রাণীর ক্রোধের শান্তি করিতেন।

ইঁহাদের আমার প্রতি ভালবাসা অতীব সুখের বিষয় ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময় রাজসংসারের যেরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহাতে এখানে থাকিয়া আমার চলিবার আশা ছিল না। সুতরাং মনোমধ্যে কখন কখনও বড়ই অসুখ উপস্থিত হইত। আমি কর্ম্মান্তরের

চেষ্টা করিতে লাগিলাম ; এবং যাবৎ স্থানান্তরে সুবিধা না হয়, তাবৎ এখানে থাকিবার মানস করিলাম।

কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিস্তার

যদিও আমাকে বর্দ্ধমানের রাজার নিকট পাঠানতে কোন ফল হইল না, তথাপি রাজা শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে, সন্ধ্যার কাম্যভাগ ত্যাগ করিয়া, নিত্যভাগ যাহাতে শুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা আছে, তাহা স্বতন্ত্র করাইয়া এক পদ্ধতি প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার এক এক খণ্ড আমাদিগকে দিলেন। আমি ঐ পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিতকালে ভক্তিভাবে সন্ধ্যা করিতাম। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মাবলি আনাইয়া তাহাতে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলমণি গড়গড়ি ও আমার স্বাক্ষর করাইলেন। রাজার ইচ্ছানুসারে, ব্রাহ্মধর্ম্মবিস্তারের জন্য দেবেন্দ্রবাবু হাজারি লালা নামক এক ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন।

এই সময় রাজা নবাবের বিবাহ উপলক্ষে মুরসিদাবাদে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইলাম। কৃষ্ণনগরে ক্রমশঃ ৪০।৫০ জন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিতে পাইলাম। এক-মাসের পর সংবাদ গেল, রাজবাটীতে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং প্রতি বুধবারে যথানিয়মে উপাসনা হইতেছে। কায়স্থজাতীয় হাজারি লালা সমাজের উপাচার্য্য হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন, রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, এবং আর দ্বিতীয়বার সমাজ না হয়, তজ্জন্য আমাকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা প্রত্যাগমন করিলে, আমিনবাজারে ঐ সমাজ অধিষ্ঠিত হইল। আমরা তথায় শ্রদ্ধাপুর্ব্বক উপাসনা করিতে লাগিলাম।

ধর্ম্মে অনুরাগ

বাল্যাবস্থা হইতে ঈশ্বরোপাসনায় আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। যখন তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করি নাই, তখন আমি কালীমূর্ত্তির ধ্যান করিতাম। আমার এই ভাব দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী আমাকে কহিতেন, "ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে নাই, কিন্তু তোমার মানস সিদ্ধ হইবে এই পর্য্যন্ত বলিতে

পারি।" ১৪ কি ১৫ বৎসর বয়সে আমি জননীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি, এবং নবদ্বীপের লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ আমার উপগুরু হন। আমাদের বংশের এই প্রথা আছে যে, মাতা কেবল মূলমন্ত্র কর্ণে প্রবিষ্ট করেন, এবং উপযুক্ত ইষ্টদেবতার আকার বলিয়া ও ধ্যান শিখাইয়া দেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গাঢ় ভক্তির সহিত ইষ্টদেবতার পূজা করিতাম। পরে ইংরেজী নানাবিধ গ্রন্থ ও রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক পাঠে, সাকার উপাসনার প্রতি অভক্তি জন্মিলে, নিরাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরমেশ্বরেতে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, এই দুই উপাসনাব প্রধান অঙ্গ বোধ হইল। আর, বেদ যে ঈশ্বর-প্রণীত, ইহাতে সন্দেহমাত্র রহিল না।

যে সময় বর্দ্ধমানাধিপতির ব্রাহ্মধর্ম্মবিস্তারের প্রতি বিরাগ জন্মিয়া নিজের হিন্দুয়ানীর উন্নতিসাধনে আগ্রহাতিশয় হইল, সে সময় নবদ্বীপাধিপতিরও সকল উৎসাহ কেবল আমোদ-প্রমোদে পরিণত হইল। ইহাদের দোষ কি দিব? আমাদের মধ্যে অনেকেরও আর এ বিষয়ে উৎসাহ রহিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইল। কিছুদিন পরে আমাদেরও ঐ ভাব হইয়া উঠিল। যাহা হউক, সমাজের কার্য্য কোনরূপে চলিতে লাগিল।

কৃষ্ণনগর কলেজ

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মহামতি গবর্ণর জেনারেল হারডিঞ্জ বাহাদুরের কৃপায় কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হইল। তৎকালে কলিকাতা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে রাজপুত্রদিগের কলেজে বা স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তির প্রথা ছিল না। তাঁহাদের অন্যান্য বালকের সহিত একাসনে উপবেশন নিতান্ত অসম্মানজনক বোধ হইত। শুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সন্তানগণ কলেজে পড়িতেন, এরূপ নহে। অতি নীচজাতীয় বালকেরাও কলেজে পড়িত। কলেজে প্রবিষ্ট হইলে,

পুরাতন রাজকুমারদিগের শিক্ষাপদ্ধতি

চণ্ডালের সন্তানের সহিত একাসনে রাজপুত্রের বসিতে হইবেক। সন্তান বিদ্বান হইলে ধন, মান, যশ ও খ্যাতি লাভ করিবার যেরূপ আশা সাধারণ লোকের মনে হয়, রাজাদের মনে সেরূপ হইত না। তাঁহারা

ভাবিতেন, সন্তান চাকুরী করিবে না, ইংরেজী পড়িতে ও কহিতে ও লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার জন্য মানের হানি করিবার প্রয়োজন কি? এরূপ ভাব ইয়ুরোপের উচ্চপদস্থ লোকের মনেও একসময় উদয় হইত। তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীশচন্দ্রের পুত্রকে কলেজে দিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু অন্যান্য পুরাতন রাজাদের নিন্দার ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষে কলেজের অধ্যাপকদিগের সহিত এই নিয়ম স্থির করিলেন যে, রাজকুমার কোন এক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কিন্তু পৃথক আসনে বসিয়া পড়িবেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে, একজন ইন্‌স্পেক্টার রাজপুত্রকে পৃথক আসনে দেখিয়া ও তাহার কারণ শুনিয়া ইন্‌স্পেক্‌শন্ রিপোর্টে লিখিলেন যে, "কুমারটি বুদ্ধিমান বোধ হইল, কিন্তু এ নিয়মে পড়িলে কলেজে শিক্ষার পূর্ণ ফল পাইবার আশা নাই।" লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এই রিপোর্ট পাঠে কলেজ-অধ্যক্ষকে লিখিলেন যে, "নবদ্বীপের রাজা যেরূপ বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে যে, পৃথক আসনে বসিলে ও স্বশ্রেণীর ছাত্রগণ হইতে পৃথক থাকিলে যে দোষ হয়, তাহা তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্যই রাজকুমারকে কলেজের নিয়ম পালন করিতে দিবেন।" রাজা উক্ত পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া গবর্ণরের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

কলেজে কুমার সতীশচন্দ্রের প্রবেশ

যখন রাজা রাজকুমারকে কলেজে দেওয়া স্থির করেন, সেই সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি শিক্ষকের কার্য্যই করিবে, কি কর্ম্মান্তরে প্রবিষ্ট হইবে?" আমি উত্তর করি যে, "আমি শিক্ষকের ব্যবসায় চিরদিন কাটাইব, এরূপ সঙ্কল্প করি নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি প্রফুল্লবদনে কহিলেন যে, "আমার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর নিতান্ত অভাব আছে। যদি তুমি তাহা দূর কর, তবে আমার বড়ই উপকার হয়।" আমি উত্তর করিলাম যে, "আপনি আমাকে প্রতিপালন করিতে পারিলে আমার স্থানান্তরে যাইবার কোন প্রয়োজন

রাজসংসারে আমার জন্য চাকুরী

হইবে না।” একথা শ্রবণে তিনি অতীব আনন্দ প্রকাশ করিলেন; এবং তাঁহার সংসারের কোন কোন কার্য্যের ভার আমাকে দিলেন।

তৎকালে রাজসংসারে দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজগুরু গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য কতকগুলি মহালের কর সংগ্রহ করিয়া রাজস্ব দিতেন; এবং রামমোহন চৌধুরী কয়েক মহালের খাজানা আদায় করিয়া সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য চালাইতেন। এই সমস্ত ব্যয়ের তত্ত্বাবধায়করূপে আমি নিযুক্ত হইলাম। প্রথম কয়েক মাস গৃহস্থিত বস্ত্র ও অন্য কোন কোন দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিলাম। তৎপরে সংসারের ব্যয়ের ন্যায্যান্যায্য বিষয়ের পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রথম বৎসরের এক মুদির হিসাবেই পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা পাঁচশত টাকার কেফায়ত হইল। এ বিষয় রাজার জ্ঞাতকরণার্থ আমার মোহরেরা আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। কিন্তু এই লাভ-সাধনে আমার বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিতে হয় নাই বলিয়া, আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম না। রাজা পরম্পরায় ইহা শ্রুত হইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন যে, “দেখ, আমার চাকরেরাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে!” কিছুদিন পরে মোকদ্দমা-সমূহের তত্ত্বাবধানের ভারও আমার প্রতি অর্পিত হইল। যদিও রাজার কর্ম্মচারী-শ্রেণীভুক্ত হইলাম, তথাপি রাজা ও তাঁহার সমস্ত পরিবার আমাকে পূর্ব্বে যেরূপ মান্য করিতেন, এক্ষণেও সেইরূপ মান্য করিতে লাগিলেন। রাজসংসারে এই এক চিরপ্রথা ছিল যে, কোন পত্তনির ইজারা বন্দোবস্ত হইলে, প্রধান প্রধান পক্ষের উৎকোচ ব্যতীত দরবার খরচ বলিয়া পত্তনিদার বা ইজারাদার কিছু টাকা দিত। তাহার মধ্যে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিজাংশ লইয়া, অবশিষ্টাংশ রাজবাটীর সমস্ত আমলা ও চাকরকে বিভাগ করিয়া দিতেন। এ বিষয় রাজার জ্ঞাতসার ছিল। একদিন গুরু ভট্টাচার্য্য আমাকে বহু স্নেহ দেখাইয়া কহিলেন, “যে টাকা রাজার জানিত, তাহাকে উৎকোচ বলা যায় না। তবে

আমার প্রতি রাজার বিশ্বাস

দরবারের খরচ গ্রহণে আপত্তি

তাহার অংশ গ্রহণ করিতে কি পাপ হয়? সম্প্রতি বন্দোবস্তে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আমি তোমার নামে ১৫৲ টাকা লিখিয়াছি। ইহা তোমায় লইতে হইবে।" কিন্তু আমি সে টাকা লইলাম না। কয়েকদিন পরে যৎকালে আমি রাজসন্নিধানে উপস্থিত ছিলাম, সেই সময় উক্ত ভট্টাচার্য্য রাজাকে কহিলেন যে, "কার্ত্তিককে দরবার খরচের টাকার অংশ লইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলাম, তথাপি লইতে চাহেন না। রাজসংসারে বেতন অল্প হইলেও এইরূপে সকলের চলিয়া থাকে।" রাজা উত্তর করিলেন যে, "ইহাঁদের মনের স্বতন্ত্র ভাব হইয়াছে। অতএব ইহার অংশের টাকা আমার নিকট পাঠাইবেন, আমি হাতে করিয়া দিব।" এই টাকা আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে লাভ বোধ না হইয়া বরং মনোমধ্যে অসন্তোষ জন্মিল। কয়েকদিন পরে রাজাকে কহিলাম, "আমি দেখিতেছি যে, যখনই কোন ইজারা বা অন্যরূপ বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তখনই সকল আমলাই আপনাদের কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় প্রভুর লাভালাভের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করেন না, এবং যাহাতে বন্দোবস্তটির সংঘটন হয়, তাহারই জন্য ব্যস্ত হন। সচরাচর মনুষ্যমাত্রেই স্বার্থপর। আমার অবস্থা স্বচ্ছন্দরূপ নহে। কি জানি যদি আমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আপনার লাভের দিকে মন না থাকিয়া, নিজের স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়, এই আশঙ্কা আমার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমি এই দরবার খরচের টাকা আর লইব না।" "তোমার মনে এত সন্দেহও উদয় হয়,"—এই বলিয়া রাজা কহিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।" গুরু ভট্টাচার্য্য যে প্রস্তাব করেন, তাহা আমার মঙ্গলার্থে নহে। কিছুদিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার প্রস্তাবের অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, উৎকোচ-বিরোধী বলিয়া আমার যে যশ আছে, তাহা যাইবে; দ্বিতীয়তঃ, উপরিলাভ হইতেছে বলিয়া আমার বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না; তৃতীয়তঃ, আমাকে স্বদল-ভুক্ত করিতে পারিলে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নিষ্কণ্টক হইবে। আমি আর দরবার খরচের টাকা না লওয়াতে বোধ হয়, তিনি "শিকার যে ফশকিয়া গেল," তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তৎকালীন সকল লোকের মনেই, উৎকোচ পাপ বলিয়া প্রতীত ছিল না। একারণ প্রভুরা ভাবিতেন, কর্ম্মচারীদের বেতন যতই কেন অধিক হউক না, তাহারা উৎকোচ-গ্রহণে কখনই বিরত হইবে না। তবে বেতনবৃদ্ধি করিয়া অধিক টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু ভারের উপযুক্ত বেতন দিলে তাহাতে সুফল ফলে কিনা, তাহা একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন না। একজন ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী, আপনার অবসন্ন অবস্থার উন্নতিসাধন কিরূপে হইতে পারে, তাহার সদুপদেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি কহিলাম যে, "দুইশত টাকা মাসিক বেতনে একজন ভদ্রলোক নিযুক্ত করুন, তাহা হইলেই আপনার মঙ্গল হইবে দেখিবেন।" তিনি উত্তর করিলেন যে, "অধিক বেতন দিলেই কি আপনার মত ভদ্র ও নিঃস্বার্থ লোক পাওয়া যায়?" আমি প্রত্যুত্তর করিলাম যে, "উপযুক্ত বেতন দিলে আমার মত শত সহস্র ভদ্রলোক পাইবেন।" আমি এ বিষয় তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অনেক কথা কহিলাম, কিন্তু বোধ হইল, তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার দূর করিতে পারিলাম না। তিনি ক্রমশঃ আরও অবসন্নাবস্থাপন্ন হইলেন, তথাপি আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন না। আমার বোধ হয় যে, সাক্ষাৎকার ব্যয়ের উপরই তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেন। অসাক্ষাৎ-কারে যে কত ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেন না; ভদ্রলোকের প্রতি ভারার্পণ হইলে যে-বিষয়ে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইতেছে তাহা দশ টাকায় নির্ব্বাহ হইবে, অথবা যে যে বিষয়ের আয় দশ টাকা আছে, তাহার আয় পঞ্চাশ টাকা হইবে, ইহা তাঁহাদের বিবেচনায় আসিত না। এদেশীয় লোকদিগের এরূপ ভ্রম ছিল, এমত নহে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও প্রথমে এই ভ্রম ছিল। তাঁহাদের যেসকল কর্ম্মচারীরা অল্প বেতনে নিযুক্ত হইয়া প্রচুর উৎকোচ লইতেন, তাঁহারাই উপযুক্ত বেতন পাইয়া সৎ হইয়া উঠিলেন। আমার বোধ হয় কোম্পানি যেমন আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া অধিকৃত্যদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ যদি এদেশস্থ ভূম্যধিকারিগণ

উৎকোচ-প্রথা

আমলার বেতন-বৃদ্ধিতে জমি-দারের মঙ্গল

করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বংশের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। গুরু ভট্টাচার্য্যের প্রতি যেসকল ভার ছিল, তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষের সময় যেসকল জমিদারী হস্তান্তরিত হয়, তৎসমুদায়ের অধিকাংশ রাজস্ব-পরিশোধের ত্রুটীতেই নীলাম হইয়া গিয়াছিল। দেনাশোধ বিষয়ে রাজবাটীর এতই অসম্ভ্রম হইয়াছিল যে, অধিক টাকা আবশ্যক হইলে সহসা হস্তগত হওয়া দুষ্কর হইত।

আমার প্রতি মোকদ্দমা তদ্বিরের ভার

সুতরাং রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ টাকা পাছে মহালে আদায় না হয়, এই আশঙ্কায় রাজা শ্রীশচন্দ্রের মনে অত্যন্ত চিন্তা উপস্থিত হইত। একারণ শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের সহিত এই বন্দোবস্ত করিলেন যে, রায় মহাশয় মহালের খাজানা হইতে হউক, আর কর্জ্জ করিয়াই হউক, রাজস্ব রীতিমত দিবেন; এবং তন্নিমিত্ত মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন ও মহালের খাজানার কিস্তি-খেলাপী সুদ সমস্ত পাইবেন। রাম-মোহন চৌধুরী কর্ম্ম ত্যাগ করাতে, গুরু ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। এক্ষণে কেবল মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করিবার ও যেসকল দরখাস্ত হইত, তাহাতে আমার অভিপ্রায় লিখিয়া দিবার ভার আমার প্রতি থাকিল। রাজস্ব যথানিয়মে দেওয়া এবং সাংসারিক ব্যয় চালান, এই দুই প্রধান কর্ম্ম ছিল। কিন্তু এই উভয় কার্য্যেই আমি অক্ষম ছিলাম। যেহেতু নিজের যথেষ্ট টাকা না থাকিলে প্রথমোক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত না; এবং অপ্রতুলতাবশতঃ মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত শেষোক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিত না। এই দুই কর্ম্ম ব্যতীত যে যে সকল কর্ম্ম ছিল, তৎসমুদয় অতি সামান্য। সুতরাং আমার স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কেমন করিয়া এই কথা রাজাকে কহিব, এই ভাবনায় কাল গত হইতে লাগিল। একদিন শ্রীবা়ন নির্জ্জন স্থানে অতি কষ্টে তাঁহাকে বলিলাম যে, "আপনি আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহাতে আমার রাজবাটী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এক্ষণে আমি আপনার কোন কার্য্যেই আসিতেছি না। কেবল অনর্থক বেতনভোগ করিতেছি। অতএব কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দেন।"

আমার কর্ম্ম-ত্যাগের ইচ্ছায় রাজার প্রতিবাদ

রাজা উত্তর করিলেন, “তুমি যে আমাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আমার কন্যা অল্পবয়সে গর্ভবতী হওয়াতে প্রসবকালে পাছে তাহার জীবন যায়, এই আশঙ্কায় আমি নিরন্তর চিন্তিত থাকিতাম, এবং পূর্ণগর্ভা হইলে কখন প্রসববেদনার সংবাদ আসিবে, এই ভাবনায় যারপরনাই উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাল কাটাইতাম। সেই সময় আমার মন যেমন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে তুমি কখন কর্ম্ম-ত্যাগের কথা বলিবে, এই ভাবিয়া সেইরূপ অস্থিরচিত্ত হইয়া রহিয়াছি। আমি যদি অকারণেই তোমাকে বেতন দেই, তাহাতে তোমার কি পাপ হইতে পারে ?” আমি উত্তর করিলাম, “ইহাতে পাপ হইতেছে কি না জানি না ; কিন্তু অতি অপ্রসন্নচিত্তে আছি।” রাজা কহিলেন, “কিন্তু তোমার দ্বারা আমার যে এক মহৎ কর্ম্ম হইতেছে, তাহা আর রাজ-বাটীর কাহারও দ্বারা হইতেছে না। সকলেই আমাকে সন্তোষজনক বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমার দোষের কথা তুমি ব্যতীত আর কেহই কহেন না। অতএব যদি তোমার আর কোন কার্য্যই না থাকে, তথাপি এই কার্য্যটির জন্য থাকিতে হইবে।” তাঁহার জীবনাধিক কন্যার জীবনসংশয়ের সহিত আমার বিরহের তুলনায়ও আমি ততদূর বিগলিতহৃদয় হই নাই, যতদূর আমি তাঁহার শেষ ভক্তিপূর্ণ কথায় হইলাম। তিনি যে ভাব রসনা দ্বারা ব্যক্ত করিলেন, তদতিরিক্ত তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তাঁহার বদন শুষ্ক হইল, এবং নয়ন ছলছল করিতে লাগিল। আহা! এইসকল

রাজার স্নেহ

বন্ধুত্বের কথা স্মরণ হইলে কতই আনন্দ হয়, আবার ইহার তিরোধান মনে হইলে কতই বিষাদ হয়। তাঁহার কথার আর উত্তর করিতে পারিলাম না, এবং প্রতিজ্ঞারক্ষায় আর সমর্থ হইলাম না।

মুন্সেফী পরীক্ষার পুনরুদ্যোগ

আমি পূর্ব্বে একস্থানে লিখিয়াছি যে, মুন্সেফী পরীক্ষার উপর নিজের আশা-ভরসা অনেকটা স্থাপন করিয়া, দুইবার তাহার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু জজ সাহেবের সার্টিফিকেট না পাওয়াতে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। এই সময়

চট্টগ্রাম প্রদেশের জন্য পুনর্ব্বার মুন্সেফী পরীক্ষার ঘোষণা হওয়াতে, শ্রীপ্রসাদ ও আমি পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিলাম। যে জজ সাহেব পূর্ব্বে সার্টিফিকেট দেন নাই, তিনি রাজার এক আটচালায় থাকিতেন, কিন্তু ভাড়া প্রায় দিতেন না। তিনি রাজার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবেন মনে করিয়া, তাঁহার এক পত্রের সহিত সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত করিলাম; এবং সাহেবও আমাকে প্রশংসা-পত্র পাইবার যোগ্য স্থির করিয়া সদর দেওয়ানীতে লিখিলেন। পরীক্ষার নির্দ্ধারিত দিবসের কয়েকদিন পূর্ব্বে, আমি ও কলিকাতাবাসী একজন আত্মীয় ভবানীপুর যাইয়া বাসা করিলাম। সেখানে আর কয়েক পরীক্ষার্থীর সহিত একত্র পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার তিন দিন পূর্ব্বে নূতন সহপাঠীদিগের মধ্যে একজন কহিলেন যে, "সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিলে পরীক্ষার প্রশ্নসকল পাওয়া যাইতে পারে।"

অসৎসঙ্গের ফল

আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। ইদানীন্তন প্রকাশিত বিধির বিষয়েই অধিক প্রশ্ন হইবে, এইরূপ ভাবিয়া আমি নূতন বিধিসকল একবার পড়িয়া, পুনরায় পরীক্ষার পূর্ব্বদিবস বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পড়িব, মনে করিয়াছিলাম। পরীক্ষার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে এইসকল নববিধি পড়িতেছি, এমন সময় নূতন সহপাঠী তিনজন একটি কাগজে ৩৬টি প্রশ্ন দেখাইয়া কহিলেন যে, ইহারই মধ্যে ১২টি প্রশ্নের পরীক্ষা হইবে। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া এই প্রশ্নকয়টি দেখিতে লাগিলাম। প্রশ্নগুলির অর্থ অতীব উৎকট ছিল। তাহার মর্ম্ম বুঝা বড়ই দুষ্কর হইল। সঙ্গীরা প্রশ্নাবলীর অর্থ বুঝিয়াছেন, এইরূপ তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল, কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না। সে রাত্রিতে এই বিষয়ের আন্দোলনে সময় গত হইল। আমি আর নূতন বিধির পুনঃপাঠে মন দিতে পারিলাম না। এই সহপাঠীদের মধ্যে দিগনগর-নিবাসী একজন ছিলেন। তিনি পরদিবস প্রত্যুষে আমাকে স্বস্থানে লইয়া যাইয়া অতি সঙ্গোপনে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিলেন। কিন্তু বেলা দ্বাদশ ঘণ্টার সময়ে টাউন হলে উপস্থিত হইয়া যখন প্রশ্নের কাগজ

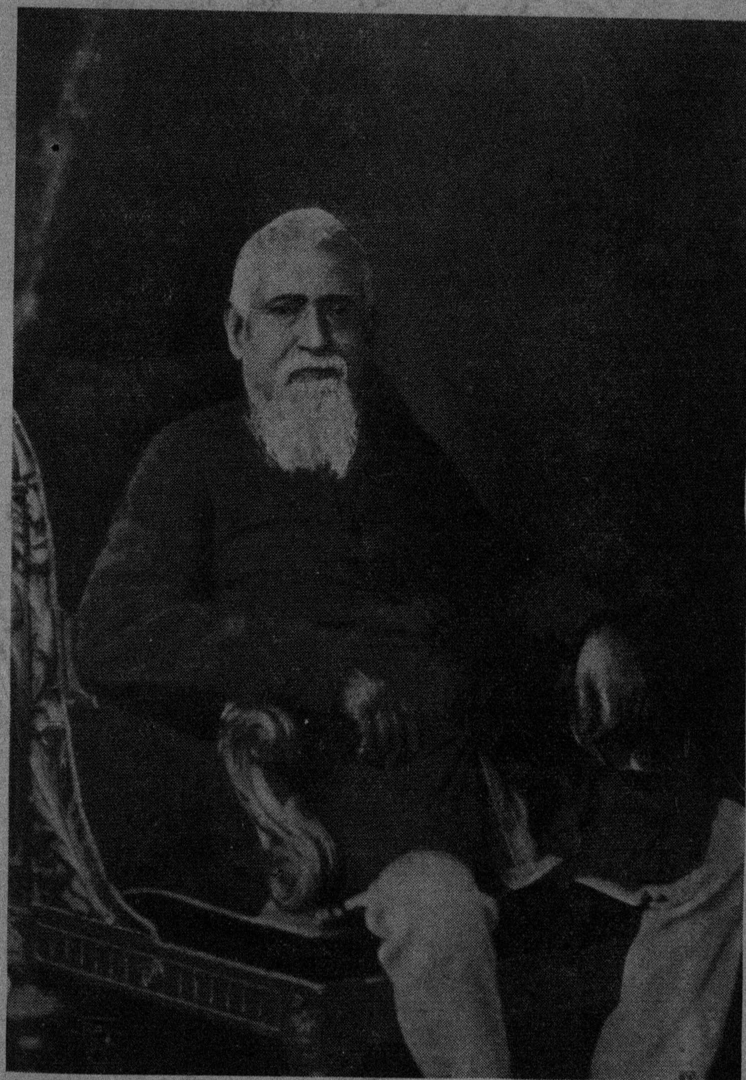
পাইলাম, তখন একটিও আমাদের জানিত দৃষ্ট হইল না, সকলই নববিধি-সংক্রান্ত দেখিলাম। আমার মস্তিষ্ক যেন ঘূর্ণায়মান হইল, এবং চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া গেল। চিত্তের স্থৈর্য্য আর সম্পাদন করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, পাপের ফল হাতে হাতে ফলিল। যাহা হউক, অল্পসময় মধ্যে ১২টি প্রশ্নের উত্তর লিখিলাম। কিন্তু ভাবিলাম, ৯টির প্রকৃত উত্তর হইয়াছে, দুইটির উত্তর হইয়াছে কিন্তু ভালরূপ লিখিতে পারি নাই, এবং আর একটির উত্তর সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে। আমি ইত্যগ্রে কখনও পরীক্ষার প্রথা মোটেই জানিতাম না। আমার বোধ ছিল, সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে না পারিলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং আমার মনে হইল যে, আমার পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার আশা নাই। দুর্গোৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বে এই পরীক্ষা হইয়া গেল। মৌখিক পরীক্ষার দিন পূজার পর ধার্য্য হইল। পূর্ব্বে সদর দেওয়ানী হইতে এই আদেশ হয় যে, "পরীক্ষোত্তীর্ণগণের মধ্যে কেহ চাঁটগায়ে যাইয়া মুন্সেফী করিতে অসম্মত হইলে, তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া যাইবে।" একে এজন্য পরীক্ষা দিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তাহার উপর উত্তীর্ণ হইবার সম্পূর্ণ ভরসা থাকিল না। সুতরাং মৌখিক পরীক্ষাতে আর উপস্থিত হইলাম না। যে বুদ্ধিদোষে মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই বুদ্ধিদোষে আবার এই ভুল করিলাম। পরে কোন পরীক্ষোত্তীর্ণ আত্মীয়ের পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, প্রথম পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, এবং মৌখিক পরীক্ষার দিন আমার দুইবার ডাক হইয়াছিল। অস্থিরপ্রতিজ্ঞ লোকের যে অনিষ্ট হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমার জীবনীতে বিলক্ষণ আছে। এই পরীক্ষার কিয়ৎকাল পরে এখানে উকীলের জন্য পরীক্ষা উপস্থিত হইল। শ্রীপ্রসাদ আমাকে কহিলেন যে, "ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব তোমার পরীক্ষা দিতে হইবে। ওকালতী করিলে বাটী থাকিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, এবং সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে।" আমি উত্তর করিলাম যে, "যদি আমি ওকালতী ব্যবসা করি, তবে জানিয়া শুনিয়া কখনই অন্যায়পক্ষের

ওকালতীতে অনিচ্ছার কারণ

উকীল হইতে ও সাক্ষীকে মিথ্যা শিখাইতে বা কৃত্রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিতে পারিব না। সুতরাং আমাকে ওকালতনামা দিতে কে আসিবে? মনে কর, সাধারণ সম্পত্তির একজন প্রধান অংশী, অন্য এক ক্ষুদ্র-অংশী অনাথিনী বিধবা রমণীর স্বত্ব আত্মসাৎ করণার্থ এক মোকদ্দমা উত্থাপিত করিয়া আমার নামে ওকালতনামা দিবেন। আমি কি, দুঃখিনীর সর্ব্বনাশ সাধনার্থ, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত এই মোকদ্দমায় নিযুক্ত করিব? ইহা কখনই পারিব না। আর যদি আমি ন্যায়পক্ষের ব্যতীত অন্যায়পক্ষের উকীল হইব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি, তাহা হইলে আমার এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি আছে যে, তথাপি আমার ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে?" শ্রীপ্রসাদ, তারিণীচরণ ঘোষ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামগোপাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই সেইবার পরীক্ষা দেন, এবং সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা না দেওয়াতে অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহাও পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, এই পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে কেহ কেহ কিয়ৎকাল ওকালতী করিয়া অতি সামান্য চেষ্টায় মুন্সেফ বা ডেপুটী কলেক্টর হইলেন।

ধর্ম্মে অনিশ্চয়তা

আমার বৈষয়িক বিষয়ে যেমন নানা ঘটনা হইয়াছে, আন্তরিক বিষয়েও তেমনই বিবিধ বিপ্লব ঘটিয়াছে। বাল্যাবস্থায় যাহা সত্য মনে করিয়াছি তাহাকে আবার যৌবনাবস্থার প্রারম্ভে মিথ্যা ভাবিয়াছি। আবার যৌবনের প্রারম্ভে যাহা সত্য ভাবিয়াছি তাহাও পূর্ণযৌবনাবস্থায় অসত্য বোধ করিয়াছি। পূর্ণযৌবনে যাহা স্থির করিয়াছি তাহাও আবার কিয়ৎকাল পরে ভিন্নরূপ ভাবিয়াছি। বাল্যকালে পৌত্তলিকধর্ম্মের ও প্রচলিত আচার-ব্যবহারের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলাম। তাহার অবিশ্বাসী ও বিরুদ্ধাচারিগণকে কতই নির্ব্বোধ ও অধার্ম্মিক ভাবিতাম। যৌবনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েকখানি ইংরেজি পুস্তক, রাজা রামমোহন রায়ের কয়েকখানি পুস্তিকা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পড়িয়া, এবং কোন কোন সুশিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তির উপদেশ শুনিয়া, একব্রহ্মবাদী হইলাম। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া মানিলাম,



স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী

এবং পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মকে উপহাসাস্পদ মনে করিলাম। পূর্ণযৌবনে আবার এই বেদকে মানব-কল্পিত বলিয়া জ্ঞান করিলাম। যখন রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্কলিত বেদের উপনিষৎ ভাগ পাঠ করিলাম, এবং কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের বেদের সারাংশের ব্যাখ্যা শুনিলাম, তখন বেদের প্রতি অসীম ভক্তি জন্মিল। পরে যখন বেদের কর্ম্মকাণ্ড অংশের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল, এবং যখন বেদান্তদর্শনের মায়া প্রণালীর মর্ম্ম অনুভূত হইতে লাগিল, তখন আর বেদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে পারিলাম না।

পরে যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, যতই নানা মতের বিভিন্নতা জ্ঞানগোচর হইতে লাগিল, এবং যতই সত্য নির্ব্বাচন পথে বুদ্ধি ধাবিত হইতে লাগিল, ততই মনোমধ্যে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক ও সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। শেষে সকল বিশ্বাসের মূল ছিন্ন হইয়া যেন অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িলাম ও অজ্ঞানসাগরে ভাসিতে লাগিলাম। মনে হইল, যাহারা প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটা ধর্ম্মের বিশ্বাস করিয়া আছেন তাঁহারাই সুখী, ও যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানী হইয়া ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা অসুখী। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ত এই হইল, আবার আচার-ব্যবহার বিষয়ে কিরূপ ঘটিল, তাহাও বলিতেছি। এক্ষণে য়ুরোপ-দেশীয়েরা সভ্যচূড়ামণি হইয়াছেন, এই স্থির সিদ্ধান্ত হইল। সুতরাং সংসারযাত্রানির্ব্বাহের যে প্রণালী তাঁহারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীতি জন্মিল ; এবং তাহারই অনুকরণ করিবার বিশেষ যত্ন হইয়া উঠিল। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষাকর ও পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে ধারণা ছিল। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদরপূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে, আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা

আচার-ব্যবহার

এ দেশের সমাজ সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দু কলেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখনও কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম, এবং বড়ই সুখী হইতাম। প্রথমে কেবল সুরার গুণের দিকেই মনোযোগ হইল। অল্প পানে শরীর ভাল থাকে, অধিক শ্রম করিতে পারা যায়, ক্ষণবিলম্বে শারীরিক শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হয়, মানসিক শক্তিও বর্দ্ধিত হয়, বিষণ্ণ হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে, অল্পকাল মধ্যে পরস্পর সুহৃদ্ভাব জন্মে, এবং জাতিভেদ-সংস্কারের অদ্বিতীয় উপায় হয়। এইসকল বিবেচনায় ইহা আমাদের অতি আদরের ধন হইল। আমরা কেহই প্রত্যহ বা অধিক পরিমাণে পান করিতাম না। যখন দুই চারি বন্ধু একত্র হইতাম, তখন কখনও কখনও মৃদু মদিরা পান করিয়া সুখসাধন করিতাম। আমার স্মরণ হয় না যে, যৌবনাবস্থায় প্রয়োজন ব্যতীত কখনও একাকী পান করিয়াছি। কিন্তু তাহার পর ইহার ক্ষমতার ও গুণের বিষয় বিলক্ষণরূপে দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি এবং অদ্যাপিও দেখিতেছি।

রাজার পানাসক্তি

রাজা শ্রীশচন্দ্রের ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষ তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে মদিরা পান করিতেন, কিন্তু মত্ততাপরবশ হইয়া অতি অশ্রদ্ধাস্পদ হইতেন। তাঁহাদের দুর্দ্দশা শ্রবণে ও দর্শনে, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, "এ গরল কখনও স্পর্শ করিব না।" কিন্তু যৌবনাবস্থায় আমাদের সংসর্গে ও আমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহার এ প্রশংসিত প্রতিজ্ঞা বিলোড়িত হইয়া গেল, এবং মদিরা তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। তিনি প্রথমে অতি সঙ্গোপনে কখনও কখনও আত্মীয়দিগের সহিত পান করিতেন, এবং যাহাতে ইহার বশতাপন্ন না হন, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বগণের মধ্যে কেহ কেহ ঈদৃশ সুরাসক্ত হইলেন যে, তাঁহাদের অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। আমাদের দৃষ্টান্তের বিষময় ফলোৎপত্তি দেখিয়া আমি এককালে

মদিরা-পানে বিরত হইলাম, এবং তাঁহাদিগকেও ইহাতে বিরত করাইবার বিশেষ চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহাদের এ প্রবল প্রবাহ ফিরাইতে পারিলাম না। এমন কি, তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে একজনও আমার অনুগামী হইলেন না। যাঁহারা আমাকে গুরুর ন্যায় মানিতেন এবং আমার কথার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারাও আমার অনুরোধ একদিনের জন্যও রক্ষা করিলেন না। কেহ কেহ মত্ততাবস্থায় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতেন যে, এ জীবন কখনই চিরস্থায়ী হইবে না, তবে যতদিন সুখে যায়, ততদিনই ভাল। অসুখের দশ বৎসর অপেক্ষা সুখের এক বর্ষও ভাল। এইসকল কাণ্ড দর্শনে মনোমধ্যে অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইত। ভাবিতাম, সংসারে কাহারও মঙ্গলসাধনে সক্ষম হইলাম না, প্রত্যুত অনেকের অমঙ্গল করিয়া তুলিলাম।

আমার পানত্যাগ

এই সময় আমি আমিষ-ভক্ষণেও বিরত হই। মনুষ্যের আমিষ-ভক্ষণ ঈশ্বর-অভিপ্রেত কিনা, তাহার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই, কিন্তু যখন এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, ও যখন আমিষ ত্যাগ করায় কোন দোষ নাই, তখন ইহা ত্যাগ করাই উচিত ; এই বিবেচনা করিয়া নিরামিষভোজী হইলাম। সকল বান্ধবেরাই আমার বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। আমি এই বিষয়ের কিছু স্থির করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু জীবহিংসা ব্যাপারটি যেমন বিগর্হিত ও নিষ্ঠুর বোধ হইত, অহিংসা ধর্ম্মটি তেমনই পবিত্র ও হিতকর অনুমিত হইত। আমি বন্ধুবর্গের সহিত কখনও কখনও এই বিষয়ের ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতাম। তাঁহারা স্বপক্ষ-সমর্থনার্থ এত সুসঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন করিতেন যে, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইতাম। তৎকালীন তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আমিষ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আপনি কি কি যুক্তিতে আমিষ-ভক্ষণ অকর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন ?" তিনি উত্তর করিলেন যে, "আমি আমার রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' পুস্তকের পরিশিষ্টতে আমিষ-ভক্ষণ যে

আমিষ ত্যাগ

ঈশ্বর-অনভিপ্রেত, তাহার অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। ফলতঃ যে কার্য্যে মানবের মনোবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য না হয়, তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কখন হইতে পারে না। জীবহিংসা ন্যায়ানুগত হইলে তাহার সাধনে হৃদয়ে আঘাত লাগিত না, অনেক আমিষ-ভোজীরাও নিজ হস্তে জীবহত্যা করিতে পারে না। মনুষ্য অভ্যাস-বশতঃ অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য সহজ জ্ঞান করেন বটে, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। অভ্যাসের পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ নির্দ্দয় ভাব কখনই ছিল না। প্রথম জীবহননে তাঁহার হৃদয় অবশ্যই ব্যথা পাইয়াছিল।" আমি কহিলাম, "এসকল যুক্তি আমার মনেও উদয় হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে কেবল আহারের জন্যই জীবহিংসা করি, এমত নহে, আমরা কত বিষয়ে প্রাণিধ্বংসে লিপ্ত রহিয়াছি। এই যে একখানি পট্টবস্ত্র আপনি পরিয়া রহিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখুন কতশত প্রাণি-হত্যাতেই এই বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। কত জীবকে কষ্ট দিয়া আমাদের আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। কার্পাস ও উদ্ভিজ্জ-বর্জ্জিত দেশে হিংসা না করিলে আহার ও গাত্রাবরণ কিরূপে সম্পন্ন হইবে?" তিনি এসকল বিষয়ের যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহা আমার বিবেচনায় বিশেষ সবল বোধ হইল না। যাহা হউক, যদিও স্বতঃপরতঃ এ বিষয়ের মনঃপূত মীমাংসা হইয়া উঠিল না, ও অন্যের বাটীতে যাইলে আহারের অসুগম হইতে লাগিল, তথাপি আমি নিয়ম-ভঙ্গ করিলাম না। এইরূপ পাঁচ বৎসর গত হইলে, আমার পূর্ব্ব-সঞ্চিত অম্লরোগ অতিশয় বৃদ্ধি হইল। কোন ঔষধ-সেবনেও উপকার দর্শিল না। শেষে কালীকে এ বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন যে, "তুমি নিরামিষভোজী থাকিলে তোমার এ রোগের শান্তি হইবে না। যে ডাল আহারে এই রোগ উৎপন্ন হয়, সেই ডালে যে তোমার পীড়ার বৃদ্ধি হইবে না, ইহা কিরূপে আশা করা যাইতে পারে?" তাঁহার কথা শুনিয়া ও নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া পুনর্ম্মৃষিক হইলাম।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে মহারাজা, পরে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি সাহ আলম বাদসাহের নিকট হইতে লন। তাঁহার পুত্র শিবচন্দ্রকে

মুরসিদাবাদের নবাব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি দেন, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা প্রদেশের কয়েকজন সুবর্ণবণিক ও সামান্য বংশোদ্ভূত ধনবানকে রাজোপাধি দেওয়াতে শিবচন্দ্রের পুত্র ও পৌত্র কোম্পানির নিকট হইতে উপাধি লইলে সম্মান বাড়িবে না, বরং হ্রাস হইবে ভাবিয়া উপাধি গ্রহণ করেন নাই। রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁহাদের অপেক্ষা বিচক্ষণ ছিলেন। সুতরাং তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে পূর্ব্বপুরুষের উপাধি পাইবার অভিলাষী হইলেন। এই বিষয়ের সমস্ত উদ্যোগের ভার আমাকে দিলেন। আমি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া যথোচিত উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে শ্রীশচন্দ্র মহারাজা উপাধি ও তদুপযুক্ত সম্মানসূচক পরিচ্ছদ পাইলেন। ইহার কিছু-দিন পরে রাজা আমাকে তাঁহার দেওয়ানী পদে অভিষেক করিলেন। ইহাতে আমার ভার বা বেতন বৃদ্ধি হইল না, কেবল মান বৃদ্ধি হইল, এবং এক সম্মানসূচক বস্ত্র লাভ করা গেল। কয়েক মাস পরে আমার বেতন ৩০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা হইল।

দেওয়ানীপদ-প্রাপ্তি

রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত প্রথমে যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল। তিনি প্রথমে বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া কোন কৌশলে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন সুবিজ্ঞ সুহৃদ্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় প্রীত্যর্থে তাঁহাকে লইয়া বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র লাহিড়ী, তারিণীচরণ রায়, বামাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি কৃষ্ণনগরের দেড় ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইলাম। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় আমাদের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অনুকূল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত

আনন্দবাগে বনভোজন

হইলেন, কিন্তু কার্য্যকালে সকলেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পরে কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহে এ বিষয়ের জন্য একটি সভা হইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ কলেজের ও স্কুলের ছাত্র।

বিধবাবিবাহ

যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোন হিংস্রক ও দুরাচারী আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং মাথাটি দেখিলেই বোধ হয়, যেন তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে রটনা করিল যে, কোন ব্যক্তির এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরের কোন স্থানে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্য এই গোহত্যাটি হইয়াছে। নগরমধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কলেজে বিধবাবিবাহের জন্য সভা হওয়াতে যেসকল আমলা মোক্তার প্রভৃতি বেশ্যাসক্ত ও প্রবঞ্চনা-ব্যবসায়ী "এককালে ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল" বলিয়া চীৎকারধ্বনি করিতেছিলেন, তাঁহারা এই গো-বৎস সংক্রান্ত জনরব শুনিলেন, এবং এই বিষয় তাঁহাদের অভিসন্ধি যতদূর অনুকূল হইতে পারে, তাহা করিয়া লইলেন। কয়েক দিবসের পর গোয়াড়ীতে এই প্রবাদ উঠিল যে, রামতনু লাহিড়ী ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরস্থ আর কয়েক ব্যক্তি, কলেজে গো-হত্যা করিয়া ভোজন করিয়াছে। কৃষ্ণনগরে অতি জঘন্য কয়েক ব্যক্তি যাঁহাদিগকে আমরা ঘৃণা করিতাম, তাঁহারা এই সুযোগে গোয়াড়ীতে লোকের সহযোগী হইলেন ; এবং বীরনগরের (উলার) বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় এই দলের অধিপতি হইলেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পক্ষ হইলেন। অবশেষে কৃষ্ণনগরে প্রকাণ্ড দলাদলী উপস্থিত হইল। আমাদের দূরস্থ আত্মীয়-কুটুম্বগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল।

এইরূপ গোলযোগের সময় রাজা একদিবস বহু স্নেহপূর্ব্বক

আমাকে কহিলেন যে, "বাপু! তোমার নিন্দাতে আমার নিন্দা হয়। অতএব তাহা নিবারণের নিমিত্ত কিছুদিনের জন্য প্রত্যহ একটি শিব পূজা কর, এবং প্রতিবর্ষে একখানি জগদ্ধাত্রী পূজা করিতে থাক। জগদ্ধাত্রী পূজায় যে চারি পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইবে, তাহা আমি দিব।" আমি উত্তর করিলাম, "আমি একাহার ও হবিষ্যান্ন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু সাকার উপাসনায় আর প্রবৃত্ত হইতে পারি না।" তিনি আমার উত্তরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন যে, "আমার দেওয়ানের নিন্দায় আমার নিন্দা হয়, এ বিষয় তোমার বিবেচনা করিতে হইবে।" আমি এ কথার উত্তর করিলাম যে, "আমার দ্বারা যদি আপনার ক্ষতি বোধ হয়, তবে তাহার উপায় আপনি অনায়াসেই করিতে পারেন।" রাজা আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না। রাজা ও রাজকুটুম্বগণ আমাদের স্বপক্ষ থাকাতে, আমাদের কোনও বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইল না। কিন্তু এই গোলযোগে আপাততঃ বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার সকল উদ্যোগ স্থগিত হইল।

সাধারণ বাজেয়াপ্ত লাখেরাজের রাজস্ব-হ্রাসের উদ্যোগ

এইসকল ঘটনার কিয়ৎকাল পরে রাজা ও আমি এক মহদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই জেলার প্রায় সমস্ত লাখেরাজ, গভর্ণমেণ্টের বিচারে অসিদ্ধ স্থির হইয়া, তাহার উপর রাজকর স্থাপিত হয়; এবং লাখেরাজভোগীরা এই নিয়মে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লন যে, ভূমির বাৎসরিক খাজনার অর্দ্ধাংশ গভর্ণমেণ্টকে দিবেন, এবং বাকী অর্দ্ধাংশ আপনারা পাইবেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা এইসকল ভূমি এত উচ্চ নিরিখে বন্দোবস্ত করিলেন যে, লাখেরাজদারের নিজাংশ পাওয়া দূরে থাকুক গভর্ণমেণ্টের রাজস্বেরও সংস্থান হইয়া উঠে না। সুতরাং অনেক নির্ধন বন্দোবস্তকারীরা বহুপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপে চারিশত নম্বর লাখেরাজ নীলাম হইয়া গেল। অন্য ক্রেতা উপস্থিত না হওয়াতে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইসকল ক্রীত হইল। আর যাঁহারা বহু কষ্টে রাজস্ব দিয়া আপনাদের ভূমি এ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা আর রাখিতে

পারেন না, এমনই হইয়া উঠিল। কত শত পরিবার মধ্যে হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এই সময় আমি কলিকাতার কোন কোন বিজ্ঞ আত্মীয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এইসকল দুঃখের বিবরণ গভর্ণমেণ্টে বিদিত করা স্থির করিলাম, এবং প্রত্যাগমন কবিয়া এই সঙ্কল্প মহারাজাকে জানাইলাম। তিনি অতি আগ্রহসহকারে এই বিষয় সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বহু লাখেরাজ বন্দোবস্তকাবীর স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র গভর্ণমেণ্ট সমীপে 'প্রেরিত হইল। পরিশেষে বহু আয়াসে কমিশনব কর্ত্তৃক অবধারিত কর-কমিয়া গেল; এবং পূর্ব্বগৃহীত অন্যায্য কর বন্দোবস্তকারীদিগকে প্রত্যর্পণ কবিবার আদেশ হইল। রাজার পুনর্বন্দোবস্তে পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত রাজস্বেব তৃতীয়াংশ ন্যূন হইয়া গেল, এবং প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা গভর্ণমেণ্ট হইতে ফেরত পাওয়া যাইল। এই মহৎ কার্য্যে রাজার বিস্তর শ্রম ও ব্যয় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এ বিষয়েব উদ্দীপক ও উদ্যোগী না হইলে ইহা উত্থাপিত হইত কি না, তাহা সন্দেহস্থল ছিল। আমি এই কার্য্যেব মূলস্থাপক ছিলাম ও কত যুক্তি ও ভরসা দিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করি ইহা কেবল তিনিই জানিতেন। এ কার্য্য যে সিদ্ধ হইবে, ইহা তাঁহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। আমি এ বিষয়ের শুদ্ধ উদ্ভাবক ছিলাম, আর কিছুই করি নাই, এমতও নহে। আমি বৎসরাবধি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় থাকিয়া এ বিষয়ের মন্ত্রণা ও উৎসাহ দিয়াছি,—এবং মোক্তারের কার্য্য ব্যতীত আর সকল কার্য্যই করিয়াছি।

ও বাজা শ্রীশচন্দ্র কর্ত্তৃক তাহাব প্রতীকাব

পূর্ব্বকালে সম্ভ্রান্ত পরিবারগণ নগরে বা রাজবাটীর নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা করিতেন না। যে স্থানের নিজের স্বাধীনতা থাকে, প্রতিবাসীদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব থাকে, এবং প্রয়োজনমতে কুটুম্বদিগের বাসোপযোগী স্থান হইতে পারে, এমনই স্থান বাসের জন্য স্থির করিতেন। মাটিয়ারী ত্যাগ করিয়া রাজারা যখন কৃষ্ণনগরে রাজধানী করেন, সে সময় আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ রামরাম চক্রবর্ত্তীকে বারুইহুদা গ্রামে

প্রাচীন সম্ভ্রান্ত-দিগের বাসস্থান নির্ব্বাচন

তাঁহার বাসের জন্য একশত বিঘা ভূমি নিষ্করব্রূপে দেন। এইস্থানে তৎকালে নানাবিধ ফল-পুষ্পের উদ্যান ছিল। এই উদ্যানেব একাংশে রামরাম আপনার বাটী প্রস্তুত করেন, দ্বিতীয় অংশ পরিচারকের বাসের নিমিত্ত দেন, ও কতকাংশ প্রজা-পত্তন করেন। পূর্ব্বকার বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে অদ্যাপি দুই একটি আছে। রাজবাটীর গড়ের উত্তরে আমাদের আর একটি বাটী ছিল। পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যাঁহারা রাজবাটীতে কার্য্য করিতেন, তাঁহারা এই বাটীতে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহাদের পরিবারেরা বারুইহুদার বাটীতেই অবস্থান করিতেন। এ বাটীটি দেওয়ান চক্রবর্ত্তীব বাসাবাটী বলিয়া খ্যাত ছিল। তাঁহাদের ধন যথেষ্ট ছিল, অথচ অভাব অধিক ছিল না। চিকিৎসাব জন্য একজন বৈদ্য নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিদ্যাশিক্ষাব নিমিত্ত একজন গুরুমহাশয় বা ওস্তাদ বাটীতে অবস্থিত হইতেন। চাল, ডাল, তৈল, তরকারী, প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই গৃহে সঞ্চিত থাকিত, কেবল মৎস্য কখন কখন বাজাব হইতে আনিতে হইত। অনেক কুটুম্ব-সাক্ষাৎ বাটীতে থাকিতেন ও নানাদেশীয় অতিথিবা আগমন করিতেন। প্রথমোক্তদিগেব সহিত সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করিতেন, এবং শেষোক্তদিগের সহিত কথোপকথন কবিয়া নানা স্থানের রীতিনীতি জ্ঞাত হইয়া আপ্যায়িত হইতেন। সুতরাং সাংসাবিক বা মানসিক কোন বিষয়ে তাঁহাদের কোন অসুখ বা অসুগম হইত না। বরং সততই সুখে কাল যাপন করিতেন।

সেকালের চিকিৎসা-প্রণালী

ইদানীন্তন যুবকগণের মধ্যে অনেকের মনে হইতে পারে যে, মূর্খ বৈদ্যদিগের দ্বারা কিরূপে রোগী রক্ষা পাইত, বা উত্তম শিক্ষক অভাবে কি প্রকারেই বা শিক্ষা হইত। আমি পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি যে, সেকালে এ দেশে সুচিকিৎসকের অভাবে ও চিকিৎসার দোষে রোগীর অতীব কষ্ট হইত। কিন্তু ইদানীং যে পরিমাণে মৃত্যু হইতেছে, সেকালে সে পরিমাণে হইত না। সে সময় বৈদ্য ব্যতীত আর যে দুইপ্রকার চমৎকার ভিষক ছিল, তাহাদের দ্বারাই রোগের প্রকৃত চিকিৎসা হইত, বৈদ্যেরা কেবল তাহাদের সাহায্য করিতেন; এই দুই চিকিৎসক, এই দেশের স্বাস্থ্যকর

জল ও বায়ু ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই দুই চিকিৎসকের অভাবেই আমাদের দেশ উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে; একালে ওলাউঠা, উদরাময়, অম্ল, বায়ু, হাঁপকাশ, বহুমূত্র প্রভৃতি পীড়ার যেরূপ প্রাবল্য হইয়াছে, সেরূপ সেকালে ছিল না। কেবল জ্বর রোগই প্রবল ছিল। তাহাও এক্ষণ অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে হইত। প্রতি বৎসরের কার্ত্তিক-মাসে জ্বরের বিক্রম বাড়িত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রথমে কয়েকদিন রোগী অনশনে থাকিয়া স্বভাবের উপর নির্ভর করিত, এবং যদি ৪।৫ দিনের মধ্যে রোগের শান্তি না হইত, তবেই চিকিৎসার প্রয়োজন হইত। কিন্তু জল ও বায়ুব এমনই গুণ ছিল যে, প্রায় রোগীই বিনা ঔষধে অথবা সামান্য ভেষজে অষ্টাহ মধ্যেই নীরোগী হইত। একারণ সুচিকিৎসকের অভাবেও কর্ত্তাদেব বড় অসুগম হইত না। কৃষিজীবী বা শ্রমজীবীরা জ্বরাক্রান্ত হইলে, প্রায়ই ঔষধ সেবন বা উপবাসও করিত না।

আমার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সাহস ও শক্তি

তদানীন্তন লোকের আহারের পরিমাণ, পরিপাক শক্তি এবং বলের বিষয় শুনিলে ইদানীন্তন যুবকেরা বিস্ময়াপন্ন হইবেন। আমার পিতাঠাকুর যৌবনাবস্থায় কখন কখন প্রাতে পাঁচ সের কাঁচা দুগ্ধ, মধ্যাহ্নে ও বাত্রিতে অন্নের সঙ্গে চারি সের পক্ক দুগ্ধ ও এক পোয়া ঘৃত পান করিতেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ও ঐরূপ অপর্য্যাপ্ত আহার ও পান করিতেন। ঘৃতপক্ক পিষ্টকে তাঁহার কখন তৃপ্তি হইত না। তিনি কহিতেন যে, "ইহা চর্ব্বণ করিতে করিতে বিরক্তি বোধ হয়, সুতরাং ক্ষুধা থাকিতেও আহারে নিবৃত্ত হইতে হয়।" পিতৃদেবের এরূপ বল ছিল যে, একদা বলিদানের জন্য আনীত একটা বলবান দুরন্ত মহিষকে উৎসর্গের সময় বাম হস্তে তাহার শৃঙ্গ ধরিয়া রাখেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় একদিন কোন কারণে এক অত্যন্ত বলবান লাঠিয়ালের প্রতি বাম হস্তে এক কাষ্ঠ-পাদুকা নিক্ষেপ করাতে সে মূর্চ্ছাপন্ন হয়, এবং মাসাধিক ব্যথিত থাকে। তৎকালীন ভদ্র ও অভদ্র লোকের মধ্যে এরূপ বলশালী অনেক লোক দৃষ্ট হইত। তাঁহারা যেমন অধিক পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন, তেমনই

অকষ্টে অনশনে থাকিতেন। আমার পিতা ও পিতৃব্যদের তুই দিবসের উপবাসে কোন ক্লেশ বোধ হইত না।

ইদানীন্তন বাঙ্গালীকে দেখিয়া সকলেই অনুমান করেন যে, এ জাতি কখনই বলবান ও সাহসী ছিল না। মেকলে সাহেব লিখিয়াছেন যে, "ইহারা এতই ভীরু যে, কোম্পানির সৈন্যমধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই।" তাঁহার এ কথাটি নিতান্ত অমূলক ও ভ্রমসঙ্কুল। তিনি যে কালে ভারতবর্ষে ছিলেন, সে কালের বাঙ্গালীগণ বীর্য্যহীন বা সাহসবিহীন ছিল না। ভদ্রাভদ্র উভয় শ্রেণীর মধ্যে বহু বলীয়ান ও সাহসী পুরুষ ছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নবাব সিরাজদ্দৌলার সময় আপন আপন জমীদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার জমীদারদিগের প্রতি অর্পিত ছিল। নবদ্বীপের রাজাদের সম্রাট-দত্ত ফরমানে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই ভার-নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদের সৈন্য রাখিতে হইত, এবং ঐ সৈন্যমধ্যে অনেক বঙ্গীয় যোদ্ধা থাকিত। তাহারা গদাযুদ্ধে, ধনুর্বিদ্যায়, অসিচর্ম্মব্যবহারে, এবং বর্শা-চালনায় অতি সুনিপুণ ছিল। এই নবদ্বীপের রাজাদের সৈন্যের সেনানী পদে হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়জাতীয় লোকেই নিযুক্ত থাকিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় আমার প্রপিতামহ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে নবাবসৈন্য-মধ্যে মাণিকচাঁদ ও মোহনলাল প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী সেনাপতি ছিলেন। সে কালের জমীদারদিগের মধ্যেও অনেকে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে রামচন্দ্র ও রঘুরাম রায় বীরপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। জমীদার-পুত্রগণ তদানীন্তন রীত্যনুসারে যুদ্ধবিদ্যা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া শিখিতেন। শুনিয়াছি, কুমার শিবচন্দ্র বন্দুক অভ্যাস করেন নাই বলিয়া তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকদিন তাঁহার মুখ দেখেন নাই। আমাদের বাল্যাবস্থায় যখন জমীদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ হইত, তখন তাঁহাদের সংসারে অনেক লাঠিয়াল ও শড়কীবরদার থাকিত। তাহারা পশ্চিমদেশীয় যোদ্ধা অপেক্ষা বলে বা সাহসে কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। তবে তাহারা কোম্পানির সৈন্যভুক্ত হইত না;

বাঙ্গালীর রণপ্রিয়তা

তাহার বিশেষ কারণ ছিল। প্রথম, তাহারা বড় রণপ্রিয় ছিল না। দ্বিতীয়, তাহাদের বাটীতেই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় থাকাতে, তাহারা বিদেশে যাইবার ইচ্ছা কবিত না। আর ইহাও আশ্চর্য্য নহে যে, যাহারা স্বদেশে ও পরিবারের মধ্যে থাকিয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারা অল্প ধনাশায় পবের অধীন হইয়া বিদেশে কেন যাইবে ? এই কারণেই এ দেশের লেখনী ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ী লোক গৃহত্যাগ করিতে চাহে না। যখন কৃষিকার্য্য জানিত না, তখন সকলেই ভ্রমণকারী ও অস্ত্রধারী ছিল। কিন্তু যখন কৃষিকার্য্যের ফলভোগ করিতে শিক্ষা করিল, তখন গৃহীও হলধারী হইল। অতএব সাহসেব অভাবে যে বঙ্গীয় ছোটলোকেরা সৈন্যভুক্ত হয় নাই, তাহা বিবেচনা করা অন্যায়। আমি অনেক বৎসর হইতে ভাবিতেছিলাম যে, দেশীয় সৈন্য ব্যতীত কোন দেশই বহুকাল স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যখন বাঙ্গালা দেশ স্বাধীন ছিল, তখন ইহা অবশ্যই স্বদেশীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইত। আমাদেব এমন উর্ব্বব দেশ যে পার্শ্বস্থ রাজারা অধিকার করিবাব চেষ্টা কবিতেন না, ইহা কখনই সম্ভব নহে ; এবং বঙ্গীয় রাজারা যে কেবল বিদেশীয় সৈন্যদ্বারা স্ব স্ব বাজ্য রক্ষা করিতেন, ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইংরাজেরা ত বলিতেই পারেন, আমাদের দেশস্থ অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বলিতেন যে, বাঙ্গালী কখন সৈন্যব্যবসায়ী ছিল না। আমি কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে তর্ক কবিতাম ; কিন্তু কোন প্রমাণ দর্শাইতে না পারিয়া বিলক্ষণ ক্ষোভ পাইতাম। ইদানীং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গীয় ইতিহাস ও বঙ্গদর্শনের বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রবন্ধ পাঠ করাতে, আমাব সে ক্ষোভ দূবীভূত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসে ও এ প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণসহিত বিবৃত হইয়াছে যে, রঘুবংশের রাজত্বকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের অনেক নরপতি ও জমীদাব ভূয়োভূয়ঃ যুদ্ধে জয়ী হইয়া কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপন কবিয়া গিয়াছেন। কেহ কাম্বোজ, কেহ সিংহল প্রভৃতি অতি দূরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। কেহ বা দিগ্বিজয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সম্রাট আকবরের সময়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি অনেক রাজা ও জমীদার বিনাযুদ্ধে রাজ্যত্যাগ করেন নাই।

আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সময় শিক্ষাপ্রণালী অতি জঘন্য ছিল; এবং জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কোন শিক্ষাই হইত না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিষয়কার্য্য পরিচালনের শিক্ষালাভ হইলেই, তৎকালীন লোকেরা শিক্ষার ফল হইল মনে করিতেন। কিন্তু সে কারণে তাঁহাদের সুখের অভাব হইত না। একালে জ্ঞানলাভ করিয়া শিক্ষিত যুবকদের যেরূপ আচরণ হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা যে তাঁহাদের ব্যবহার অতি দূষণীয় ছিল, এরূপ নহে। ইঁহারা যেসকল কর্ম্মকে বিশেষ পাপজনক বলেন, তাঁহারা সেসকল কর্ম্মকে সেরূপ পাপজনক বলিতেন না। একারণ ইঁহাদের মধ্যে অনেকে লোক-নিন্দা-ভয়ে যেসকল কার্য্য অতি গোপনে করেন, তাঁহারা সেসকল কার্য্য প্রকাশ্যরূপে করিতেন। ইঁহাদের যেমন সত্যে অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়দোষে বিরাগ আছে, তাঁহাদেরও তেমনই মাতৃ-পিতৃ-ভক্তিতে অনুরাগ ও সুরাপানে বিরাগ ছিল। ইঁহাদের কতকগুলি মহৎ গুণ তাঁহাদের ছিল না, আবার তাঁহাদের কতকগুলি মহৎ গুণ ইঁহাদের নাই। তবেই তাঁহারা যে শিক্ষাভাবে একেবারে প্রেত হইয়াছিলেন, আর ইঁহারা যে শিক্ষালাভে দেবতা হইয়াছেন, তাহা নহে। ইঁহাদের মধ্যে যেমন দেব ও প্রেতের ন্যায় উভয় প্রকারেরই লোক আছেন, তেমনই তাঁহাদের মধ্যেও ছিল। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহাদের ও ইঁহাদের মধ্যে হরে-দরে হাঁটুজলই দৃষ্ট হইবে।

প্রাচীনদিগের আচার-ব্যবহার

পূর্ব্বকার যেসকল মহাত্মাকে আমরা দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি এমন জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ছিলেন যে, তাঁহাদের জীবনের কোনও কোনও ঘটনা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। নবদ্বীপের রাজা শিবচন্দ্রের দৌহিত্র হরিপ্রসন্ন রায় ও নন্দপ্রসন্ন রায় কৃষ্ণনগরে দেউলিয়ায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে লোকে সচরাচর বড় লালা ও নূতন লালা কহিত। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও দোষ কখন কেহ দেখেন নাই ও শুনেন নাই, পরন্তু সকলেই তাঁহাদের গুণের কথা কীর্ত্তন করিতেন। বড় লালা কখন কখন রাজবাটীতে এক নির্জ্জন গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন। তাঁহার

জিতেন্দ্রিয়তা পরীক্ষার জন্য তাঁহার কোনও কোনও আত্মীয় এক রাত্রিতে তাঁহার শয়নকক্ষে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী গণিকা পাঠান। রজনী তখন দ্বিপ্রহর। লালাজী কামিনীকে দেখিবামাত্র শশব্যস্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত রাত্রিতে আমার নিকট কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?" বারাঙ্গনা হাব ভাব কটাক্ষ করিয়া আপনার মানস জানাইল, পরিশেষে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। "তুমি পরস্ত্রী, তুমি আমাকে স্পর্শ করিলেও তোমার ও আমার পাপ হইবে," এই বলিয়া গৃহের বাহির হইলেন এবং নিজ ভৃত্যকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয়, তেমনই সত্যবাদী ও দয়াশীল ছিলেন। তাঁহার অনুজ নূতন লালাজীরও ঐরূপ ইন্দ্রিয়শাসন, সত্যনিষ্ঠা ও বদান্যতা ছিল। একদিন তাঁহার জনৈক প্রতিবাসী কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে আপনার মাতৃবিয়োগের সংবাদ জানাইল। দুই তিন মাস পরে সেই ব্যক্তি তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে দশটি টাকা দিয়া কহিলেন, "তুমি যখন তোমার মাতার মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলে, তখন আমার হস্তে টাকা ছিল না; কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, তোমাকে কিছু দিব। কল্য তালুক হইতে টাকা আসাতে আমার সেই বিষয় স্মরণ হইল।" তাঁহার ও তদীয় অগ্রজের এইরূপ কথা অনেক শুনিয়াছি।

পূর্ব্বপুরুষদিগের সদ্‌গুণ

আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এইসকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে, তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী ছিলেন যে, কখনও কাহাকে তুই বলেন নাই। এমন দানশীল ছিলেন যে, সাধ্যাতীত না হইলে কখনও কোন যাচককে নিরাশ করেন নাই। পরস্ত্রী অভিলাষ, বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। শত্রু-মিত্র-সমান জ্ঞান, এই দুর্লভ ধর্ম্ম কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি। যেসকল হিংস্রক জ্ঞাতিরা তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও কখন একটি কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই, এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহপ্রকাশে কখনও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য

করিয়াছেন, তাঁহাদের পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তাঁহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন, এবং পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন। তাঁহার উদার স্বভাবের দুইটি দৃষ্টান্ত আমার সন্তানদের জন্য লিখিতেছি। তিনি প্রতিবেশী কায়স্থজাতীয় অতি দুর্দ্দশাপন্ন একটি যুবাকে আমাদের রাজবাটীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে সে রাজার প্রিয় খানসামা হইয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে। একদা আমাদের কয়েক বিঘা ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে, আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন যুবক তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানে উদ্যত হন। খানসামা জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিছুদিন পরেই ঐ দুরাচারী কৃতঘ্ন কোন সুযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা ভূমি অধিকার করিবার জন্য এক মিথ্যা মোকদ্দমা উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে তাহার বাটীতে হঠাৎ ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন চৌকী-দারকে তস্কর-দলে দেখিয়াছে, এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্ত্তারা অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়া দারোগার নিকট কহিল যে, তাঁহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং দারোগা এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। মাজিষ্ট্রেটের পেস্‌কার কর্ত্তাদিগকে কহিয়া পাঠাইলেন যে, "যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই তাহারা ছয় মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে পারে।" তাহারা সমুচিত দণ্ড পায়, ইহা সকলেরই ইচ্ছা হইল, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া কহিলেন, "আমরা বিপদমুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এ নির্ব্বোধদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে?" এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই।

এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরিচারক ব্রাহ্মণ তদীয় শয্যায় শয়ন

করিয়া ঘোর নিদ্রা যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাঁহার জলপানের আয়োজন কবিয়া দিত, এবং তাঁহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জ্যেষ্ঠতাত ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পূর্ব্বেও আমার শয্যায় নিদ্রিত হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোন অসুখ জন্মিয়াছে। কিঞ্চিৎকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দুইখানি কুশাসনের উপর শয়ন করিলেন। গাত্রে যে বস্ত্র ছিল, তাহাই তাঁহাব শীতনিবারণের উপায় মাত্র হইল। নূতন সংবাদে রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন প্রভাতকালে এ বিষয় তাঁহার গোচর কবিল। রাজা এই আশ্চর্য্যাবস্থার দর্শনোৎস্থক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাতের সন্নিহিত হইলেন। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। রাজার আগমনে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হওয়াতে, জাগরিত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা ঈষৎ হাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার শয্যায় পবিচাবক স্থখে শয়ন করিয়াছিল, আর তুমি এই কুশাসনে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি ?" তিনি উত্তর কবিলেন যে, "আমার কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অসুখ হইয়া থাকে, তবে উহাব কষ্ট হইত।" তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলকে কহিলেন যে, যদি সংসারে কেহ ধার্ম্মিক থাকেন, তবে তিনিই এই ব্যক্তি। তাঁহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার সাত-আটটি পুত্র অকালে কালকবলিত হয়, তথাপি তাঁহার বদনে কেহ ক্ষণকালের নিমিত্ত শোকচিহ্ন দেখেন নাই। প্রত্যেক পুত্রবিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন। এবং তাহার পব অধৈর্য্য পরিবারগণের শোকশান্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার কোমল হৃদয় চিরশত্রুর দুঃখে কাতর হইত, তাঁহার চিত্তকে যে জীবনাধিক পুত্রশোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ইনি অতি সরলস্বভাব ছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধিহীন ও বিদ্যাহীন ছিলেন না। পারস্য ভাষা স্থন্দররূপ জানিতেন, এবং রাজবাটীর সর্ব্বাধিকারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকার্য্যে যশস্বী হইয়াছিলেন।

ভৃত্য-বাৎসল্য

পুত্রগণ! তোমাদের বংশে কি মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, বোধ হয়

তাহা তোমরা জান না। তাঁহার মাহাত্ম্যের বিষয় পাঠ করিলে যদি কাহারও আনন্দ না হয়, তোমাদের অবশ্যই হইবে। তিনি বেকন, লক্, ষ্টুয়ার্ট, রিড্ প্রভৃতি পণ্ডিতদের নামও শুনেন নাই ; এবং বাইবেলের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন নাই, তথাপি কত বড় মহাত্মা হইয়াছিলেন। তোমাদের পিতা তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়াছেন, তাঁহার পদধূলি লইয়াছেন, এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ও চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু প্রায় কিছুই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঈশ্বর-ভক্তি, শত্রু-মিত্র-সমান-জ্ঞান, পরোপকার, স্বজন পালন, ইন্দ্রিয় শাসন, অতিথিসৎকার, দয়া-দাক্ষিণ্য, অহিংসা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও ক্রোধ-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ তাঁহাতে অপর্য্যাপ্ত ছিল। তোমরা যদি এইসকল মহাধনের কিয়দংশের অধিকারী হইতে পার, তাহা হইলে তোমাদের শিক্ষা সার্থক। তোমাদের পিতা বহু কষ্ট পাইয়া তোমাদের শিক্ষার জন্য যে ধন ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও সার্থক, এবং তোমাদের জীবন সার্থক হইবে। কৃষ্ণনগরের মাঝেরপাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুত্র, যে এক পূজার কোঠা প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখের ভূমির অধিকারী অন্য একজন ছিলেন। সেই ভূমিখণ্ড না পাইলে তাঁহাদের পূজার কোঠা অকর্ম্মণ্য হয় বলিয়া, ঐ পুত্র তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। এই অন্যায় অধিকার রহিত করিবার নিমিত্ত এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদন্ত জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থী কহিলেন যে, "যদি প্রত্যর্থী আপনার সাক্ষাতে সুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি তাঁহার, তাহা হইলে আর আমি ঐ ভূমির দাবী রাখি না।" নসীরামের পুত্র, পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে, তাঁহাকে বাটীর মধ্যে রাখিয়াছিলেন। বিচার-পতির আদেশে তাঁহাকে তদন্ত স্থানে আসিতে হইল। বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, তিনি অতি ক্রোধভরে উত্তর করিলেন যে, "উহাকে (পুত্রকে) আমি ঐ ভূমি অধিকার করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্ষ্মীছাড়া আমার কথা শুনে নাই। ঐ ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই।"

সেকালে সমাজের যেরূপ আচার-ব্যবহার ছিল, তাহাতে

বারুইহুদায় সুচিকিৎসক, সুশিক্ষক ও বাজার অভাবে পূর্ব্বপুরুষদিগের কোন কষ্ট বোধ হইত না। তাঁহারা পুত্র, পৌত্র, জামাতা, দৌহিত্র এবং কুটুম্বসাক্ষাৎ লইয়া সর্ব্বদাই সুখে থাকিতেন। আমার যখন জ্ঞান হইয়াছে, তখন কর্ত্তাদের অবস্থা পূর্ব্বমত উন্নত না থাকুক, তথাপি আমরা যাহা দেখিয়াছি তাহা মনে পড়িলেও হৃদয়ে আনন্দ উদয় হয়।

প্রভু ও ভৃত্য

আর একটি বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সুখ ছিল। ইংরেজি শিক্ষার বা ব্যবহারের প্রভাবে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা মূর্খ শূদ্র প্রতিবাসী, লেখাপড়া ছাড়া অন্য ব্যবসায়ী বা ভৃত্যবর্গের সহিত প্রয়োজন ব্যতীত কোন কথা কহি না, তাহাদিগের প্রতি প্রায় পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা কুক্কুরের বৎসকে আহ্লাদপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিব, কিন্তু ভৃত্যের পুত্রের হস্ত ধরিতে পারিব না। পূর্ব্বকালীন লোকেরা তাহাদিগের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতেন না। তাহারা লেখাপড়া না জানিলেও, ইঁহারা তাহাদিগকে মনুষ্য জ্ঞান করিতেন। কর্ত্তারা অধঃশ্রেণীর প্রতিবেশিদিগকে বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন। বাটী আসিলে তাহাদিগকে পৃথক আসন দিতেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং তাহাদের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন। আপদ্ বিপদ্ কালে তাহাদের তত্ত্ব লইতেন; এবং বাটীর শুভাশুভ সকল কার্য্যে তাহাদিগকে আহার করাইতেন। তাহাবা আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহাকে খুড়া-ঠাকুর, কাহাকে দাদাঠাকুর, কাহাকে মাঠাকুরুণ, কাহাকে দিদিঠাকুরুণ ইত্যাদি সম্পর্ক পাতাইয়া ডাকিত। চাকরেরাও ঐরূপ সম্পর্ক পাতাইত। আমরাও বাল্যাবস্থায় পুরাতন চাকরদিগকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। প্রতিবাসীরাও আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিত।

ভৃত্যেরা পুরুষানুক্রমে প্রভুর বাটীতে কর্ম্ম করিত। আমাদের বাটীতে ক্রমশঃ দুই তিন পুরুষকে চাকুরী করিতে দেখিয়াছি। যদি তাঁহাদের প্রতি কখন পীড়ন হইত, তবে তাহারা কখন ক্রোধ করিয়া আহার করিত না, অথবা দুই তিন দিন আসিত না; কিন্তু কখন এককালে কর্ম্মত্যাগ করিত না। এক্ষণে যেমন বৎসর মধ্যে পুনঃ পুনঃ নূতন দাস-দাসী রাখিতে হয়, সেকালে এ অসুগম প্রায় ঘটিত না।

কর্ত্তারা তাহাদের প্রতি যেমন স্নেহ করিতেন, তাহারাও তেমনি প্রভুভক্তি দেখাইত। এমন কি যদি প্রাণ দিলে প্রভুর মঙ্গল সাধন হইত, তাহাও তাহারা দিতে প্রস্তুত হইত। যখন পিতৃদেবের সহিত আমি তাঁতিয়ার গোলাবাটীতে থাকিতাম, তখন সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট কৃষকেরা আসিয়া রাত্রি ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিত। তিনি তাহাদিগকে নানাবিধ গল্প শুনাইতেন। তাঁহার কথায় তাহারা সাতিশয় সুখী হইত, এবং বাটী যাইয়া পরিবারের মধ্যে সেইসকল কথা বলিত। পূর্ব্বকালের এই সমস্ত সদ্ভাব ও সম্প্রীতির কাহিনী মনে হইলে, বর্ত্তমানাবস্থা বড়ই অসুখের বোধ হইত।

আমার যখন যৌবনাবস্থা হইল, তখন জল-বায়ু, শিক্ষা-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং জল-বায়ু ক্রমশঃ দূষিত হওয়াতে তখন আর পূর্ব্বপ্রকার বৈদ্যদ্বারা রোগ শান্তি হয় না, এবং শিক্ষার নূতন প্রথা হওয়াতে গুরুমহাশয় বা ওস্তাদের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য চলে না। ওলাউঠার সৃষ্টি হইয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে, আহারের নিয়ম স্বতন্ত্র হইয়াছে, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, এমন কি সাংসারিক সকল বিষয়েই একরূপ বিপ্লব ঘটিয়াছে। আর তাহার উপর আমাদের অবস্থাও অতি মন্দ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বারুইহুদায় যথানিয়মে আর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ চিকিৎসার ও শিক্ষার অত্যন্ত অসুগম হইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত পিতৃদেব সহিত বাটীর যেরূপ বিভাগ হইল, তাহাতে আমাদের অংশ অন্য দুই ভাগের মধ্যে পড়াতে আমাদের বাসের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে কেহই ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। বাটীর সন্নিহিত যথেষ্ট বাসোপযোগী ভূমি ছিল, তথাপি তিন অংশীই এক বাটীর মধ্যে থাকিয়া কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন। একজন বাহির হইলেই আর কাহারও অসুবিধা হইত না। বাসস্থানের দোষ-গুণে যে অস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য হয়, তাহা তাঁহাদের অনুভবই ছিল না। ফলতঃ সেই কালের জল-বায়ুর গুণে শরীর সর্ব্বদা সুস্থ থাকাতে এ বিষয়ের চিন্তাই উপস্থিত হইত না। আমি

নূতন বাটী ও বাগান নির্ম্মাণ আরম্ভ

কৃষ্ণনগরে বাসের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম; যে স্থানে বাটীর অব্যবহিত স্থানে একটু উদ্যান করিবার ভূমি থাকে, অথচ আত্মীয়দিগের পাড়ার মধ্যে হয়, এমনই স্থান আমার অভিলষিত ছিল। কিন্তু সেরূপ স্থান না পাওয়াতে, এক্ষণে যেখানে বাটী আছে, সেই স্থান মনোনীত করিয়া প্রথমে পুষ্করিণীটি খনন, ও পরে একটি দালান বারান্দার সহিত প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু আপাততঃ পরিবার রাখিবার উপযুক্ত বাটী প্রস্তুত করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ ফল-পুষ্পের বৃক্ষ রোপণ করিলাম।

আমার বাগান ও বৈঠকখানা

আমার যৌবনের প্রারম্ভ হইতে একটি মনোমত উদ্যান করিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছিল। নানা স্থানের উদ্যান দেখিতাম, এই সংক্রান্ত বিবিধ পুস্তক পড়িতাম, এবং মনোমধ্যে ইহার বহুবিধ কল্পনা করিতাম। অন্যের উদ্যান দর্শনেও আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। এতাদৃশ আনন্দ আমার আর কোন বস্তু দেখিলে হইত না। প্রথমে আমি বারুইহুদা গ্রামে একটি ফল-পুষ্পের উদ্যান করিতে প্রবৃত্ত হই। ডচ্ প্রণালীতে পুষ্পকাননের পত্তন করিয়া, তাহাতে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করি। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা মনোমত করিতে পারিলাম না। তথাচ যতদূর হইয়াছিল, তাহা দর্শনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এবং বৈকালে সকল আত্মীয় যাইয়া তথায় বসিতেন। তথায় যে একখানি কুটীর প্রস্তুত করিয়াছিলাম, অবকাশ পাইলেই আমি তথায় যাইয়া সময় যাপন করিতাম। যখন আমি সেই যৎসামান্য উদ্যানে আমার অকপট বন্ধুবর্গের সহিত বসিয়া থাকিতাম, তখন আমার সুখের সীমা থাকিত না।

কয়েক বৎসর পরে আমি আমার বাটীর উদ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নানা ফল-পুষ্পের বৃক্ষ কিরূপে রোপণ করিতে হয়, কিরূপে তাহার কলম করিতে হয় ও কিরূপে তাহা পোষণ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়সকল শিখিবার নিমিত্ত নানা গ্রন্থ পড়িতাম, ও দেশীয় প্রাজ্ঞ মালিদের নিকট উপদেশ লইতাম, অনেক বিখ্যাত উদ্যান হইতে নানা জাতি আম্র, লিচু প্রভৃতি বিবিধ ফলের কলম, ও নানারূপ পুষ্পের

চারা ও কলম বহু যত্নে সংগ্রহ করিয়া উদ্যানে রোপণ করিলাম। আর এইসকল বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে তৎসমুদায় হইতে নিজে কলম করিয়া কতক রোপণ, কতক বিতরণ এবং কতক বিক্রয় করিতাম। তৎকালে কৃষ্ণনগরের বা তাহার পার্শ্বস্থ কোন গ্রামের মধ্যে দুই তিন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কলমের গাছ দেখিতে পাইতাম না। কৃষ্ণনগরে কোম্পানীর বাগানে যে কয়েকটি আম্রের ও নিচুর কলমের গাছ আছে তাহা ইংরেজের দ্বারা রোপিত হইয়াছিল। এখানকার কোন ব্যক্তির এরূপ চেষ্টা ছিল না, এবং কেহই কলম করিতে জানিত না। আমারই দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় এক্ষণে এখানে অত অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট আম্র কলমের বৃক্ষ প্রস্তুত হইয়াছে। সে যাহা যউক, আমি ধনাভাবে ও গরুর উৎপাতে কি ফলোদ্যান, কি কুসুমোদ্যান বাসনানুরূপ করিতে পারিলাম না। অর্থাৎ আমার সমস্ত উদ্যান প্রাচীর-বেষ্টিত না হওয়াতে ও লোকের গরু যথেচ্ছাক্রমে চরিতে দেওয়াতে, আমার মানস পূর্ণ হইল না।

বাগানে গরুর উৎপাত

নগরস্থ অনেক ভদ্রাভদ্র লোকের গরুর রক্ষক নাই। তাঁহারা আপন আপন গাভী প্রাতে দোহন করিয়া ছাড়িয়া দেন। এইসকল গাভী সমস্ত দিবস অন্য লোকের উদ্যানে, শস্যক্ষেত্র ও বাটীতে চরিয়া গোধূলি কালে স্ব স্ব স্বামীর গৃহে প্রত্যাগমন করে। কেহ কেহ সন্ধ্যার সময়ও দোহন করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন। তাঁহাদের গরুর দ্বারা যে লোকের কত ক্ষতি হয়, তাহা একবারও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। আমার অনেক ভদ্রলোকের সহিত এ বিষয়ে কথা হইয়াছে, কিন্তু এরূপ ক্ষতি করিলে যে অধর্ম্ম হয়, তাহা তাঁহারা মনে করেন না। এরূপ গরু-ছাড়া প্রথা রহিত হইলে যে কত জনের বাটী ফল-পুষ্পের উদ্যান হয়, এবং তাহাতে গৃহস্বামীদের যেমন লাভ হইতে পারে, নগরও তেমনি সুশোভিত হইয়া উঠে, ইহা প্রায় কাহারও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অনেকেই কহেন যে, গরু-ছাড়া প্রথা রহিত হইলে দুগ্ধ অভাবে অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইবে। কিন্তু নিকটস্থ রাঢ় দেশে এ প্রথা

না থাকাতে কোন কষ্ট নাই, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেন না।

আমাদের এ প্রদেশস্থ অনেক লোক ফল ভোগের বা লাভের নিমিত্ত উদ্যান করেন, কিন্তু শোভার নিমিত্ত অত্যল্প লোক ইহা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহা সুখের সামগ্রী বোধ করিয়াও কার্য্যে পরিণত করেন না, এ বিষয়ের অর্থ-ব্যয়কে অনর্থক অনুমান করেন। তাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত বাটী ও শকট ইত্যাদি বিষয়ে বিপুলার্থ ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অর্থও ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন। সামান্য ব্যয়ে তাঁহাদের ও দর্শকদের কত আমোদ হইতে পারে, তাহা একবারও তাঁহাদের চিন্তাপথে আইসে না; অন্যের কুসুম-কানন দর্শনে বিলক্ষণ আমোদিত হন, অথচ স্বয়ং সমর্থ হইলেও ঐরূপ করিবার ইচ্ছা করেন না। বাহিরে স্থানাভাব হইলেও, ইউরোপীয়গণ গৃহাভ্যন্তরে টবে বৃক্ষ রোপণ করিয়া পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করেন। ইহা দেখিয়াও তাঁহাদের মনে এ বিষয়ের বাসনা হয় না। ইহারা যেমন অন্যের সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে শিখিয়া আপনার ও অন্যের সুখসম্পাদনের ইচ্ছা করেন না, তেমনই, অন্যের উদ্যান দর্শনে সুখী হইবেন, কিন্তু স্বয়ং গুটিকতক পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিজের বা পরের সন্তোষ সাধন করিবেন না। পূর্ব্বে দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কেহ কেহ দুই চারিটি পুষ্পবৃক্ষ বাটীতে রোপণ করিতেন, এক্ষণে তাহাও দৃষ্ট হয় না। এ নগরস্থ লোকের মধ্যে বাবু কালীচরণ লাহিড়ীর এ বিষয়ে যথেষ্ট আমোদ আছে, তিনিও আমার মত উদ্যানের জন্য অনেক পরিশ্রম ও যথাসাধ্য ব্যয় করিয়াছেন। অদ্যাপিও তাঁহার এ বিষয়ে অনুরাগ যায় নাই।

বাঙ্গালীর বাগানে বিরাগ

আমি চিরদিন মিতব্যয়িতার পক্ষপাতী। যে দ্রব্য না হইলে চলে, তাহা আমি প্রায় কখনও ক্রয় করি নাই। অথচ বংশমর্য্যাদা মত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছি। আত্মীয়েরা আমার সংসার-চালনার নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেন, এবং অনাত্মীয়েরা আর কিছু ভাবিতেন। যখন আমি

আমার মিতব্যয়িতা

দুইখানি বাগানবাটী ও পুষ্করিণী করি, তখনও আমার বেতন মাসিক ৫০৲ টাকা মাত্র ছিল। বাটী প্রস্তুত করিতে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র আট শত টাকা আনুকূল্য করেন। এবং ঐ কারণে আমার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা পরিশোধের নিমিত্ত পরে মহারাজা সতীশচন্দ্র নয় শত টাকা দেন। কিন্তু এইসকল সম্পন্ন করিতে ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু যতই কেন পরিমিত ব্যয়ী হই না, বংশবৃদ্ধির সহিত ব্যয়ের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, ৫০৲ টাকায় আর কোনমতে চলে না, এরূপ হইয়া উঠিল। রাজাকে পুনঃ পুনঃ জানানতেও কোন ফলোদয় হইল না। এই সময় মুরসিদাবাদে এক কর্ম্মের প্রস্তাব হইল। মনি সাহেব নামক একজন এই জেলার কালেক্টর ছিলেন। তিনি মুরসিদাবাদের জজ হইলে, এখান হইতে দুইজন আমলাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাহার মধ্যে একজনকে আপনার সেরেস্তাদারী পদে নিযুক্ত করেন। সাহেব যেরূপ ভদ্রলোক ছিলেন, সেরেস্তাদার সেরূপ ছিলেন না; এবং সাহেব তাঁহাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতেন, তিনি সেরূপ বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন না। তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, এইরূপ প্রবাদ হওয়াতে, তাঁহাকে অর্থী প্রত্যর্থী যথেষ্ট টাকা দিত। শেষে এইরূপ জনরব হইয়া উঠে যে, সেরেস্তাদারের দ্বারা সাহেব টাকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহেব পরম্পরায় এই জনরবের কথা শুনিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার ডেপুটী কালেক্টর ও শ্যামাচরণ ভট্ট উকিলকে একটি উপযুক্ত ও সৎলোকের অন্বেষণ করিতে বলেন। তাঁহারা এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। এই কর্ম্ম কিছুদিন করিলে জজ সাহেবের অনুগ্রহে মুন্সেফী পদ পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, ইহাও তাঁহারা আমাকে লেখেন। তৎকালে আমার রাজার ও তাঁহার পরিবারের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের স্নেহরজ্জু কিরূপে ছেদন করিব, ইহা ভাবিয়া এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রাজা কলিকাতায় গমন করিলেন। পূর্ণবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি নৌকাতে হঠাৎ রাজাকে এই কর্ম্মের বিষয় কহিলেন। রাজা অত্যন্ত কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "দেওয়ান

সেরেস্তাদারী পদ গ্রহণে অস্বীকার

আমাকে নৌকা সমেত ডুবাইয়া যান।" তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে পূর্ণবাবুর মুখে রাজার কথা শুনিয়া আর এ বিষয় উত্থাপন করিতেও পারিলাম না। জীবন-সতরঞ্চি খেলায় মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করা ও মুন্সেফী পরীক্ষা না দেওয়া যে দুইটি ভুল চাল হইয়াছিল, তাহার উপর আর একটি হইল। আমি পারতপক্ষে কাহারও বাক্যের বা কার্য্যের অভিসন্ধি মন্দভাবে লইতাম না। ইহাতে আমাকে আত্মীয়গণ ভালমানুষ বলিতেন। অর্থাৎ কাহারও চাতুরী আমি বুঝিতে পারিতাম না। ভালমানুষ শব্দটি যত শ্রবণমধুর, ইহার অর্থটি তেমন হৃদয়গ্রাহী নহে। সুতরাং এ প্রশংসাটি কেহ স্বচ্ছন্দচিত্তে লইতে চাহে না। আত্মীয়েরা আমাকে ভালমানুষ কহিলে আমি তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতাম। আমি কহিতাম যে, "যেমন আমি কাহারও ভাল অভিসন্ধি স্থির করিয়া পরে তাহার বিপরীত দেখিতে পাই, তেমনই তোমরাও কাহারও অভিসন্ধিকে মন্দ স্থির করিয়া শেষে তাহার বিপর্য্যয় দেখিতে পাও। এ বিষয়ে আমার যেমন ভুল হইয়া থাকে, তেমনই তোমাদেরও হয়। তবে তোমাদের অপেক্ষা আমার কিছু বেশী ভুল হয় বটে। কিন্তু যখন উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তখন আমার ভ্রান্তিকে নিতান্ত অবোধতা কিরূপে বলিব। আমার ভ্রান্তিতে শেষে লজ্জা পাইতে হয় না। তোমাদের ভ্রান্তিতে তাহা ঘটে।" তর্কে আমার আপাততঃ জয় হইল মনে করিলাম বটে, কিন্তু আমার উপস্থিত অবস্থায় তাহাদেরই কথা ঠিক হইল।

সরল বিশ্বাস

"ভালমানুষ"

মুরসিদাবাদের কর্ম্ম গ্রহণ না করাতে যে বিবেচনার ত্রুটি হইল, তাহা অচিরাৎ বুঝিতে পারিলাম। কয়েক মাস গত হইল, তথাপি বেতন-বৃদ্ধির কোন প্রসঙ্গ হইল না। রাজা বিলক্ষণ সাংসারিক ছিলেন। আমার ভদ্রতায় বা নির্ব্বোধতায় তাঁহার যে লাভ হইত, তাহা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ব্যবহার দর্শনে শেষে অতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে ভাবিলাম যে, "ইহাদের স্নেহ পরিহার করিয়া রাজবাটী ত্যাগ না করিলে আর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব না।"

যে দিন আমি রাজবাটী যাওয়া রহিত করিলাম, সেইদিন রাত্রিতে রাজা, পূর্ণবাবু ও রাজ-জামাতা শ্রীবনের বাটীতে আসিয়া আমাকে ডাকাইলেন, এবং উপস্থিত হইলে কহিলেন যে, "যতই টাকা লাগুক না কেন, আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। কে জানে ৮০৲ টাকা, কে জানে ১০০৲ টাকা।" সে রাত্রিতে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। পরদিন প্রাতে আমি রাজপুত্রের দ্বারা তাঁহার নিকট কহিয়া পাঠাইলাম যে, "ভদ্রের রীত্যনুসারে আমার যেরূপে চলে, সেইরূপ বেতন করিয়া দিলেই আমি থাকিতে পারি।" তিনি জামাতার দ্বারা ইহার এই উত্তর পাঠাইলেন যে, "এ বৎসর তাঁহার পুত্রের উপনয়নের নিমিত্ত ১৫০৲ টাকা দিব, পরে আগামী বৎসরে তাঁহার বেতন ধার্য্য করিব।" এ বৎসরে আর তিন মাসের অধিক নাই; বেতন সহিত মাসিক এক শত টাকা হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। পরবৎসরেও বেতন ধার্য্য না করিয়া আমার বাটী নির্ম্মাণের ব্যয় বলিয়া ৬০০৲ টাকা দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, রাজা পাকা বন্দোবস্ত না করিবার নিমিত্ত এইরূপ কৌশল করিতেছেন। যাহা হউক, আমার মাসিক এক শত টাকা পোষাইবে বলিয়া আমি ইহাতে কোন আপত্তি করিলাম না।

উভয়সঙ্কট

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামমোহন চৌধুরীর প্রতি সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের যে ভার ছিল, তাহা গুরু ভট্টাচার্য্যের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সেই ভার এক স্বজনের হস্তে দেওয়া হইল। এই রাজ-স্বজনের কর্তৃত্বকালে একটি সামান্য গ্রামের পত্তনী লইবার নিমিত্ত, শ্রীগোপাল নামক সরকারের জনৈক আমলার জামাতা প্রার্থী হইলেন। তাঁহার সহিত পত্তনীর জমা ও পণ ধার্য্য হইল। ইতিমধ্যে উক্ত গ্রামবাসী কয়েকজনও আমার নিকট আসিয়া উক্ত পত্তনীর আকাঙ্ক্ষী হইল, এবং অধিক পণ দিতে চাহিল। আমি ইহাদের প্রস্তাব রাজাকে জানাইলাম। পরে উভয় পক্ষ হইতে ডাক হইতে লাগিল, এবং শেষে গ্রামবাসীদের ডাক বলবৎ হইল। কিন্তু রাজা উপরিউক্ত রাজ-স্বজনের সহিত কি পরামর্শ করিয়া কহিলেন যে, তিন দিবসের পর ডাক

রাজ-স্বজনের ধূর্ত্ততা ও অনুতাপ

মঞ্জুর করিবেন। আমি এ বিলম্বের কারণ কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তিন দিন পরে রাজার নিকট এ বিষয় উত্থাপন করাতে তিনি ঐ রাজ-স্বজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেওয়ানকে কি সে বিষয় বলা হয় নাই?" তিনি আমার অগোচরে উত্তর দিবার ইচ্ছা জানাইলেন। রাজা উঠিয়া পৃথক প্রকোষ্ঠে গেলেন। এবং কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া কহিলেন যে, "আর একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।" আমি সাতিশয় বিরক্তভাবে কহিলাম যে, "আপনার ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট ইচ্ছা আমার নাই। তবে এই বিলম্বের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত হইতেছে না কেন, ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারি না। গ্রাহকগণ কয়েকদিন অবধি এখানে কষ্ট পাইতেছে, যদি তাহাদিগকে পত্তনী দেওয়া না হয়, তবে তাহাদিগকে আমি বিদায় করিয়া দেই।" রাজা, "যাহা ধার্য্য হয় কল্য জানিতে পারিবে," এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। আমিও বিষণ্নচিত্তে উঠিয়া আসিলাম। পরদিবস রাজা আমাকে কহিলেন যে, "গ্রামবাসীদিগকে পণের টাকা সহিত আসিতে কহ। তাহাদিগকে পত্তনী দেওয়া স্থির হইয়াছে।" এই পত্তনীতে লাভ ছিল না, বরং ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। গ্রামবাসীরা কেবল সম্মান রক্ষার নিমিত্ত অধিক টাকা ডাকিয়াছিল। অনেক বিষয়ে ডাকের সময় গ্রাহকগণের যে আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, তাহা পরে থাকে না। সুতরাং তাহাদের ডাক মঞ্জুর করিতে বিলম্ব হওয়াতে, তাহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হয়। এক্ষণে তাহারা পত্তনী লইতে অসম্মত হইল, এবং আমার নিকট তাহাদের যে টাকা আমানত ছিল, তাহা তাহারা ফিরিয়া দিতে কহিল। আমি অবধারিত পণের ফিসের পরিমাণ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা ফিরিয়া দিলাম। এই পত্তনী না ঘটাতে, রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন যে, "আমি কথার অন্যথা করিলে আপনারা আমার কতই নিন্দাবাদ করিতেন, কিন্তু তাহাদের সময় কোন দোষ হইল না। আপনি বিজ্ঞ হইয়া তাহাদিগকে এত বিশ্বাস কেন করিলেন?" আমি উত্তর করিলাম, "আমার কোন দোষ নাই, আপনারা ডাক মঞ্জুর কবিতে বিলম্ব করাতেই এ বন্দোবস্ত ঘটিবার ব্যাঘাত হইল। যাহা হউক, আমি ফিসের টাকা

রাখিয়াছি, আমি শুদ্ধ কথায় বিশ্বাস করি নাই।” ইহা শ্রবণে রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া শান্ত হইলেন। ইহার দুই তিন দিন পরে ঐ রাজ-স্বজন সজল-নয়নে আমাকে কহিলেন যে, “লোভে পড়িয়া আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাতে আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা না করিলে আমার এ কষ্ট কোনমতে যাইবে না।” আমি উত্তর করিলাম যে, “তোমাকে আমি ভালবাসি, এবং তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়াছিলাম। যাহা হউক আমার মনে আর বিরক্তি রহিল না, এবং তুমিও আর এজন্য দুঃখিত থাকিও না।” জগতে লোভ কি ভয়ানক পদার্থ! ইনি কেবল আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেন, এরূপ নহে। ইনি এ বিষয়ে আপন প্রভু ও প্রতিপালক রাজার সহিত বিলক্ষণ ধূর্ত্ততা করেন, ও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হন। তদ্‌বিস্তারিত লিখিতে আর ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তাঁহার অনুতাপ অকপট, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। এই সামান্য ঘটনা আমার অনেক মনঃক্লেশের কারণ হয়। সেইজন্য আমার এই বিষয়ের বিবরণ লিখিতে হইল।

রাজ-বিরক্তি ও ষড়যন্ত্র

রাজার সহিত আমার যে সম্প্রীতি ছিল, তাহার বৈষম্য দেখিতে লাগিলাম। তিনি আমার সন্দর্শনে যেরূপ প্রফুল্ল হইতেন, এবং আমার সহিত কথোপকথনে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন, সেরূপ আর ইদানীং দৃষ্ট হইতে লাগিল না। আমি অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইলাম, এবং রাজার এই পরিবর্ত্তিত ভাবের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার চির-সুহৃদ পূর্ণবাবু এ বিষয় রাজার নিকট উত্থাপন করিলে, তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমি সমীপস্থ হইয়া কহিলাম যে, “আমি কয়েক-দিনাবধি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, আপনার অপ্রীতিজনক বা অনিষ্টকর কোন কার্য্য করি নাই। তবে আপনার এরূপ বিরূপ ভাব কেন হইল বুঝিতে পারি না। যদি আমার বিরুদ্ধে কোন কথা হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে পাইলে তাহার উত্তর দিতে পারি।” রাজা উত্তর করিলেন, “আমার যে দায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্দ্ধমানের

রাজারও ঘটিয়াছিল। আমার স্বজন ও তুমি উভয়ই অত্যাজ্য, সুতরাং তোমাদের পরস্পরের অপ্রণয় হওয়াতে আমার মন বড়ই অসুখী আছে।" আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "একি কথা? তাঁহার সঙ্গে আমার ত কোন অসদ্ভাব নাই। যাহা হইয়াছিল, তাহা ত তিনি সে দিন অনুতাপ করাতে গিয়াছে।" এই কথার পর আর কি কি কথা হয়, তাহা আর এক্ষণে স্মরণ হয় না। রাজার কথাতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ধর্ম্ম ব্যতীত রাজবাটীতে আমার পক্ষে কেহই রহিল না, সকলেই রাজ-স্বজনের পক্ষ হইল।

সুন্দরী গায়িকা

এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজবাটীতে একবার একদল যাত্রা আইসে। কৃষ্ণনগরের নীচ-কুলোদ্ভবা একটি বালিকা ঐ দলে ছিল। তাহাব অতি মধুর স্বর ছিল, এবং কয়েকটি হিন্দী গীত সুন্দররূপে গাইতে পাবিত। রাজা তাহাকে যাত্রার দল ছাড়াইয়া রাজবাটীর সঙ্গীত-দলভুক্ত করিলেন। যে দিন রাজবাটীতে আত্মীয়-স্বজনের নিমন্ত্রণ হইত, সেদিন সে আমাদের নিকট বসিয়া গীত গাইত। তাহার গানে সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন। তাহার অল্পবয়স জন্য এ বিষয়ে আপত্তি হইত না। তাহার যৌবনের আরম্ভে আমি মহারাজাকে কহিলাম যে, "এ গায়িকা এতদিন বালিকা ছিল, এ কারণ আমাদের নিকট আসিলে বা বসিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক্ষণে এ প্রায় যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার আর আমাদের নিকট আসা বা সঙ্গে কোন স্থানে যাওয়া ভাল দেখায় না।" রাজা উত্তর করিলেন, "ইহার এখনও যৌবনাবস্থা হয় নাই। আর হইলেই বা ইহার গীত শ্রবণে কি দোষ আছে।" কিছুদিন পরে দেখিতে লাগিলাম যে, কেহ কেহ মদিরা-পানের পর তাহার সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেন। একে যুবতীর মধুর স্বরেই মন মোহিত হয়, আবার সুরা তাহার সহচরী হইলে কি না অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে পারে? ইহার একটি চমৎকার ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব

করিলেন যে, "এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে।" তখন সুধাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্লিত ছিল, সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এই সুন্দরী যখন পেশওয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন, এইরূপ দর্শকবৃন্দের ঢুলুঢুলু নয়নে দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহারা এইসঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাঁহার পদও শেষে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন। আমি নৃত্য করি নাই বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া সকলের আমোদ দেখিতেছিলাম, এবং উৎসাহ দিতেছিলাম।

গায়িকার খ্যামটা নাচ

যে অর্দ্ধযৌবনা গায়িকার কথা বলিতেছিলাম, তাহার নিমিত্ত আমার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। সে প্রথমে আমার সঙ্গীত শুনিতে অতিশয় ভালবাসিত। অন্যের সাক্ষাতে বলিত যে, "দেওয়ানজীর মত মিষ্টস্বর আর কাহারও নাই।" ইদানীং যখন আমি গান করিতাম, তখন সে আমার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিত। এক রাত্রিতে শ্রীবনের বাটীতে আমরা অনেকেই নিমন্ত্রিত ছিলাম। রাজা তৎকালে উপনীত হন নাই। কয়েকজন বান্ধব কোন স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, এমন সময় ঐ বালা সহসা আমাদের নিকট আসিয়া, আমার চরণ ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতে লাগিল যে, "আপনার মত মধুর গীত আর কাহারও শুনিতে পাই নাই। অনেক দিন অবধি একটি কথা আপনাকে বলিব মনে করিতেছি, কিন্তু বলিতে সাহস হয় নাই। সেই কথাটি বলিব মনে করিয়া আসিয়াছি। আপনি বলুন, আমাকে ভালবাসেন কি না।" আমি বুঝিলাম যে, এ মদ্য পান করিয়াছে। এক্ষণে ইহাকে তিরস্কার করা বৃথা, এই ভাবিয়া কহিলাম, "তোর গান

গায়িকার অনুরাগ

শুনিতে সকলেই ত ভালবাসে, তবে এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস ?" তথাপি সে বলিতে লাগিল, "আপনি আমাকে মনের সহিত ভালবাসেন কি না বলুন।" শিশুরা যেমন কোন বিষয়ের জন্য গুরুজনের নিকট আবদার করে, এবং সে বিষয় হাজার অসঙ্গত হইলেও সে তাহা বুঝে না, বালিকার ভাবে ও স্বরে ঠিক সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। সে গৌরাঙ্গী ছিল না, কিন্তু সুশ্রী ছিল, এবং সঙ্গীতে নিপুণা না হউক, স্বরে সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিত। তাহার বয়স তৎকালে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর। এখনও পূর্ণ-যৌবনা নহে। আমার বয়স সে সময় ৩০ কি ৩২ বৎসর হইবে। উভয়ের বয়স বিবেচনা করিলে তাহার প্রতি আমার স্নেহ ব্যতীত, তাহার সহিত প্রণয় হইবার কথা নহে। যাহা হউক, আমি দীনভাব-দর্শনে তাহার প্রতি রুষ্টভাব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ছেলে-ভুলান ভাবে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মহারাজা আসিলেন, এবং আমরাও উঠিয়া গেলাম। সে দিবস চাকরগণকে কহিয়া দিলাম যে, "তোমরা ইহাকে মদ্য দিও না, এবং গানের সময় ব্যতীত অন্য সময় আমাদের নিকট আসিতে ইহাকে নিষেধ করিবে।"

কিছুদিন পরে শুনিলাম, এবং ইহার ভাবেও বুঝিলাম যে, আমার প্রতি ঐ বালিকার নিতান্ত আসক্তি জন্মিয়াছে। আমার তৎকালীন মনের ভাবের কথা লিখিলে, অনেকেই আমার মন অপবিত্র বলিবেন তাহার সন্দেহ নাই। তথাপি যখন জীবনের ঘটনাবলী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন এ বিষয় গোপন রাখা কর্ত্তব্য নয়। ভাবিতাম, এ গায়িকার শরীর অপবিত্র, তাহার হৃদয় অপবিত্র, কিন্তু তাহার ভালবাসা ত অপবিত্র নহে। যদি কোন অপবিত্র স্থানে পুষ্প জন্মায়, তবে স্থান অপবিত্র বলিয়া কি পুষ্পও অপবিত্র হইবে ? যদি একটি কুক্কুরের ভালবাসায় আনন্দ হয়, একটি মানবে ভালবাসিলে, আনন্দ হইবে না কেন ? তাহার অনুরাগে আহ্লাদ ও বিষাদ দুইই হইত। আমার প্রতি একজনের অনুরাগ হইয়াছে, ইহাতে আহ্লাদ হইত ; আবার তাহার অনুরাগ চরিতার্থ হইবে না, তাহা ভাবিলে বিষাদ

উপস্থিত হইত। আহা! স্ত্রীজাতির অবস্থা কি শোচনীয়। পুরুষে ব্যভিচার দোষে দোষী হইলে তাহাকে ঘৃণা করি বটে, কিন্তু তাহার সহিত বসিতে বা মিষ্টালাপ করিতে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করি না। কিন্তু স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আপনাকে অপবিত্র মনে করি। এই বিষয় সংক্রান্ত আর একটি ঘটনা নিম্নে লিখিতেছি, তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় মাত্রেই আর্দ্রহৃদয় হইবেন।

সমাজের অবিচার

রাজবাটীতে আর একটি প্রবীণা গায়িকা আসিত। তাহার গর্ভে আমার এক নিকটস্থ জ্ঞাতির পুত্র জন্মে। সেই বারনারী একদা অতি আক্ষেপ করিয়া কহিল যে, "স্ত্রীলোক কি অধম ও কি দুর্ভাগা জাতি। আমাদের সহিত যেসকল পুরুষ সহবাস করেন, এবং আমাদের সমান দোষী, তাঁহারা ভদ্র সমাজে যাইতেছেন, সকলের সঙ্গে একাসনে বসিতেছেন, এবং আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন। কিন্তু আমরা দুর্ভাগা সেই সমাজের দিকে নেত্রপাত করিতেও সাহস করি না। আপনার গান শুনিবার নিমিত্ত কতই ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু কখন ও-বাটী যাইতে সাহস হয় নাই। পূজার সময় কখন কখন আপনি প্রতিমা-সম্মুখে গাইয়া থাকেন শুনিয়া প্রতিবৎসর আপনাদের বাটীতে গিয়াছি—কখন গীত শুনিতে পাইয়াছি, কখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছি। যদি জানিতাম যে, আরও বেশী শিক্ষা করিলে আপনাদের সমাজে যাইতে পারিব, তাহা হইলে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতাম। যদি আঁস্তাকুড়ে কোন আটি পড়ে ও তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মে, তবে অপবিত্র স্থানের বৃক্ষ বলিয়া তাহার ফল কি অব্যবহার্য্য হইবে? অতএব যে সন্তানটি এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহাকে ঘৃণিত ভূমির উৎপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। তাহার কোন দোষ নাই।" এই বেশ্যাটি বেশ্যাগর্ভে জন্মে, এবং গর্ভ-ধারিণীর পথের পথিক হয়। সুতরাং তাহার কুপথগামিনী হওয়ার জন্য তাহাকে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। একারণে তাহার বিলাপে আমাদের অতিশয় দুঃখ বোধ হইত। আমার যৌবনাবস্থায় একদা

কলিকাতার পাঁচী ধোপানীর গলিতে রাজার মোক্তারের বাসায় কয়েক মাস ছিলাম। বাসস্থান হইতে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতাম যে, কি যুবতী, কি প্রবীণা, সকল গণিকাই নিরন্তর হাস্য-পরিহাস ও আমোদ-আহ্লাদে কালযাপন করিতেছে। ভাবিতাম ইহারা কি যথার্থই সুখী? ইহারা কি কুল-কামিনীদের অপেক্ষা আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালিনী জ্ঞান করে? কখন কি ইহাদের মনে গৃহত্যাগের নিমিত্ত অনুতাপ উপস্থিত হয় না? এইসকল বিষয় জ্ঞাতার্থে কখন কখন তাহাদের সহিত আলাপ করিবারও ইচ্ছা হইত। কিন্তু ঘৃণা ও লজ্জাবশতঃ তাহাদের বাটী যাইতে পারিতাম না। শেষে তাহাদের অবস্থার বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের নিকট ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, প্রায় বারাঙ্গনাই গিল্‌টির বস্তু। আকারে যে উজ্জ্বলতা দেখা যায়, অন্তরে তাহার কিছুই নাই। অন্তর ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন। তাহারা আন্তরিক অসুখ ভুলিবার জন্য এইরূপ সং সাজিয়া থাকে। একাকিনী থাকিতে হইলে যম-যন্ত্রণা হয়। অবস্থা-বিশেষে কেহ কেহ যৌবনাবস্থায় আপনাকে সুখী ভাবে বটে, কিন্তু গত-যৌবনা হইলে মানসিক কষ্ট নিশ্চয় পাইতে থাকে। আপনার বলিবার কেহ থাকে না; পুরুষ নহিলে চলে না, অথচ একজনও ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী পায় না। কত ধূর্ত্ত-চূড়ামণি প্রণয়িণীর কত কষ্টের ও পাপের উপার্জ্জিত ধন ও আভরণ হরণ করিয়া পলায়ন করে। পীড়িতাবস্থায় দুঃখের সীমা থাকে না। নায়ক হাস্যানন দেখিতে আইসে, বিরসবদন দেখিলে প্রস্থান করে; সুতরাং যখন অন্তরে অসুখের সীমা থাকে না, তখনও নায়ক ভুলাইবার নিমিত্ত প্রফুল্লবদনে থাকিতে হয়। অসতীদিগের মুখে সতত এই কথা শুনা যায় যে, "এই জন্মে এই ফল, আবার পাপ করিব?" তাহাদের এই অবস্থা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে কে সুখী মনে করিবে?

সুধা না গরল

আহা! এইসকল দুঃখিনীদের অবস্থার সমালোচনা করিলে হৃদয়ে কতই দুঃখ উপস্থিত হয়। কে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে? কে তাহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে? কে তাহাদের স্ত্রী-সর্ব্বস্বধন সতীত্ব রত্ন হরণ করিয়া ভিখারিণী করিয়াছে? স্বার্থপর

রাক্ষসাধম পুরুষেরাই ক্ষণিক বা কিয়ৎকালের সুখসাধনের নিমিত্ত এই দুর্দ্দশা করিয়াছে। কালভুজঙ্গ-দংশনে যাতনা অচিরাৎ শেষ হইয়া যায়, কিন্তু বিনষ্ট সতীত্ব ক্লেশ শীঘ্র শেষ হয় না। আর যদি পরকাল থাকে, তবে হয়ত এ দুঃখের অবসানই হয় না।

অবলার পতন হেতু

বঙ্গীয় কুলকামিনীকুল সহজে সতীত্ব ত্যাগ করে না। সতীত্বকে তাহারা সর্ব্বধর্ম্মের সার জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং লজ্জাকে সকল ভূষণের প্রধান ভূষণ বোধ করে। তাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও সতীত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা পায়। তবে যে এত বারাঙ্গনা দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, রমণীর বৈধব্যদশা ও কোমল স্বভাব এবং পুরুষের কৌশল। প্রায় পূর্ণমনোরথ হইতে পারে না বলিয়া সধবার প্রেমাকাঙ্ক্ষী অধিক পুরুষে হয় না। আমি জানি, সামান্য দুলিয়া-জাতীয় যেসকল স্ত্রীলোক সাংসারিক বিবিধ কার্য্যানুরোধে ঘাটে, পথে ও অন্য অন্য লোকের বাটী যাইত, তাহাদের মধ্যে তিনটি নারীকে আমার প্রতিবাসী যুবকেরা কুপথে লইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

দোষ কাহার ?

বিধবা যুবতীরা শারীরিক ও মানসিক নানা অসুখে কালযাপন করে। পুরুষে আকার ইঙ্গিত দ্বারা অথবা অদৃষ্টি-গোচর থাকিলে দুষ্টা কৌশলী স্ত্রীলোক দ্বারা বিধবার নিকট আপনাদের মানস জানায়। যুবতী প্রথমতঃ প্রায়ই বিরক্তিভাব প্রকাশ করে। কিন্তু কোমলস্বভাব অথবা লজ্জাবশতঃ এই বিষয় গুরুজনের বা আত্মীয়-স্বজনের গোচর করিতে পারে না; অন্তরেই তাহা গোপন করিয়া রাখে। কখন ভাবে, এ বিষয় অন্যে জানিতে পারিলে গোলযোগ হইয়া বড় লজ্জার বিষয় হইবে, কখন চিন্তা করে যে, ইহা প্রকাশ হইলে প্রেমাকাঙ্ক্ষীর নিপীড়ন হইবে। নিজেই এ বিষয়ে নিবারণ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার দৃঢ় সংস্কার থাকে। এইরূপ কোমল ভাব অবলম্বন তাহার সর্ব্বনাশের মূল হয়। আপনার কোমল হৃদয়কে যে এতদূর বিশ্বাস করা উচিত নহে, সে তাহা একবারও চিন্তা করিয়া দেখে না। পুরুষের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও কৌশলে তাহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ হয়। অগ্রে যাহা ঘৃণার্হ, তাহা পরে

কমনীয় হইয়া থাকে। তখন তাহার হৃদয়মধ্যে নিশিদিন নায়কের ভালবাসার ভাব উদয় হইতে থাকে। একদিকে ধর্ম্ম ও লজ্জা, দ্বিতীয় দিকে হৃদয়ের প্রেমভাব ও কল্পনা, এই উভয় দলে যুদ্ধ হইতে থাকে ; কিন্তু শেষে প্রায় হৃদয়ের ভাবের জয় হইয়া অবলার সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে, অসঙ্গত স্তবে কেহ সন্তুষ্ট হউন আর না হউন, প্রায় কেহই স্তাবকের প্রতি বিরক্ত হইয়া রুষ্টভাব প্রকাশ করেন না। সেইরূপ কেহ কাহারও প্রতি প্রেমভাব প্রকাশ করিলে, সে ভাব যতদূরই অন্যায় হউক না কেন, প্রেমাকাঙ্ক্ষীর প্রতি বিরক্তিভাব জন্মে না। স্তাবকের অভিসন্ধি বুদ্ধিমানের অজানিত থাকে না, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও বিরাগভাব দৃষ্ট হয় না। বিজ্ঞজনেরাও আপনাদের যথার্থ দোষের কথা শুনিলে বরং কখন বিরক্ত হইবেন, তথাপি মিথ্যা আরোপিত সন্তোষজনক গুণের কথায় বিরক্ত হইবেন না, বরং কখন কখন সন্তুষ্ট হইবেন। যদি বিজ্ঞ পুরুষদিগের চিত্তের এরূপ ভাব হয়, তবে অবলা সরলা রমণীদের অন্যের ভালবাসার প্রস্তাবে খড়্গহস্ত হইবার সম্ভাবনা কি? তাহারা নায়কের ভালবাসার প্রস্তাব প্রথমে অতি অশ্রদ্ধার সহিত শুনে ; কিন্তু যখন শুনিতে পায় যে, একজন তাহার প্রেমের নিমিত্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, বা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহাদের সুকোমল হৃদয় কেন না আর্দ্র হইবে? আর যখন কোন নায়িকার প্রতি কোন নায়কের অসাধারণ প্রেমের কথা উপন্যাসে পড়িতে ভাল লাগে, তখন নিজে নায়িকা হইয়াছেন, নায়ক গাঢ় ভালবাসা প্রকাশ করিতেছে, ইহা ভাল লাগিবার অসম্ভাবনা কি?

ইংরাজী উপন্যাসের দুইটি রমণী

ইউজিন্ সুরচিত মিষ্ট্রীস্ অব্ প্যারিস উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ম্যাডাম ডি হারবিলি অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতীত্ব-রত্নকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার নায়কের ও তাঁহার এক স্বার্থপর সঙ্গীর অসাধারণ কৌশলে যখন তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, তাঁহার ভালবাসা লাভ না করিলে নায়ক নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে, তখন

তিনি নায়কের জীবনরক্ষার্থ সতীত্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে সম্মতা হইলেন। তাঁহার একান্ত সুহৃদ্বর এক মহাপুরুষ দ্বারা রক্ষিত না হইলে, তিনি নিশ্চয় সতীত্ব হারাইতেন। ডন্ কুইক্‌সোট্ নামে সুবিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে দুই বন্ধুর যে কাহিনী আছে, তাহাতেও দেখা যাইতেছে যে, একজন বন্ধু অপর বন্ধুর স্ত্রীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইলে, প্রথমে ঐ পত্নী যারপরনাই বিরক্তা হইয়াছিলেন, এবং ঐ বন্ধুকে নিতান্ত অশ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পরে বন্ধুর প্রগাঢ় ভালবাসার ভাব মনে যতই উদয় হইতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয় অপ্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। প্রথমে যে রমণী আহত সিংহিনীর ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছিল, সেই রমণী শেষে মৃদুস্বভাবা মৃগীর ন্যায় বশতাপন্ন হইল।

কি সভ্য, কি অসভ্য, কি সুশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকল দেশেরই কামিনীরা সতীত্ব ধর্ম্মকে স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম্ম ও সংসারের সকল ভূষণ অপেক্ষা অধিক শোভনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে। নিতান্ত পরবশ না হইলে ইহাতে জলাঞ্জলি দেয় না। সতীত্বহারা হইলে স্ত্রীজাতি যেরূপ ঘৃণাভাজন হয়, যদি পুরুষজাতিও পরদারগমনে সেইরূপ ঘৃণিত ও সমাজ-বর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে ব্যভিচার দোষ প্রায় তিরোহিত হইয়া যাইত। পুরুষেরাই রমণী-দিগকে ভালবাসা জানায়, তাহাদের কোমল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার করায়, এবং শেষে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করে। কুলকামিনীগণ প্রায়ই পুরুষদিগকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিবার চেষ্টা পায় না।

ব্যভিচারে—নর-নারীর তুল্যদণ্ড

যে দেশে ব্যভিচার দোষের দণ্ড স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি তুল্যরূপ আছে, সে দেশে এ দোষ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ছোটনাগপুরে যেসকল আদিমনিবাসী জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষগণ সর্ব্বদা একত্র বাস করে, ও প্রায় বিবস্ত্র থাকে ; তথাপি তাহাদের ব্যভিচার দোষ মোটেই ঘটে না। যদি কেহ ব্যভিচার দোষ কখন করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হয়। আমার একজন আত্মীয় তদঞ্চলে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন ; তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, অবিবাহিতা

যুবতীরা তাঁহার নিকট কখন কখন আসিত, এবং বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিত। তাহারা পিতা-ভ্রাতার সহিত যেরূপ সরল ব্যবহার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার সহিত করিত। যদিও বন্ধু যুবা ও সুন্দর ছিলেন, তথাপি তাঁহার আলিঙ্গনে তাহাদের মনে কোন বিকার জন্মিত না। তাহাদের নির্ম্মল ব্যবহার দর্শনে, তাঁহার এক লম্পট পাচক ব্রাহ্মণের অপবিত্র হৃদয় বিকারশূন্য হইয়াছিল। সেখানকার স্কুলের এক শিক্ষক কোন কামিনীর প্রেমাভিলাষী হইয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া ঐ কামিনীর গুরুজনেরা তাঁহার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হয়। ডেপুটীবাবু অনেক কৌশল করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করেন, এবং শিক্ষককে বিদায় করিয়া দেন।

ছোটনাগপুরের রমণীগণ

বোধ হয়, যদি পূর্ব্বোক্ত অপূর্ণবয়স্কা গায়িকার পূর্ণবয়স হইত, কিম্বা বিশেষ বুদ্ধিশক্তি থাকিত, বা আমার উগ্রভাব দেখিত, অথবা রাজবাটীর কোন কোন লোকের উৎসাহ না পাইত, তবে তাহার প্রেমানল জ্বলিবামাত্র নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত। সে যাহা হউক, তাহার প্রণয়-পিপাসা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রায় প্রতি বর্ষের বর্ষাকালে যখন খড়িয়া নদীর পূর্ণাবস্থা হইত, তখন কখন কখন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মহারাজা সঙ্গীত-সম্প্রদায় সহিত জলভ্রমণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে সঙ্গে লইতেন। একদা এক পূর্ণিমা যামিনীতে তিনখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আমরা উঠিলাম। একখানিতে রাজা ও তাঁহার কতিপয় স্বজন, দ্বিতীয়খানিতে আমি ও আত্মীয় কয়েকজন। তৃতীয়খানিতে গায়ক-সম্প্রদায়। ঐ বালিকাও ঐ সঙ্গীত-সম্প্রদায়ে ছিল। তরণীত্রয় প্রায় পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া যাইতেছিল। তৎকালে মন্দ মন্দ সমীরণে ও শশধরের সুবর্ণ-কিরণে তরঙ্গিণী যেন পূর্ণযৌবনা নর্ত্তকীর ন্যায় কাঞ্চনখচিত বেশে সহস্ররূপা হইয়া নৃত্য করিতেছিল। একে এই মনোহর দৃশ্যতেই সকলে মোহিত হইয়াছিলেন, তাহার উপর অতি সুমধুর সঙ্গীত-স্বরে সুধাবর্ষণ হইতে লাগিল। কাহারই রাত্রির দিকে মনোযোগ হইল না।

জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষা

হঠাৎ জানা গেল, রজনী তৃতীয় প্রহর হইয়াছে। সঙ্গীত স্তব্ধ হইল, এবং প্রত্যাগমনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। মহারাজা আহার-করণার্থ আমাকে নিজ নৌকায় ডাকিলেন। আমরা নৌকার অনাচ্ছাদিত ভাগে বসিয়াছিলাম। আচ্ছাদিত ভাগের মধ্যে অন্ধকার ছিল। তথা হইতে সহসা এই বালিকা বাহিরে আসিয়া কহিল যে, "আমি দেওয়ানজী মহাশয়ের মুখে একটি মেঠাই দিব, নতুবা জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।" বালিকা কখন এ নৌকায় আসিয়াছিল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। দেখিলাম সেদিনও সে যথেষ্ট মদ্যপান করিয়াছে। আমি বিরক্তি প্রকাশ করিলে, বালিকা কাঁদিয়া কহিতে লাগিল যে, "দেওয়ানজী মহাশয় আমাকে ঘৃণা করেন।" রাজা শেষে কহিলেন যে, "যদি ইহার হস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন খাইলে এ সুখী হয়, তবে তাহাতে তোমার কি পাপ হইবে?" আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার প্রণয়-প্রকাশে আমার বিশেষ বিরক্তি জন্মিত না। বরং হর্ষ-বিষাদ উপস্থিত হইত। প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু শেষে তাহার দুঃখের ভাগী হইলাম, এবং তাহার হস্ত হইতে মেঠাই লইয়া মুখে দিলাম। আর একবার এক পৌষ সংক্রান্তির রাত্রিতে আমাদের সকলেব রাজবাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। সঙ্গীত-সময় ঐ বালিকা উপস্থিত হইল। আহারের পর রাজা কয়েক আত্মীয়ের সহিত চকের পূজার যাত্রা গোপনে শুনিতে চলিলেন। পাছে এই বালিকা আমার সঙ্গ লয়, এ কারণ আমি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া, রাজবাটীর এক গৃহে পূর্ণবাবু ও আমি শয়ন করিলাম। ১০।১২ মিনিট পরে রাজা আমাকে আর এক কক্ষে ডাকাইয়া কোন কোন কথা বলিয়া গেলেন। আমি শয়নগৃহে পুনর্গমন করিতেছি এমন সময় দেখিলাম, অন্ধকারে ঐ বালিকা দণ্ডায়মানা। আমি প্রথমে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কাতরোক্তিতে সে ভাব ভুলিয়া গেলাম। আমার আশা ত্যাগ করাইবার জন্য তাহাকে অনেকরূপ বুঝাইলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। শেষে সে আমার হস্ত ধরায়, তাহার হাত ছাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত গৃহে শয়ন করিলাম। সেখানে পূর্ণবাবু থাকাতে

সে আর আমার নিকট যাইতে পারিল না। আমি তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলাম।

পরদিবস পূর্ব্ব ঘটনা সকল মনে হওয়াতে, প্রথমতঃ আমার মনের দুর্ব্বলতার জন্য অত্যন্ত অসুখ হইতে লাগিল। পরে আমার রাজবাটীর আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে পাপ-পঙ্কে পতিত করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হইয়াছে। রাজা যে রাত্রিতে আমাকে ডাকিয়া কোন কোন কথা বলেন, তাহাও কৌশল বোধ হইল। ভাবিলাল, কি ভয়ানক

আমার অনুতাপ

স্থান! উৎকোচগ্রাহীরা আমাকে আপনাদের দল-ভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, আবার ইন্দ্রিয়াসক্তগণ আমাকে ব্যভিচার দোষে লিপ্ত করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। একবার ভাবিলাম, এখানে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে। আবার ভাবিলাম, রাজার এমন প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নহে। কয়েকদিন অত্যন্ত অসুখে যাপন করিলাম। নিজের প্রতিও অত্যন্ত ঘৃণা হইল। মনে করিলাম, এই সুধারূপী বিষপূর্ণ মদিরা আর পান করিব না, এবং কার্য্যানুরোধ ব্যতীত রাজবাটী প্রবিষ্ট হইব না। যাঁহাদের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য আমি নিরন্তর চেষ্টা করিয়া থাকি, তাঁহারাই আমার চরিত্র কলুষিত করিতে বদ্ধপরিকর হইবেন, ইহা কখনই ভাবি নাই। শেষে আমি নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া রাজাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলাম যে, "আমি আপনাদের কোন দোষ দেখিলে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু কাহারও প্রতি ঘৃণা করি না, বরং স্নেহ করিয়া থাকি। আমাকে দুশ্চরিত্রান্বিত করিলে আপনাদের কি লাভ হইবে?" রাজা এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না, এবং প্রকাশ্যেও কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু বোধ হইল, যেন তিনি এবং স্বজনগণ আমার উপর অতিশয় চটিয়াছেন। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, রাজার নিকট তাঁহার স্বজনেরা সর্ব্বদাই এইরূপ কহিতেছেন যে, "ইঁহাদের (অর্থাৎ আমার ও আত্মীয়দের অন্তরে) ইন্দ্রিয়সুখের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, শুদ্ধ লজ্জার ভয়ে তাহা চরিতার্থ করিতে পারেন না। ইঁহারা কেহই সাধু নহেন।" তাঁহাদের সহিত

বাহ্যে পূর্ব্বভাব থাকিল, কিন্তু আন্তরিক সুহৃদ্ভাব এককালে অন্তর্হিত হইল। আমি রাজবাটীর আমোদ-প্রমোদে আর মিশিব না শুনিয়া, আমার আত্মীয়েরাও ঐ সঙ্কল্প করিলেন। আমাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া রাজা স্থির করিলেন, যে দিন আমাদের সমাগম হইবে, সেদিন কোন গণিকা উপস্থিত থাকিবে না। সুতরাং রাজ-স্বজনদের ও আমাদের দল পৃথক হইয়া গেল। রাজবাটীতে আমার যে সুখ ছিল, তাহা তিরোহিত হইল, এবং অনিষ্টের আশঙ্কা হইতে লাগিল।

রাজবাটীতে দুই দল

রাজ-স্বজনেরা বিবেচনা করিলেন যে, "ইঁহার প্রতি রাজার যে ভক্তি ছিল, তাহা লুপ্ত করিতে যখন কৃতকার্য্য হইয়াছি, তখন তাঁহার ভালবাসার মূলচ্ছেদ করিতে কতক্ষণ লাগিবে।" তাঁহাদের সে সুখের স্বপ্ন আপাততঃ ভঙ্গ হইয়া গেল। রাজার কাশীধাম দর্শনের ইচ্ছা হইল। তিনি আমাকে, পূর্ণবাবুকে ও কালীকে সঙ্গী করা স্থির করিলেন। এ বিষয় বিরোধী সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অগোচর থাকিল। আমরা প্রথমতঃ কলিকাতায় যাইয়া যাত্রার উদ্যোগসকল করিলাম, এবং তথা হইতে ইন্‌ল্যাণ্ড ট্রানজিট্ কোম্পানীর তিনখানি মনুষ্যদ্বারা চালিত গাড়ীতে ট্রাঙ্ক রোডে যাত্রা করিলাম। এক শকটে মহারাজা, দ্বিতীয় শকটে পূর্ণবাবু ও কালীবাবু, এবং তৃতীয় শকটে আমি ও এক রাজজ্ঞাতি। শকটের উপরিভাগে ভৃত্যদের স্থান হইয়াছিল। দিবারাত্রির মধ্যে আমাদের প্রয়োজন ব্যতীত শকটের গতিরোধ হইত না। আমি দিবসে কখন রাজার নিকট, কখন পূর্ণবাবুর নিকট থাকিতাম। বৈকালে ও সন্ধ্যার পর শকটের ছাদের উপরে বসিয়া কালী, পূর্ণ ও আমি একত্র কখন বন ও শৈলের শোভা সন্দর্শন করিতাম কখন মিষ্টালাপ, এবং কখন "কি স্বদেশে, কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতাম। ইতিপূর্ব্বে কেহই আমরা অরণ্য বা পর্ব্বত দেখি নাই। সুতরাং এই সামান্য শেখর ও কানন দর্শনেই বিস্ময়-আনন্দসাগরে মগ্ন হইতাম। যখন যৌবন-প্রারম্ভে আমি অন্য তিন জন বন্ধুর সহিত নৌকাযোগে

বারাণসী-দর্শন

কাশীর শোভা

ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখনও আমার কয়েক দিবস অতি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু এ সুখের সহিত সে সুখের তুলনা হয় না। কারণ সে সুখের দৃশ্য কেবল রমণীয় ছিল। এ সুখের দৃশ্য যেমন মনোহর, তেমনই বিস্ময়কর! এ দৃশ্যের বর্ণনা হয় না; যদি কবি হইতাম, তাহা হইলেও বা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতাম। সপ্তম দিবসের প্রাতে আমরা কাশীর পরপারে উপনীত হইলাম। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদের শোভা দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ নগরের যেন আর এক নূতন প্রকারের সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। একূল হইতে নগরের দিকে নেত্রপাত করিবামাত্র বোধ হইল, যেন আমাদের গমনের পথ ঠিক এই নগরের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। বর্ত্মের উভয় পার্শ্বের অরণ্য ও শেখর সন্দর্শনে যেরূপ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম, নগর-দর্শনেও সেইরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলাম। মনে হইল, এই পথে যাইয়া প্রস্তরময় অট্টালিকা-সমন্বিত নগরের পরিবর্ত্তে যদি কলিকাতার ন্যায় শ্বেতসৌধপূর্ণ নগর দেখিতাম, তাহা হইলে মনোমধ্যে এরূপ সুন্দর ভাবের আবির্ভাব হইত না। সুরধনীতীরস্থ সোপানরাজি, ও তৎসন্নিহিত প্রকাণ্ড প্রাসাদমালার সৌন্দর্য্য ও সুশৃঙ্খলা বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে দর্শন করিতে লাগিলাম। হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হইতে লাগিল। জাহ্নবী উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে আমরা সিকরোলে গমন করিলাম; এবং আহারাদি সমাপন করিয়া বৈকালে গঙ্গাতীরস্থ একটি বাটীতে অবস্থিত হইলাম। নগরটি যেমন নয়নসুখকর ও হৃদয়রঞ্জক তেমন বাসোপ-যোগী নহে। তথায় পাঁচদিন থাকিয়া আর্য্যগৌরব অনেক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি দেখিলাম। ষষ্ঠ দিবসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে আর এক অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আসিলাম। গমনসময়ে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, প্রত্যাগমনসময়ে তাহা তিমিরাচ্ছন্ন হইল। এক রাত্রিতে হঠাৎ দৃষ্ট হইল, যেন অসংখ্য দীপমালা নানাদিকস্থ পর্ব্বতোপরি শোভা পাইতেছে। যে কয়েক দিন পর্ব্বত-প্রদেশ দিয়া আসিলাম, সে কয়েক রাত্রিতেই ঐরূপ আলোকরাজি দৃষ্ট হইল। জিজ্ঞাসা করাতে শকটচালকগণ কহিল যে, “কখন বৃক্ষরাজি পরস্পর সংঘর্ষণে ঐ অনলের উৎপত্তি হয়, কখন

সন্নিহিত গ্রাম্য লোকে বনে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। যতদিন বৃষ্টি না হইবে, ততদিন ঐ বহ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।" আমাদের যাইবার কালে জ্যোৎস্নাতে যে আমোদ হইয়াছিল, আসিবার কালে অন্ধকারে তদপেক্ষা অধিক আমোদ হইল।

কাশীতে একদিবস আমার বিরুদ্ধদলের চক্রান্তের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। রাজা কহিলেন, "আমি চক্রান্তের বিষয় কিছুই জানি না।

গায়িকার প্রেম সম্বন্ধে রাজার সহিত আলোচনা

তাহার প্রেমাশা পূর্ণ হইবার নহে, ইহা বালিকাকে অনেকরূপ বুঝাইয়াছিলাম। তবে এক রাত্রিতে তুমি তাহার প্রতি বিরক্তিভাব দেখানতে, সে তোমাকে কোন কোন কথা বলিবে বলিয়া আমাকে নিতান্ত ধরাতে, আমি কৌশলে তোমাকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম বটে। আর এক রাত্রিতে, তোমাকে না দেখিলে সে আত্মহত্যা হইবে নিশ্চয় জানানতে, পূর্ণবাবুর বাটী হইতে তোমাকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম সত্য; তোমার দেখা না পাইয়া লোক ফিরিয়া আসিলে, সে সে-রাত্রিতে রাজবাটীতে থাকে ও পরদিন প্রাতে তোমাকে দেখিয়া তবে বাটী যায়। আর একদিন পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলাম বটে যে, 'যদি তুই তাঁহার প্রণয়িনী হইতে পারিস্, তবে তোরে পুরস্কার দিব।' আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমার চিত্ত কখনই বিচলিত হইবে না, এই কারণেই আমি ঐ বালিকার প্রতি কোন কঠোর উপায় প্রয়োগ করি নাই। কিন্তু তুমি যে, আমাকে তোমার অনিষ্টাভিলাষী ভাবিয়াছিলে, তাহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষে তিনি পরিহাসচ্ছলে আমাকে বলিলেন যে, "ইহার উহার দোষ দেও মিথ্যা, তোমার রূপ আর স্বর সকল দোষের মূল। নতুবা রাজবাটীতে এত লোক আছে, সকল স্ত্রীলোকেরই তোমার দিকে ঝোঁক হয় কেন?"

বারাণসী হইতে আমরা প্রত্যাগমন করিলে শুনিলাম যে, আমি

বারাণসী হইতে প্রত্যাগমন

মহারাজার এই ভ্রমণের মূল, এবং ইহাতে অনেক অর্থ ব্যয় হইবে, মান-সম্ভ্রম যাইবে, ইত্যাদি বিবিধরূপ কল্পিত কথা আমার বিরুদ্ধদল কর্ত্তৃক মহারাণীর গোচর হওয়াতে, তিনি আমার প্রতি অতিশয় কোপ প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, রাজা গুপ্তভাবে যাওয়াতে তাঁহার অধিক ব্যয় বা মানের হানি হয় নাই, তখন তাঁহার সকল বিরক্তির শান্তি হইল, এবং বৈরদলের আশা-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু যখন দশচক্রে ভগবানের ভূত হওয়ার প্রবাদ হইয়াছে, তখন আর মনুষ্যের দুর্দ্দশা ঘটিবার অসম্ভাবনা কি? আবার রাজাকে আমার প্রতি কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন দেখিতে লাগিলাম।

একদা যে সময় আমি কোন রাজকার্য্যানুরোধে কলিকাতায় ছিলাম, সে সময় রাজসংসারের একটি মহালের ইজারা বন্দোবস্ত অতি গোপনে হইতেছিল। আমি ফিরিয়া আসিয়া এই বিষয় জানিতে পারিলাম, এবং ইহাতে রাজার বিস্তর ক্ষতি হইল ভাবিয়া সাতিশয় বিষাদিত হইলাম। কিন্তু এ বিষয় ষ্ট্যাম্পে লিখিত হইতেছে বলিয়া, এ সম্বন্ধে মহারাজাকে কিছু জানাইলাম না। দুই তিন দিবস পরে কোন কথাপ্রসঙ্গে রাজা আমার মুখে এই ক্ষতির বিষয় জ্ঞাত হইয়া কহিলেন যে, "যদি ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার চেষ্টা কর। আমি যাবৎ দস্তাবেজে স্বাক্ষর না করি, তাবৎ কোন বন্দোবস্তে বাধ্য নহি।" আমি অবিলম্বে অন্য এক গ্রাহককে এই সংবাদ দিলাম। আমি স্থানান্তরে গিয়াছি ভাবিয়া, তিনি শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের দ্বারা রাজার নিকট বেশী জমা দিবার প্রস্তাব করাইলেন। রাজবাটীর প্রায় সমস্ত লোক প্রথম গ্রাহকের পক্ষ ছিলেন, কেবল উক্ত রায় মহাশয় ও আমি দ্বিতীয় গ্রাহকের পক্ষে হইলাম। উভয় গ্রাহকই পরস্পরের অপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক লাভ দিবার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দ্বিতীয় গ্রাহকের ডাক বেশী থাকিল। সুতরাং তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করা স্থির হইল। পরদিন রাজা আমাকে কহিলেন যে, "দ্বিতীয় গ্রাহকের অপেক্ষা প্রথম গ্রাহক অধিক লাভ দিতে চাহাতে, তাহারই সহিত বন্দোবস্ত করা স্থির করিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে ব্যক্তি উপস্থিত হওয়াতে এত লাভ হইল, তাহাকে একবার এ সংবাদ দেওয়া হইবে কি?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমার যথেষ্ট লাভ হইয়াছে,

ইজারা বন্দোবস্ত

আমি আর সমস্ত পরিবারের ও আমলাদের অনুরোধ ঠেলিতে পারি না। তুমি এ বিষয়ে আর কোন কথা বলিও না।” তথাপি আমি অতি বিষাদিত চিত্তে কহিলাম যে, “এ কর্ম্মটি অতিশয় অন্যায় হইল।” রাজা আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই অবিবেচনার জন্য আমার এতই কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইল যে, আমি সেদিন আর রাজবাটীতে যাইতে পারিলাম না। যাহা হউক, পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অপেক্ষা এ বন্দোবস্তে রাজার অনেক লাভ হইল।

এই বন্দোবস্ত হওয়ার কয়েকদিন পরে এক রাত্রিতে শ্রীবনের বাটীতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। পূর্ণবাবু কি জন্য উপস্থিত হন নাই। তাঁহার পিতৃব্য শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের অসন্তোষ জন্য তিনি আসেন নাই, রাজা এই মনে করিয়া রায় মহাশয়ের প্রতি অতি অন্যায় বাক্য বলিতে লাগিলেন। একে পূর্ণবাবু আমার সোদরসম বান্ধব, তাহার উপর আবার ইজারা বন্দোবস্তের সময় রায় মহাশয় ও আমি একপক্ষে ছিলাম। সুতরাং রাজার অন্যায় কথাসকল আমার বড় কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। তথাপি ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরভাবে ছিলাম। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকারক স্বজন যখন তাঁহার বাক্যের পোষক হইয়া আস্ফালন করিয়া উঠিলেন, তখন আর আমি অচলচিত্তে থাকিতে পারিলাম না। আমি রাজাকে কহিলাম যে, “রায় মহাশয় আপনার হিতসাধনেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার উপর এত কটূক্তি করা উচিত হয় না। এই ইজারার আর একজন গ্রাহক ছিল, তাহা কি আপনার এই মঙ্গলাভিলাষী স্বজন জানিতেন না? যদি আমি উপস্থিত না হইতাম, তবে ত আপনার এই বিপুল ক্ষতি হইয়া যাইত।” এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন যে, “উপকার স্বজনের নিকটই লওয়া কর্ত্তব্য।” রাজার বাক্যে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম যে, “এইজন্যই পারস্য-কবি সেখ সাদি কহিয়াছেন,—

রাজার সহিত বচসা

“যদি উপদেশ রাজা করহ শ্রবণ,
যাহাতে উত্তম শিক্ষা নাহি কদাচন।

পণ্ডিত ব্যতীত কারু দিও নাক ভার,
যদিও কর্ম্ম নহে সুযোগ্য তাহার ॥”

রাজা পারস্য ভাষা জানিতেন, সুতরাং কবিতার অর্থ বুঝিয়া ক্রোধ-নয়নে গম্ভীর ভাবে থাকিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আমি সেখান হইতে নিম্নতলায় আসিলাম। আমার আত্মীয়েরাও ক্রমে ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। আমোদ-প্রমোদ তিরোহিত হইল। সে স্থানে আর ক্ষণমাত্র থাকিবার ইচ্ছা রহিল না, কিন্তু আমি আসিলেই আত্মীয়েরাও আসিবেন, কেবল এইজন্য থাকিলাম। ক্ষণকাল পরে রাজা আমাকে ডাকাইয়া আমার বিরক্তিভাব দূরীভূত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু “উপকার স্বজনের নিকটই লওয়া কর্ত্তব্য,” এই কথা যেন অন্তরে এতই উচ্চৈঃস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল যে, বাহিরের কোন কথাই আমার কর্ণকুহরে স্পষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইল না। একবার যেন বলিতেছেন যে, “তোমার আসিবার পূর্ব্বে ইহাদের সাক্ষাতে তোমারই যশোকীর্ত্তন করিতেছিলাম।” সে রাত্রিতে আর গীতবাদ্য হইল না। এই গোলযোগেই অনেক রাত্রি গত হইল, এবং শেষ রাত্রিতে আহারাদি করা গেল।

আহা! উক্ত রাত্রিতে আমাদের কি দৃঢ়ীভূত মধুর প্রেমই প্রকাশ পাইল। আমার হৃদয়ের বেদনা বান্ধবদের হৃদয়েও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আমার অপমানে তাঁহারা সকলেই অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন; এবং আমার জন্য রাজার সংসর্গও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সে রমণীয় প্রণয় এখনও স্মরণ হইলে হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত হইতে থাকে।

কর্ম্মত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ

পরদিবস আমি রাজাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলাম যে, “কর্ম্মচারীর উপর প্রভুর শ্রদ্ধা না থাকিলে উভয়েরই অনিষ্ট সম্ভাবনা। একারণ আমি বিদায় হইলাম।” দুই দিবস পরে তাঁহার মোক্তার (আমার মধ্যম দাদা) আসিয়া কহিলেন, “রাজা তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তুমি না যাইলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইবেন। অতএব তোমায় যাইতেই হইবেক।” আমি কহিলাম, “কর্ম্মত্যাগ

করিয়াছি বলিয়া যে রাজবাটীও ত্যাগ করিয়াছি, তাহা নহে। তবে আপাততঃ যাইব না।" পরদিন পুনরায় মধ্যম দাদা আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, "রাজা সেই অবধি শ্রীবনেই রহিয়াছেন, তুমি না যাইলে রাজবাটী প্রত্যাগমন করিবেন না। আর কহিয়াছেন, যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও, তবে নিজে এই রৌদ্রে হাঁটিয়া তোমার নিকট আসিবেন।" সুতরাং এ কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার সমীপস্থ হইলে কহিলেন, "যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছ, আর দিও না।" তৎকালে সেখানে সঙ্গীত হইতেছিল। দুই চারি কথার পর একটি গান গাইতে আমাকে অত্যন্ত ধরিলেন। আমি তাঁহার নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া এই গীতটি গাইলাম—

"এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না,
এ চিতে নিশ্চিত ছিল পিরীতে বিচ্ছেদ হবে না।"

গীত সমাপ্ত না হইতেই অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, "তাহা কখন হবে না।" কতক্ষণ পরে কহিলেন, "এবেলা তোমায় রাজবাটী যাইয়া আহার করিতে হইবে।" এই বলিয়া তাঁহার গাড়ীতে আমাকে লইয়া রাজবাটী আসিলেন। আমিও আপন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া আবার তাঁহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইলাম, এবং কিয়ৎকাল সুখেও কাল কাটাইলাম।

পুত্রের মৃত্যু

আমার উদ্যান ও বৈঠকখানা প্রস্তুত হইলে, তথায় প্রত্যহ বৈকালে আমি বারুইহুদা হইতে আসিতাম, এবং আত্মীয়েরা কৃষ্ণনগর হইতে যাইতেন। আমরা সকলেই প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত সেইখানেই থাকিতাম।

বৎসর গত হইল, তবু ধনাভাবে পরিবারের বাসের উপযুক্ত স্থান করিতে পারিলাম না। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ এক রাত্রিতে আমার মধ্যম পুত্রের ওলাউঠা হইল। কৃষ্ণনগর হইতে ডাক্তার লইয়া যাইতে ও ঔষধ আনিতে দুই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। সুতরাং যথাকালে ঔষধ-সেবন হইলে উপকার হইত কি না, তাহার আর পরীক্ষা হইল না। পরদিন দুই প্রহরের পর তাহার জীবন শেষ হইল। বারুই-হুদায় আর বাস করা উচিত হয় না মনে করিয়া, আমি উপরিউক্ত

বৈঠকখানার পশ্চাতে আর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ করিয়া তথায় পরিবার আনিলাম। কিয়ৎকাল পরে রামতনুবাবু আমার বাটীর উত্তর দিকে আপন বাটী প্রস্তুত করিলেন। তিনি নিকটে আসাতে আমার বাটীর আরও গৌরব বৃদ্ধি হইল। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার বাটীতে আসিতেন, ও নানাবিধ হিতোপদেশজনক বাক্যে সকলের চিত্ত পুলকিত করিতেন। বিদেশীয় বন্ধুগণ ও যাঁহাদের কৃষ্ণনগরে কোন প্রয়োজন হইত, তাঁহারা প্রায়ই আমার এই বাটীতে অবস্থিত হইতেন। নগরের অভ্যন্তর হইতে আমার বাটী অনেক স্নিগ্ধকর বোধ হইত, এবং প্রথম কয়েক বৎসর বাটীতে প্রায় কোন পীড়া হইত না। যদি কখন উপস্থিত হইত, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ আয়াসে দূর করা যাইত। যে স্থানে নির্ম্মল বায়ুর সঞ্চালন হয়, যে স্থানে দূষণীয় বাষ্পোৎপত্তির কারণ না থাকে, এবং যে স্থানের ভিতর-বাহির পরিষ্কার থাকে, সে স্থান যে স্বাস্থ্যজনক হয় তাহা আমি বিলক্ষণরূপে বুঝিয়াছিলাম। যেসকল ইংরেজ, রাজার সঙ্গে আমার বাটীতে আসিতেন, তাঁহারা আমার বাটীর অবস্থা দর্শনে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতেন। একবার তৎকালীন কমিশনর চ্যাপম্যান সাহেবের স্ত্রী তাঁহাদের বাটীতে অনেক সাহেবের ও মেমের সাক্ষাতে আমার বাটীর প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, "ইহার (আমার) বাটীটি ঠিক আমাদের বাটীর প্রণালীতে প্রস্তুত। আমি বাঙ্গালীর এ প্রকার বাটী অত্যল্প দেখিয়াছি।" হায়! এক্ষণে যদি সেই মেমসাহেব আমার বাটী পুনরায় দেখেন, তাহা হইলে কতই আক্ষেপ করেন। রাজাদের সময় আমি পূর্ব্বাহ্ণে রাজার কার্য্য করিতাম, অপরাহ্ণে নিজের কার্য্যে থাকিতাম। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বদাই রাজবাটীতে থাকিতে হয়, সুতরাং বাটীর কার্য্য দেখিবার অবকাশ হয় না। উপযুক্ত মালি ছিল না, নিজেই মালির কর্ম্ম করিতাম। বাগানী বা ভাণ্ডারী অথবা বেহারা কেবল আমার সাহায্য করিত। আমি নিজ হস্তে পুষ্পবৃক্ষের শাখা ছাঁটিতাম, আম্রের কলম বাঁধিতাম, এবং কখন কখন ফুলগাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতাম ও তাহাতে জলসেক করিতাম। আর যেসকল বৃক্ষ বাড়িলে

বাটী ও বাগান নির্ম্মাণ

উদ্যানে অনুরাগ

জঙ্গল হয়, তাহা দৃষ্টমাত্র বিনষ্ট করিতাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত একগাছি যষ্টির নিম্নভাগে একখানি অস্ত্র যোগ করিয়াছিলাম। ঐ যষ্টি হস্তে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতাম, এবং কোন স্থানে ক্ষুদ্র জঙ্গল দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিতাম। এই কার্য্যটি প্রায়ই নিজে করিতাম। বৈকালে দুই তিন ঘণ্টা এইসকল কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতাম। এরূপ শ্রমে আমার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যথেষ্ট আনন্দ হইত। আমার মনে কোন কষ্ট হইলেই আমি এইরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম, আর তৎক্ষণাৎ তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। এমন সাধের রমণীয় উদ্যান ক্রমশঃ অরণ্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ইদানীন্তন যুবকগণের ঈদৃশ পবিত্র আমোদজনক বিষয়ে উপেক্ষা দেখিয়া বড়ই আক্ষেপ হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বয়স ৩৫ হইতে ৪৫ বৎসর

কনিষ্ঠ রাজকুমারের পীড়া ও মৃত্যু

আমাদের কনিষ্ঠ রাজকুমারের উৎকট জ্বর ও প্লীহা হয়। রাজবাটীতে পীড়ার উপশম না হওয়াতে, তাঁহাকে প্রথমে শ্রীবনে, পরে ফরাসডাঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইল। পীড়িত সন্তানের প্রতি পিতামাতার যাহা কর্ত্তব্য, তাহার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। আমি দিবসে তাঁহাকে আহার করাইয়া দিতাম, এবং রাত্রিতে আমার ক্রোড়ের নিকট শয়ন করাইতাম। তিন মাস পরে পূজার সময় তাঁহাকে বাটী আনিলাম। পুনরায় রোগবৃদ্ধি হওয়াতে, আবার তাঁহাকে ফরাসডাঙ্গায় লইয়া যাওয়া হইল। এবার রাজপুত্রের মাতৃষ্বসা তাঁহার সঙ্গে থাকিলেন। আমি প্রয়োজনমতে মধ্যে মধ্যে তথায় যাইতাম। আমার আত্মীয় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র তাঁহার চিকিৎসা করিতেন। পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে, নবীনবাবুর অজ্ঞাতসারে অন্য দুইজন ডাক্তারকে দেখান হইল। মহারাজা তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। আমিও কোন প্রয়োজনানুসারে ফরাসডাঙ্গা হইয়া তথায় যাই। হঠাৎ মহারাজার

সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ভিন্ন ডাক্তার যাইয়া রাজপুত্রকে দেখাতে নবীনবাবু কি বলিয়াছেন ?" আমি উত্তর করিলাম, "তাহাতে আপনার অবমাননা বোধ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।" রাজা কহিলেন, "তাহার এরূপ বোধ করা অতি অন্যায়।" আমি বলিলাম, "তিনি বৎসরাবধি প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাকে না বলিয়া অন্য ডাক্তার লইয়া যাওয়াতে আমাদেরই অন্যায় হইয়াছে।" আমি তাঁহার সহিত সমভাবে তর্ক করাতে, তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক "আমি কাহার চাকর নহি," এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ঐ রাজপুত্রের মৃত্যু হইল। রাজাও কলিকাতা হইতে বাটী আসিলেন। সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলে কহিলেন, তাঁহার অবকাশ নাই। তৎক্ষণাৎ আমার কলিকাতার তর্কের অবস্থা মনে পড়িল। সেই অবধি আমি রাজবাটী গমন করিলাম না। শুনিতে লাগিলাম, রাজা পুত্রশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। এইবার রাজবাটী পরিত্যাগ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু আপাততঃ এই শোকের সময় তাঁহার কর্ম্মত্যাগ করিলে পাছে নিন্দার ভাজন হই, এই আশঙ্কায় এ ভাব অপ্রকাশ রাখিলাম। কয়েকদিন পরে আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ডাকাইয়া দেওয়ানী পদ দিলেন, এবং সম্মানসূচক এক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। বুঝিলাম যে, তিনি নিতান্ত হতবুদ্ধি হইয়াছেন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থায় আমার অতীব মনঃক্লেশ হইতে লাগিল। কয়েকদিন পরে কয়েকজন আত্মীয়ের সহিত আমি বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় মহারাজা হঠাৎ তথায় আগমন করিলেন, এবং আমার মনোবেদনা দূর করিবার নিমিত্ত অনেক সস্নেহ বাক্য বলিলেন। আর, গমনকালে আমাকে পরদিবস রাজবাটী যাইতে গাঢ় অনুরোধ করিয়া গেলেন। আমি তাঁহার শোকবিহ্বল ভাব দর্শনে যারপরনাই ব্যথিতহৃদয় হইলাম। আহা! তাঁহার এ শোচনীয় অবস্থা বহুদিন দর্শন করিতে হইল না। তিনি কয়েকমাস পরেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমার জ্যেষ্ঠপুত্র দেওয়ান

প্রথমে রাজার শোকের জন্য, ও পরে তাঁহার পীড়ার জন্য আমি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারি নাই। এক্ষণে কুমার সতীশচন্দ্র রাজা হইলে, তাঁহার সম্পত্তির সমস্ত কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল। আমি একপ্রকার তাঁহার অভিভাবক হইলাম। যে সময় রাজা শ্রীশচন্দ্র আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহার রাণীও আমার প্রতি অসন্তুষ্টা হন।

রাজা সতীশচন্দ্রের রাজ্যভার গ্রহণ

কৌলীন্য প্রণালীতে আমাদের দেশের কতই অহিত হইতেছে। পাত্র-পাত্রী উভয় কুলের সদৃশ অবস্থা হইলে আদানপ্রদান যে সুখের হয়, উভয় কুলের অসদৃশ অবস্থা হইলে তাহা সেরূপ সুখের হয় না। প্রায় দেশেই রাজকুমারের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে। কুলমর্য্যাদা সৃষ্টির পূর্ব্বে এ দেশেও ঐরূপ প্রথা ছিল। ইদানীং কৌলীন্য বা সিদ্ধশ্রোত্রিয়তা রক্ষার্থ অথবা মানবৃদ্ধি করণার্থ, সাধ্যাতীত না হইলে দুহিতাকে কুলীনে সম্প্রদান করিতেই হইবেক। কুলীন শ্রেণীর প্রায় অনেকেই ধনবান নহেন। সুতরাং ধনীর পুত্রের ধনীর কন্যা লাভের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। দরিদ্রপুত্র রাজ-জামাতা ও দরিদ্রদুহিতা রাজরাণী হন। উভয় বৈবাহিক তুল্যাবস্থাপন্ন না হওয়াতে একজন আশ্রয়, অপর জন আশ্রিত, একজন অনুগ্রাহক, অন্যজন অনুগৃহীত হন। ইহাতে বৈবাহিক বা দাম্পত্য সুখের সম্ভাবনা কিরূপে হইবে?

কৌলীন্যে অহিত

পূর্ব্বোক্ত মহারাণী পূর্ব্বে আমাকে বলিতেন, "আমার তিনটি পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ তুমি, অন্য দুইটি তোমার কনিষ্ঠ ও বালক। অতএব যাহাতে তাহাদের বিষয় বজায় থাকে, তাহা তোমার করিতে হইবে।" তখন তাঁহার কথামত মনের ভাব কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ উপস্থিত ছিল না। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি পূর্ব্বে যত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই আন্তরিক নহে। যাহা হউক, সতীশচন্দ্রের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার কিছুদিন পরে তাঁহাকে আমি কহিলাম যে, "এক্ষণে আপনার মাতাঠাকুরাণী আপনার অভিভাবিকা। তাঁহার শ্রদ্ধা আর আমার উপর নাই। যখন

রাণীর মৌখিক স্নেহ

শ্রদ্ধা গিয়াছে, তখন বিশ্বাসও গিয়াছে। আমি অনেক দিবসাবধি স্থানান্তরে যাইবার মানস করিয়াছি, কিন্তু আপনাদের বিপদের নিমিত্ত যাইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনার আর কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দিন।" রাজা ছলছল নয়নে উত্তর করিলেন যে, "তাঁহার শ্রদ্ধা থাকুক আর না থাকুক, আমার ত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, তবে কেন যাইবেন ?" আমি তাঁহার ভাব দর্শনে সে দিন আর কিছু বলিতে পারিলাম না। পর-দিবস রাজমাতা আমাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই, ইহা তোমার সম্পূর্ণ ভুল," ইহা বলিয়া কতক-গুলি ভর্ৎসনা করিলেন। তাঁহার কথায় আমার মনোব্যথার কিছুমাত্র শান্তি হইল না, তবে তাঁহার পুত্রের ভক্তি ও স্নেহানুরোধে রাজবাটী ছাড়িতে পারিলাম না।

রাজার ঋণ শোধ

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র টাকা ঋণ করিয়া যান। বর্ত্তমান মহারাজাকে প্রথমে সেই দায় হইতে মুক্ত করিতে আমার বিশেষ যত্ন হইল। ইঁহাকে পৈতৃক পদবী দেওয়াইতে কিছুই প্রয়াস পাইতে হয় নাই, স্বর্গীয় রাজা তাহার পথ মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র অনায়াসেই তাহা পাইলেন। রাজা পৈতৃক ঋণজাল হইতে যে এত শীঘ্র মুক্ত হইবেন, ইহা কেহই ভাবেন নাই। কিন্তু এ দায় এত অল্পকাল মধ্যে তিরোহিত হইল যে, সকলেই তাহাতে চমৎকৃত হইলেন। ইহাতে যে আমার একটা বাহাত্নরী ছিল, তাহা নহে। আন্তরিক নিঃস্বার্থ-যত্ন থাকিলে প্রায় সকল সম্ভাবিত অভীষ্টই সুসিদ্ধ হয়। অদ্যাপি আমার বেতন পঞ্চাশ টাকা ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশচন্দ্র বেতন বৃদ্ধি না করিয়া প্রথম বৎসরের তিন মাসে এক শত পঞ্চাশ টাকা, ও দ্বিতীয় বৎসরে ছয় শত টাকা অন্য বিষয়ে দেন। সুতরাং বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকাই অবধারিত থাকে। তৃতীয় বৎসরে তাঁহার পুত্রের পীড়া, চতুর্থ বৎসরে তাঁহার পুত্রশোক ও নিজের পীড়া প্রযুক্ত বেতন-বৃদ্ধির বিষয় উত্থাপন করিতে পারি নাই। এ সমস্ত বিষয়ই সতীশচন্দ্র জানিতেন। সুতরাং তিনি রাজা হইয়া আমার বেতন বৃদ্ধি

করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ বেতন বৃদ্ধির কথা বাহিরে প্রকাশ ছিল না। সুতরাং আপাততঃ এক শত টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হইল। সকলে ভাবিতে পারেন যে, আমি রাজাকে বালক পাইয়া আপনার বেতন একেবারে দ্বিগুণ করিয়া লইয়াছি; এই আশঙ্কায় পূর্ব্বমত বেতনই লইতে লাগিলাম। প্রায় দুই বৎসর পরে যখন রাজার ঋণ প্রায় পরিশোধিত হইল, তখন এক শত টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া লইলাম।

বেতন বৃদ্ধি

রাজার ঋণ পরিশোধে যেমন যত্ন করিয়াছিলাম, তাঁহার আয় বৃদ্ধি করিতেও তেমনই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ৪।৫ বৎসরের মধ্যে ১২।১৩ হাজার টাকা জমিদারীর কর বৃদ্ধি হইল। রাজসংসারের যেমন অবনতি ছিল, তেমনই উন্নতি হইতে লাগিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, "পূর্ব্ব রাজার সময়েও তুমি রাজসংসারে ছিলে, তবে ইহার দুর্দ্দশা কেন হইয়াছিল?" তাহার উত্তর এই যে, এ রাজা আমাকে যাদৃশ ক্ষমতা দিয়াছিলেন, সে রাজা আমাকে তাদৃশ ক্ষমতা দেন নাই। আর ইনি যেরূপ আমারই প্রতি নির্ভর করিয়াছিলেন, তিনি সেরূপ করেন নাই। যদিও এ রাজাকে বিষয়কার্য্যে আবিষ্ট করিতে পারি নাই, তথাপি বিষয়ের কোন হানি হয় নাই। কারণ, তিনি আমার কোন উপদেশ হেলন করিতেন না। এবং যাহা করিতাম, তাহাই স্থিরতর রাখিতেন। এক্ষণে আমি সন্তোষের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলাম।

রাজসম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি

যখন প্রথমে ইন্‌কম্‌ট্যাক্স স্থাপিত হয়, সেই সময় এ জেলার তৎকালীন কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট সর উইলিয়ম হারসেল সাহেব আমাকে কৃষ্ণনগরের আসেসরি কর্ম্ম দিবার জন্য রাজার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তাঁহাকে কহেন যে, "দেওয়ানকে আমি এক শত টাকা বেতন দিই, আসেসরিতে তাঁহার তিন শত টাকা বেতন হইতেছে; সুতরাং আমার কর্ম্মে থাকিলে তাঁহার অনেক ক্ষতি হইবে। কিন্তু তিনি যাইলে আমার অনেক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা।" হারসেল কহিলেন যে, "তোমার দেওয়ানের মত

ইন্‌কম্‌ট্যাক্স আসেসরিতে অস্বীকার

সকলের শ্রদ্ধাস্পদ লোক আমি আর পাইতেছি না। তোমার দেওয়ানকে এই কর্ম্ম দিতে সকলেই বলিতেছেন। এমন কি, এখানকার সদরআলা, যাঁহার মুখে কাহারও প্রশংসা শুনা যায় না, তিনিও দেওয়ানের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার এ কর্ম্মও থাকে, ও কর্ম্মও হয় তাহারই জন্য কমিশনরকে লিখিব।" যদিও সাহেব নানা যুক্তি দেখাইয়া এ বিষয় কমিশনর সাহেবকে লিখিলেন, কিন্তু কমিশনর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তিনি হারসেল সাহেবকে লিখিলেন যে, রাজার কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে, গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। রাজা নিজে বিষয়কার্য্যদক্ষ হন নাই, সুতরাং আমার অভাবে তাঁহার বিস্তর অনিষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়া আসেসরি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার যে কয়েকটি ভুলের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহার উপর আর একটি বাড়িল। যাহা হউক সে সময়ের ধনের অভাবের কোন কষ্ট ছিল না ও মনেরও কোনরূপ অসুখ হইত না। আমাকে রাজা পূর্ব্বে যেরূপ মান্য করিতেন এক্ষণেও সেইরূপ ভাব ছিল, দাসত্বের কষ্ট কিছুই ছিল না। কেননা নিজের কর্ম্মই করিতেছি এরূপ বোধ হইত। রাজবাটীতে যাহার মনে যাহা থাকুক, বাহ্যের কাহারও বৈরিতা ছিল না বরং সকলেই আমাকে সন্তুষ্ট করিত।

রাজার সাহায্য

রাজা এক শত টাকার উপর আমার আর বেতন বৃদ্ধি করেন নাই বটে, কিন্তু আমার পূর্ব্বেকার যে ঋণ ছিল, তাহা সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নানাবিধ পারিতোষিক প্রদান করিতেন। আর আমার সন্তোষ সাধনের জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন, এবং আমার আত্মীয়গণকে লইয়া সতত আহ্লাদ আমোদ করিতেন।

নূতন বন্ধু লাভ

পুরাতন বান্ধবের অতিরিক্ত সে সময় আমার কয়েকজন নূতন বন্ধুলাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হয়।

দীনবন্ধু মিত্র

এই সময়টি আমার বড় সুখের হইয়াছিল। যেন সুখসাগরে নিরন্তর সন্তরণ করিতেছিলাম। "সুখান্তে দুঃখের ভার বহিতে হবে" ইহা মনের নিকটেও

আসিতে পারিত না। বিষয়কার্য্যের সময়েও আমোদের ভঙ্গ হইত না। প্রাতে যখন রাজা চা সেবন করিতেন, ও রামতনুবাবু প্রভৃতি অনেক সুহৃদ্বর থাকিতেন, সেই সময় আমি রাজার নিকট বসিয়া চা খাইতাম, এবং বিষয়কার্য্যের কথা কহিতাম ; কখন বা আত্মীয়দিগের সহিত আলাপ করিতাম। কার্য্যও চলিত, অথচ আমোদও হইত।

একদা আমার আত্মীয় বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট উকীল আমাকে লিখিলেন যে, নবাব নাজিমের দেওয়ান রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর আপনাকে নায়েব দেওয়ানী পদ দিতে ইচ্ছা করেন। যদি আপনার অনুমতি পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনার সম্মতি জানাই। এমন সম্মানীয় ও দুর্লভ কর্ম্ম আমার মত অল্পপরিচিত লোককে এই দেব বাহাদুর কেন দিতে চাহেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, শ্যামবাবুর পত্রের উত্তর দিলাম যে, "পূজার সময়ের আর বিলম্ব নাই, অতএব তুমি বাটী আসিলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করিব।" কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, উক্ত দেওয়ান মুরসিদাবাদ হইতে ডাকযোগে কলিকাতায় গমনকালে গোয়াড়ীর ডাকঘরে যখন বিশ্রাম করেন, সে সময় আমার বাটী কত দূর কোন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হইল, আমার আত্মীয়ের প্রস্তাব অমূলক নহে। পূজার পর শ্যামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাজা বাহাদুরের অনেক আত্মীয় বন্ধু অবশ্যই আছেন, তাঁহাদিগকে এরূপ উচ্চ পদ না দিবার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সকলই কলিকাতাবাসী, ইনি কলিকাতার কোন লোককে নেজামতে আনিতে চাহেন না। ইংরেজী ও পারস্য জ্ঞাত থাকেন ও সচ্চরিত্র হন, এমনই একটি মফঃস্বলের লোককে ঐ কর্ম্ম দিতে চাহেন। আমি আপনার পরিচয় দেওয়াতে কহিলেন, বেশ, তাঁহার সহিত আপনার আলাপ আছে, আচ্ছা, তাঁহাকে এখানে আসিতে লিখুন। আপনার পত্র পাইতে বিলম্ব হওয়াতে তিনি

নবাব নাজিমের নায়েব দেওয়ানী পদ গ্রহণে অসম্মতি

আমাকে কহিয়াছেন যে, যদি তিনি কর্ম্ম স্বীকার করেন, তবে পূজার পর আপনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আমার নিকট যাইবেন। শ্যামের কথা সাঙ্গ হইলে, আমি কহিলাম, ভাই! আমার বোধ হইতেছে, তিনি চালাক লোককে ভয় করেন, এ কারণ সাদাসিদা লোক চাহেন। তাঁহার নিকট ধর্ম্মের বড় আদর নাই। সুতরাং আমি তাঁহার সহকারী হইতে সাহস করি না। আমার সহিত সুহৃদ্ভাব অধিক কাল থাকিবার সম্ভাবনা নহে। এ কর্ম্ম গ্রহণ না করায় বিবেচনা কি অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার জন্য আমার কখন অনুতাপ হয় নাই।

লালগোলার জমিদারের দেওয়ানী পদ অস্বীকার

এক বর্ষ পরে আবার উপরিউক্ত সুহৃদ্বর মুরসিদাবাদ জেলার লালগোলার জমিদারের দেওয়ানীর প্রস্তাব করিয়া আমাকে এইরূপ লিখেন যে, উক্ত জমিদার আপনাকে আপাততঃ তিন শত টাকা বেতনে নিযুক্ত করিবেন, এবং এক বৎসর আপনার কার্য্য-পরিচালন দেখিয়া আর দুই শত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আপনি একবার সেখানে আসিবেন। যদি কর্ম্ম মনোমত হয়, গ্রহণ করিবেন; নচেৎ ফিরিয়া যাইবেন। আপনার গমনাগমনের সমস্ত ব্যয়ের টাকা তিনি দিবেন। এই পত্র যৎকালে আইসে, তৎকালে আমি কলিকাতায় ছিলাম। মহারাজা ঐ পত্র খোলেন, এবং তাহা পাঠ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হন। আমি প্রত্যাগত হইলে, ঐ পত্রের প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন যে, আপনি আমার লাভের নিমিত্ত নিজের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন। কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমি আপনাকে দুই শত টাকার বেতনের অধিক দিতে পারি না। সুতরাং, আমি আর আপনাকে কিরূপে রাখিতে পারি? রাজার কাতর ভাব দর্শনে আমি কহিলাম যে, "আমার সমৃদ্ধিশালীর ন্যায় চলিবার অথবা ধনসঞ্চয় করিবার ইচ্ছা নাই। ভদ্রলোকের মত চলিতে পারিলেই আমার বাসনা পূর্ণ হইবে। অতএব আমি মাসিক দুই শত টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিব।"

সতরঞ্চ খেলার যে চালে পরিশেষে মাৎ হইতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে

জানিতে পারিলে, কেহই সে চাল চালিত না। জয়লাভ আশাতেই সকল চাল চলিয়া থাকে। পরে যখন ঐ চালের দোষে বাজী হার হয়, তখন মনে হয়, হায়! এ চাল কেন চালিয়াছিলাম। আমার এক্ষণে ঠিক সেই দশা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছি, ভবিষ্যতের দিকে নেত্রপাত করি নাই। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, দূরদেশে যাইলে ও নূতন সম্প্রদায়ে পড়িলে ধনলাভ হইবে বটে, কিন্তু সুখের ন্যূনতা হইয়া যাইবে। পুত্র কয়েকটি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। যদিও রাজবাটী হইতে পেন্‌শেন্ পাইবার সম্ভাবনা বা স্থিরতা নাই, তথাপি পুত্র কৃতী হইলে সে অভাব মোচন হইবে। সুতরাং আমি দীর্ঘজীবী হইলেও ভবিষ্যতে অর্থাভাবে আমার কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে এইরূপ বিবেচনা করিয়াই লাল-গোলার কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম না। ভাবী কাল অন্ধকারময়। তাহার মধ্যে বিচরণ করিতে, কাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা কেহই নিশ্চয়ই অবধারণ করিতে পারেন না। কেহ বা নিরাপদে উত্তীর্ণ হন; কেহ বা প্রতিপাদক্ষেপে পতিত হন, আবার উত্থান করেন, আর কেহ বা পড়িয়া আর উঠিতে পারেন না। সুতরাং আমি যে কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইলে আমার আর বর্ত্তমান কষ্ট হইত না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তনয়দিগের কৃতী হইবার যে আশা করিয়াছিলাম তাহা পূর্ণ হইয়াছে, তবে ধনসমাগম আশা পূর্ণ না হওয়াতেই আমার এই ক্লেশভোগ হইতেছে। এ আশা অনেকেরই সফল হইয়া থাকে। সুতরাং আমার যে এ আশা নিতান্ত দুরাশা হইয়াছিল, তাহা নহে। সমান-অবস্থাপন্ন হইয়াও মনোরথ পূর্ণ করণে কেহ বা সক্ষম হয়, কেহ বা অক্ষম হয়। তুল্যাবস্থান্বিত লোকের কথা দূরে থাকুক, একজন অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া সৌভাগ্যের মুখ দর্শন করিতে পায় না; আর একজন যৎসামান্য বুদ্ধি ও ক্ষমতা সত্ত্বেও অনায়াসে সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠে। এই কারণেই ভাগ্যের ফলাফলের কথা প্রবাদিত হইয়াছে। যেহেতুক যখন কোন বিষয়ের কারণ নির্ব্বাদিত হইয়া

সংসারযাত্রা ও সতরঞ্চ ক্রীড়ার তুলনা

মনুষ্য-ভাগ্য

উঠে না, তখনি সে বিষয় অলৌকিক সংঘটনার মধ্যে পরিগণিত হয়।

সংক্রামক (ম্যালেরিয়া) জ্বর

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সংক্রামক জ্বর কৃষ্ণনগরে দেখা দেয় তাহা প্রথমে যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে দৃষ্ট হয়। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক স্থান উৎসন্ন দিয়া ১৮৩২ কি ৩৩ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গদখালি গ্রামে প্রবেশ করে। সেখান হইতে বহুসংখ্যক গ্রামের মধ্য দিয়া ১২৬৯ বাঃ অব্দে এ নগরের বারুইপাড়া পল্লীতে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় বৎসর অন্য অন্য পাড়ায় দেখা দেয়। আমার বাটীতে ১২৭১ বাঃ অব্দে প্রবিষ্ট হয়। সমস্ত পরিবার পুনঃ পুনঃ পীড়িত হওয়াতে দ্বিতীয় বৎসর কার্ত্তিক* মাসে বাটী ত্যাগ করিয়া গোয়াড়ীর মালোপাড়ার সন্নিহিত একটি বাটীতে অবস্থান করি। সেখানে যাইয়া পরিবারের অনেকেই সুস্থ হন। কিন্তু আমার রোগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমার জ্বর

বায়ু-পরিবর্ত্তনে নিস্ক্রমণ

শেষে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথমে শান্তিপুর যাইয়া ১৫ দিবস থাকি। সেখানেও কোন প্রতিকার বোধ না হওয়াতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। প্রথমে তিন দিন বর্দ্ধমানে থাকি ও পরে ভাগলপুরে যাইয়া অবস্থিত হই। ১২৭২ অব্দের ২১শে মাঘ শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া ২৬শে ভাগলপুরে উপনীত হই। ডাক্তার কালীবাবু ও আমার অগ্রজ মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার অরুচি অক্ষুধা এতাধিক প্রবল ছিল যে, ভাগলপুর পৌঁছিয়া প্রথম দিন অর্দ্ধ পোয়া দুগ্ধ মাত্র পান করি। কিন্তু সে প্রদেশের জলবায়ুর এমনি গুণ যে, সপ্তাহ মধ্যে আমার আহার ও বলবৃদ্ধি হইল ও পঞ্চদশ দিবসে আমি এক পোয়া পথ ভ্রমণ করিতে পারিলাম। এখানে চিকিৎসকেরা আমার আয়ু শেষ হইয়াছে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মনে কিছুমাত্র সে আশঙ্কা হয় নাই। আমার মনে ছিল যে, অরুচিকে দমন করিতে পারিলেই জ্বরে কোন অনিষ্ট হইবে না।

বর্দ্ধমান

ভাগলপুর

আহার করিতে পারিলেই বল হইবে ও বল পাইলেই জ্বর যাইবে।

কিন্তু বৎসরাবধি যে দুর্জ্জয় জ্বর মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে তাহাকে সহসা দূরীভূত করা সহজ নহে। সপ্তদশ দিবসে জ্বর পুনরায় বল প্রকাশ করিল। এই জ্বরের সংবাদ পাইয়া মহারাজা ২৩শে ফাল্গুন ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে আমাকে এলাহাবাদে লইয়া গেলেন। এই সংক্রামক জ্বরের যন্ত্রণায় রামতনুবাবু ইহার পূর্ব্ব হইতে ভাগলপুরে ছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গী হইলেন। তৃতীয় দিবসের প্রত্যূষে আমরা এলাহাবাদে উপনীত হইলাম। মহারাজা খোসরোবাগ নামে এক রমণীয় উদ্যানে আমাদিগকে লইয়া গেলেন এবং তন্মধ্যস্থ একটি উচ্চ মণ্ডপে আমাকে তুলিলেন।

এলাহাবাদ

খোসরোবাগ

সে সময় অরুণকিরণের আভায় উদ্যানের যেমন শোভা হইয়াছিল, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে তেমনি চতুর্দ্দিক সুস্নিগ্ধ হইয়াছিল। আমার শরীরের ও মনের এতদূর স্ফূর্ত্তি হইল, যেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। হৃদয়ের উল্লাসে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমার রচনা-মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি" এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি গাইতে লাগিলাম। তথায় দুই ঘণ্টা থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। দুই দিন পরে মহারাজা আমাকে আগ্রায় ও দিল্লীতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু গতদিবস হইতে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়াতে যাওয়া ঘটিল না।

মহারাজা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন, রামতনুবাবু ও আমি একটি দ্বিতল বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার ক্ষুধা ও বল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতানিবাসী তৎকালীন ঐ নগরবাসী বাবু নীলকমল মিত্র আমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাদের রামদাস খাঁ ভায়া ও হরিশচন্দ্র সরকার তৎকালে ঐখানে কর্ম্ম করিতেন। আমরা তাঁহাদের বাসায় আহারাদি করিতাম। তাঁহারা উভয়ই আমাদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে যারপরনাই যত্ন করেন। রৌদ্র বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা সেখান হইতে প্রস্থান

করিলাম। রামতনুবাবু ভাগলপুরে রহিলেন। আমি কলিকাতায় আসিলাম। এখানে কখন বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে,

কলিকাতা

কখন সাঁতরাগাছির বাবু মথুরামোহন ভাদুড়ীর বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। ইহার ৮ কি ৯ বৎসর পূর্ব্বে এই মথুরামোহন ভাদুড়ী, সদানন্দ চৌধুরী এবং বিহারীলাল ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার আলাপ হয় এবং অনতিবিলম্বে বিশেষ প্রণয় জন্মে। ইহারা আমাকে যেমন শ্রদ্ধা করেন তেমনি ভাল-বাসেন। ইহাদের ন্যায় অকপট আত্মীয় অতি দুর্লভ। আমার পীড়িত অবস্থায় ইহারা যে স্নেহের সহিত আমাকে সুস্থ করিবার যত্ন করিয়াছেন তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। ডাক্তারেরা আমাকে আগামী পৌষ মাস পর্য্যন্ত বাটী আসিতে নিষেধ করেন। কারণ, যদিও রোগের প্রায় শান্তি হইয়াছিল কিন্তু যেমন কৃশ তেমনি দুর্ব্বল ছিলাম। তথাপি রাজবাটীর কোন বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে বাটী

বাটী প্রত্যাগমন

আসিতে হইল। আষাঢ় মাসের দশম দিবসে বাটীতে প্রত্যাগত হইলাম। মহারাজা আমার প্রত্যাবর্ত্তন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র আমাকে দেখিতে আসিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজবাটী লইয়া গেলেন। কাহারও প্রিয়তম পুত্র কালকবল হইতে মুক্তি পাইলে সে যেমন আহ্লাদিত হয়, তিনি, আমি সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসাতে তেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

আমাদের এ প্রদেশে ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ স্ত্রীপুরুষ জন্মেন, তাহার পর আর সেরূপ স্ত্রীপুরুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই। পরপুরুষের আহার,

পরপুরুষের বীর্য্যহীনতা

বল, সাহস সকলই পূর্ব্বপুরুষদের হইতে ন্যূন হয়। যাহাদের যত পরে জন্ম হইতে লাগিল, তাহাদের সেই পরিমাণে ঐসকল হ্রাস হইয়া গেল। এইসকল বিষয়ে পিতার মত অগ্রজ হইতে পারেন নাই। আবার আমি অগ্রজের মত হইতে পারি নাই। এইরূপ যিনি যত বিলম্বে জন্মিতেছেন তিনি তত কৃশ, অল্প-আহারী ও দুর্ব্বল হইতেছেন। কেন দেশের এ দুর্দ্দশা হইল তাহার কোন কথাই পূর্ব্বে ছিল না। পরে যখন আমাদের বয়স্ক লোকদের বিবেচনা শক্তি হইল তখন এ বিষয়ের আন্দোলন

হইতে লাগিল। কেহ কেহ অনুমান করিতে লাগিলেন যে, বালকদের পূর্ব্বকার মত খেলাধূলা না থাকাতে ও লেখাপড়ায় মানসিক শ্রম অধিক হওয়াতে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছে। কেহ বা বোধ করিলেন যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি গব্যরস ইদানীং দুর্ম্মূল্য হওয়াতে বালকেরা পুষ্টিকর ও বলকর আহার পায় না বলিয়া দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। এইরূপ নানা বিবেচক নানাপ্রকার কারণ অনুভব করিতেন। কিন্তু ইদানীং সংক্রামক জ্বরের উৎপত্তির কারণ এক স্থানে যেরূপ অনুমতি হয় স্থানান্তরে তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। সেইরূপ উপরিউক্ত বিষয়েও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইত না। যেহেতুক যদি মানসিক পরিশ্রমে স্কুলের বালকদের এই অবস্থা হইয়া থাকে তবে যেসকল গ্রামের বা পরিবারের বালকেরা মোটে লেখাপড়া করে না তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন হয়? আর তেজস্কর আহার অভাবে ক্ষীণাবস্থা হইলে, ধনাঢ্য ব্যক্তিবৃন্দের বালকেরা কেন দুর্ব্বল হইয়া থাকে?

সংক্রামক (ম্যালেরিয়া) জ্বরের উৎপত্তির কারণ

আমার বোধ হয়, যে কারণেই হউক আমাদের দেশে যে সময় ক্ষুধার ও আহারের অল্পতা ও দৌর্ব্বল্যের প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় এই সংক্রামক জ্বরের বীজ জন্মিয়াছে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ শাখাপল্লব সহিত বর্দ্ধিত হয় ও শেষে ফুল-ফল ধারণ করে, সেইরূপ ঐ বীজ হইতে অক্ষুধা ও দৌর্ব্বল্য জন্মিয়া এখানে জ্বরে পরিণত হইয়াছে। ৮০।৯০ বৎসর হইতে কেবল আমাদের ক্ষুধা ও বল প্রভৃতি বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এমত নহে। আমাদের ধাতুরও বিকৃতি জন্মিয়াছে। আমাদের বাল্যাবস্থায় বৃদ্ধরা কহিতেন যে, পূর্ব্বে বিকার রোগে যে ঔষধ ব্যবস্থা হইত তাহা এক্ষণে সামান্য জ্বরে প্রয়োগ করিলেও সেরূপ ফলোদয় হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের ভূমিগত কোন দোষের বীজ বহুদিন পূর্ব্বে জন্মিয়াছে। হঠাৎ এ দোষের সৃষ্টি হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। আর দোষের কারণ ভূমির উপরে রহিয়াছে তাহাও অনুমানে আইসে না। এ দোষ ভূমির নিম্নস্থানে জন্মিয়াছে। তাহা না হইলে কোন বর্ত্মের একপার্শ্বস্থ

মৃত্তিকায় ম্যালেরিয়া

সকল গৃহে এ পীড়া ধরিয়াছে, অপরপার্শ্বস্থিত কোন গৃহে দৃষ্ট হয় না। উভয়পার্শ্বস্থ লোকের আহার-ব্যবহারে কোন বিষয়ে বিভিন্নতা নাই। এই গোয়াড়ীর সাহেবেরা যে দিকে অবস্থিত সেদিক যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিষ্কার, আর যে দিকে বাঙ্গালীরা থাকেন সেদিক যেমন অপ্রশস্ত তেমনি অপরিষ্কার। আর সাহেবেরা যেরূপ স্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকেন বাঙ্গালীরা তেমনি অস্বাস্থ্যজনক অবস্থায় থাকেন। তবে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা এই সাহেবদের পীডা অধিক হইতেছে কেন ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বয়স ৪৬ হইতে ৫০ বৎসর

শূলরোগ

আমি বহু আয়াস ও ব্যয় করিয়া জ্বরের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম বটে, কিন্তু অধিক কাল স্বাস্থ্যসুখভোগ করিতে পারিলাম না। ১২৭৩ বাঃ অব্দের ১২ই অগ্রহায়ণে শূলরোগগ্রস্ত হইলাম। এতাধিক যন্ত্রণা হইল যে, আত্মহত্যার ইচ্ছা হইতে লাগিল। প্রায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই তুর্জ্জয় পীড়াতে মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা পাই। এই বোগগ্রস্ত কেহ কেহ যে কি জন্য আত্মহত্যা কবিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহার যন্ত্রণা সহ্য করা অতীব তুষ্কর। কত প্রকার ঔষধ সেবন করিলাম কিন্তু কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না। শেষে দৈনিক অহিফেন সেবন অভ্যাস করাতে এ যন্ত্রণা দূর হইল। বিধাতা যেমন রোগ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি তাহার ঔষধও দিয়াছেন। অহিফেনে আমার অম্লরোগ পর্য্যন্ত দূরীভূত হইল। এই রোগ পিতামহের, পিতার ও অগ্রজের এবং কোন কোন ভগ্নীর ছিল। অহিফেন না থাকিলে বোধ হয় এ পীড়ার যাতনা সহ্য করিতে পারিতাম না। যখন বেদনা ধরিত তখন যতক্ষণ পরেই হউক শেষে অহিফেন সেবনে ইহার শান্তি হইবে এই বিশ্বাস থাকাতে, জীবন ধ্বংস না করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই যমযন্ত্রণা সহ্য করিতাম। বেদনা উপস্থিত হইলে, তুই জন তৈল-জল দিয়া আমার

বক্ষঃস্থল, উদর, পঞ্জর ও পৃষ্ঠদেশ বলপূর্ব্বক মর্দ্দন করিত। জল পান করিয়া পুনঃ পুনঃ বমন করিতাম। বমন করিতে করিতে যখন উদরমধ্য পরিষ্কৃত হইত তখন অহিফেন খাইতাম এবং এক ঘণ্টা পরেই রোগের আক্রমণ শিথিল হইয়া আসিত।

আমি পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া রাজবাটী যাইয়া দেখিলাম যে, আমার অপেক্ষায় অনেক কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। মহারাজা নিজে কোন্ বিষয় কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, বা অন্যের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। আমি সমীপস্থ হইবা-মাত্র সমস্ত চাবি কুঞ্জী আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। কিছুদিন পরে (১২৭২ বাঃ অব্দের ভাদ্র মাস) চারি শত টাকা মূল্যের এক স্বর্ণের ঘড়ি চেনসহিত উপঢৌকন-স্বরূপ দিলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ও স্নেহে বড়ই অনুগৃহীত ও প্রীত হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয় হইতে লাগিলাম। তিনি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল হইতেছিলেন। বিষয় ব্যাপারে আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক সম্বন্ধে সদুপদেশ দিলে বিরক্ত হইতেন। তাঁহার রাণী সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে ও আত্মীয়-স্বজন দ্বারা তাঁহাকে নিয়মাবদ্ধ করণার্থ বিস্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। রাজা শরীরের হানি যেরূপ করিতেছিলেন ইদানীং বিষয়ের হানিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে ঋণ করিতেন এবং যখন তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেন, তখন তাহা আমার পরিশোধ করিতে হইত। প্রত্যেক বার যখন তাঁহার ঋণ শোধ দেওয়া যাইত তিনি অঙ্গীকার করিতেন যে, আর কখন অধিক ব্যয় বা ঋণ করিবেন না। কিন্তু পরে তাহা মনে রাখিতেন না। তাঁহার এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্তের ন্যায় কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ কহিতাম যে, "আপনি এইরূপে চলিলে আপনার সম্পত্তি ক্রমশঃই ক্ষয় পাইবে, এবং আমাকেও কলঙ্ক-ভাজন হইয়া যাইতে হইবে।" তিনি যখনই এরূপ কথা শুনিতেন তখনি তাঁহার

রাজার শারীরিক অবনতি

পুনরায় ঋণ

চক্ষু ছলছল হইত এবং "ভবিষ্যতে যদি আর এইরূপ দেখেন তবে যাইবেন" এইরূপ বলিতেন। আমি প্রস্থান করিলেই তাঁহার বিষয় ছারখার হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় প্রায় দুই বৎসর কর্ম্ম ত্যাগ করিলাম না।

একদা কোন কথাপ্রসঙ্গে আমার কোন সহকারী কর্ম্মচারীকে কহিলাম যে, "আমার এখানে আর থাকা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না।"

সহকারী কর্ম্মচারীর অনিষ্টের চেষ্টা

যখন এই কথা বলি তখন আমি নিশ্চয় কর্ম্মত্যাগ করিব এরূপ স্থির করি নাই। তথাপি ঐ কর্ম্মচারী কি অভিসন্ধি করিয়া এই কথা রাজার কর্ণগোচর করিলেন। পরদিন রাজা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনি কি এই কথা বলিয়াছেন?" আমি উত্তর করিলাম যে, "এক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয় কিছু স্থির করি নাই। কিন্তু আমি আর আপনার অমঙ্গল দেখিতে পারি না। যদি আমা দ্বারা মঙ্গলসাধন না হয়, তবে আমার এখানে থাকা না থাকা তুল্য।" সে সময় তাঁহার মনের সহজাবস্থা ছিল না। একারণ আমি তখনই তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া কাছারিতে আসিলাম। কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার একজন আমলা আসিয়া আমাকে কহিল যে, "মহারাজা আপনাকে জানাইতে আদেশ করিলেন যে, যদি তাঁহার কার্য্য করিতে আপনার অনিচ্ছা হইয়া থাকে তবে আপনার নিকট যেসকল চাবি আছে তাহা আমাকে দেন।" আমি কহিলাম, "তুমি রাজার একখানি পত্র লইয়া আইস।" সে

কর্ম্মত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ

তৎক্ষণাৎ পত্র আনিল, এবং আমিও চাবি দিয়া বাটী আসিলাম। এবং তাঁহার যে দুই-চারিটা দ্রব্য আমার নিকট ছিল তাহা পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

শুনিতে লাগিলাম যে, আমি বিদায় হওয়াতে রাজা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং আক্ষেপ করিতেছেন। তৎকালে আমার অতি নিকট সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি রাজার নিজ ব্যয়ের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ৪ দিন পরে আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, "তোমার রাজবাটী যাইতে হইবে।" আমি যাইতে অসম্মত হওয়াতে কহিলেন

যে, "তুমি না যাইলে রাজা আহার করিবেন না।" এইরূপ অনেক কথার পরে আমি আর তাঁহার অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলাম না। আমি নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা আমার হস্তে সমস্ত চাবি দিলেন। তৎকালে বাহিরের কোন কোন লোক থাকাতে, আমি আর আমার মনের কথা কিছু বলিতে পারিলাম না। পরদিন রাজা নিজ অবিবেচনার কার্য্যের জন্য অনুতাপিত হইলেন এবং আত্মশোধনের প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমিও কর্ম্মে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম।'

রাজা যখন আমাকে তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করণে উদ্যত দেখিতেন তখনি পরিমিত-ব্যয়ী হইবার অঙ্গীকার করিতেন এবং অনতিবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতেন পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তথাপি যাঁহার শুভাশুভ হৃদয়ের শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাঁহার ইষ্টচিন্তা চিত্তবহির্ভূত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। একবার মনে করিতাম আর এখানে থাকা উচিত নহে, আবার ভাবিতাম আর কিঞ্চিৎকাল দেখিয়াই যাই। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে শেষে তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ স্থির করিয়া তাঁহাকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলাম যে, "আপনার সকল দিকেই অমঙ্গল দেখিতেছি। তাহার নিবারণের চেষ্টা যতদূর অধীন জনের দ্বারা হইতে পারে তাহা আমি করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। সুতরাং আমি বিদায় হইলাম। এক্ষণে পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন।" এই পত্রের সহিত কয়েকটি চাবিও পাঠাইলাম। শুনিলাম এই পত্র পাঠে প্রথমে রাগান্ধ হইয়া অতীব বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি আমাকে কৃতঘ্ন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। প্রধান কর্ম্মচারীরা ইহাতে বিলক্ষণ বাতাস দিতেছেন। আমার উপরিউক্ত স্বজনকে দেওয়ানী দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে দেওয়ান বলিয়া ডাকিতেছেন। ২।৩ দিন পরে শুনিতে লাগিলাম যে, তিনি আমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন এবং কখন কখন অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। সংসার কি ভয়ানক! আমারই স্বজন মহাশয় তাঁহাকে বুঝাইতেছেন যে, "আপনি কেন এত কাতর হইয়াছেন। কার্ত্তিক রায়

আবার কর্ম্মত্যাগ ও পুনর্নিয়োগ

ব্যতীত কি আর কর্ম্ম চলিবে না? যেখানে তিনি নাই সে-সংসারের কি কর্ম্ম চলিতেছে না? আপনি স্বচ্ছন্দে স্নান-ভোজন করুন। আমোদ-আহ্লাদ করুন। টাকা দিলে কত কার্ত্তিক রায় পাওয়া যাইবে।" আমার সহকারী বুদ্ধিমান লোক, তিনি দুই দিক বজায় করিয়া প্রবোধ দিয়াছেন। রাজার নিকট একরূপ বলিয়াছেন, আমার নিকট অন্যরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

৭।৮ দিবস পরে আমার জনৈক বন্ধু বাবু দ্বারকানাথ দে হঠাৎ আমার নিকট আসিয়া কর্ম্মত্যাগের বিষয়ে কোন কোন কথা বলিলেন এবং শেষে কালীবাবু ও পূর্ণবাবু আসিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার বোধ হইল তাঁহারা আমার কর্ম্মত্যাগের বিষয়ে কোন পবামর্শ করিয়াছেন অথবা তাঁহাদিগকে রাজা কিছু বলিয়াছেন। "বুঝি পূর্ণ ও কালী রাজবাটীতে আছেন" তিনি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন করিলেন। এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি, রাজা, কালী ও পূর্ণ আমার বাটীতে আসিলেন এবং সকলে একপ্রকার বলপূর্ব্বক আমাকে গাড়ীতে আরোহণ করাইলেন। যেমন কোন বালককে তাহার আত্মীয়-স্বজন ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমাকে লইয়া গেলেন। আমি কোন কথাই কহিতে পারিলাম না। গাড়ীতে যদিও রাজা পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন "আমি দেওয়ানকে কোনমতেই ছাড়িব না," কিন্তু আমি ভাবিতে লাগিলাম রাজবাটী যাই আর যা করি, রাজার কর্ম্ম আর করিব না। গাড়ী রাজবাটী পৌঁছিল এবং উপরে যাইয়া আমরা সকলে বসিলাম। গৃহমধ্যে যেন আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল। সকল চাকরেরই নয়নোৎফুল্ল ও হাস্যবদন দেখিলাম। সে সময় হৃদয়ে কতপ্রকার ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, যতই কেন হউক না, আমি আর ইহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইব না। আবার ভাবিলাম যে, যখন আমার আত্মীয়-বন্ধুরাও এখানে আমার পুনরাগমনে এত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, তখন আর এ মায়াবন্ধন কেমন করিয়া ছেদন করিব। শেষে সকল প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলাম। চাবি সমস্ত লইলাম এবং সকলের আমোদ-প্রমোদে মিশিয়া গেলাম। পরদিবস হইতে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করিতে লাগিলাম।

আহা! কি কথাই মহাজনে বলিয়াছেন, "ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ"।

ভয়ানক ঝড়

১২৭৪ বাঃ অব্দের কার্ত্তিক মাসের ১৪শ দিবসে ঝটিকা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৮শ দিবসের রজনী দুই প্রহরের সময় ভয়ানক আকার ধারণ করে এবং পরদিবস দশটা বেলা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ১২৭১ অব্দের ২৯শে আশ্বিনের ঝটিকায় যে ক্ষতি হইয়াছিল, প্রায় সেইরূপ ক্ষতি হইল। বাগানের অনেক বৃক্ষ পড়িয়া গেল। তৃণাচ্ছাদিত ঘর প্রায়ই পতিত হইয়াছিল। সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সাহায্য নিমিত্ত সার্কেট হৌসে জমিদার প্রভৃতি ধনবানদিগের এক সভা হইয়া চাঁদা হয়। কমিশনর চ্যাপম্যান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কমিশনর সাহেবের রাজার মঙ্গল-চেষ্টা

১২৭৪ অব্দের চৈত্র মাসে কমিশনর চ্যাপম্যান সাহেব মহারাজার অবস্থা দর্শনে অতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়া আমাকে সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সাহেবকে রাজার যথার্থ মঙ্গলাভিলাষী বুঝিয়া দুঃখবহ বৃত্তান্ত-সমূহ ব্যক্ত করিলাম। তিনি অতীব আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন যে, "এ যুবকের (রাজার) বিস্তর গুণ আছে। সাহেবদের সংসর্গে ইহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহা ইংরাজ জাতির আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয়। যাহা হউক, ইহার উদ্ধারের নিমিত্ত একবার বিশেষ যত্ন করিতে হইবেক।" শেষে আমার অনেক প্রশংসা করিয়া বিদায় করেন। তাঁহার যত্নে ও কৌশলে রাজার শারীরিক ও বৈষয়িক বিস্তর উন্নতি হয়। তাঁহার পদে অন্য কমিশনর আসিলে মহারাজা পূর্ব্বে যেমন ছিলেন আবার তেমনি হইলেন। এদিকে বৎসর মধ্যে তিনি ৩।৪ মাস কখন কলিকাতায়, কখন ফরাসডাঙ্গায়,

প্রভুভক্তি

কখন পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন। আমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তাঁহার সম্পত্তি অধিককাল থাকিবে না, এবং আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে তিনি দীর্ঘজীবী হইলেও তাঁহার আর্থিক কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা অল্প। আর তাঁহার শারীরিক অত্যাচারবশতঃ দীর্ঘায়ুরও প্রত্যাশা ছিল না। পরন্তু তাঁহার সন্তানলাভের আশাও

বিগত হইয়াছিল। অতএব তাঁহার ধনাভাব-জনিত কষ্ট আমায় দেখিতে না হয় এই চিন্তায় আমি কর্ম্মত্যাগ করিবার ইচ্ছা এককালে দূর করিলাম। ভাবিলাম সাধারণের নিন্দায় আমার তত কষ্ট হইবে না, যত কষ্ট মহারাজাকে দরিদ্রাবস্থায় দেখিলে হইবে।

সংক্রামক জ্বরে দেশের দুরবস্থা এত

পূর্ব্বে যে সংক্রামক জ্বরের কথা লিখিয়াছি এবং আমিও যে রোগে বহু কষ্ট পাইয়াছি, তাহার প্রাদুর্ভাব ১২৭২ বাঃ অব্দ পর্য্যন্ত অতীব প্রবল থাকে। ইহাতে নগরের প্রায় তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া যায়। কত বিস্তৃত পরিবার নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে। কত দুর্ভাগা পুরুষ বহু পরিবারের স্বামী হইয়াও সন্ন্যাসীপ্রায় হইয়াছে। কত স্ত্রীলোক পতিপুত্রহীনা হইয়া অনাথিনী হইয়াছে। কত নারীর ক্রোড়ে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে অথচ নিজের অচৈতন্য বশতঃ জানিতে পারে নাই। কত উত্থানশক্তিরহিতা মৃতপ্রায়া জননী একাকিনী গভীর রজনীতে মৃত সন্তান বক্ষঃস্থলে লইয়া নিকটস্থ কোন নিভৃত স্থানে প্রক্ষেপ করিয়াছে। এবং পাছে কেহ জানিতে পারিলে তাহাকে যন্ত্রণা দেয় এজন্য বুক ফাটিয়া গিয়াছে তবু ক্রন্দন করে নাই। প্রতিবাসীর কথা দূরে থাকুক, সন্তান পিপাসায় অস্থির, তথাপি জনক-জননীর তাহাকে একটু জল দিবার সাধ্য হয় নাই। কত লোক গৃহমধ্যে বিগতজীবনে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সংবাদও পার্শ্বস্থ গৃহবাসীও জানিতে পারে নাই। কাঁদিয়া শোকের কিঞ্চিৎ আশু শান্তি করে এরূপ শক্তিও অনেকের ছিল না। ধনে জনে কিছুতেই কাহার বিশেষ সাহায্য হয় নাই। বাটীতে যে-ই আসিয়াছে সে-ই অচিরাৎ শয্যাগত হইয়াছে। সুতরাং ধনী-নির্ধন সকলেরই তুল্যাবস্থা হইয়াছিল। যাঁহারা নগর-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইয়াছিলেন। হায়! কালেতে কি না হয়। যে কৃষ্ণনগর কত বিদেশীয় মৃতপ্রায় রোগীর প্রাণদান করিয়াছে সেই নগর এক্ষণে নিজ ক্রোড়বাসীদের জীবন রক্ষা করিতে পারিল না।

পূর্ব্বলিখিত সংক্রামক জ্বরের বিক্রম ১২৭৩ বাঃ অব্দে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল এবং ধ্বংসাবশিষ্ট রোগীদের পীড়ার সাম্য হইতে লাগিল।

১২৭৪ অব্দে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যা ব্যতীত আর সকল পরিবারই রোগমুক্ত হইলেন। ১২৭৫ অব্দের শ্রাবণ মাসে জলবায়ু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত আমার স্ত্রী তনয়-তনয়া সহিত শান্তিপুরের এক দ্বিতল বাটীতে অবস্থিত হন। ২৯, ৩০ ও ৩১শে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতে থাকে। ৩২শের রাত্রে এতাধিক বারিবর্ষণ হইতে লাগিল যে, রাত্রি

মহাবৃষ্টি

দুই প্রহরের পর ছাতের এক স্থান দিয়া হুহু করিয়া সজোরে জল পড়িতে আরম্ভ হইল। আমার গৃহিণী ভয় পাইয়া সকলকে জাগ্রত করাইলেন এবং কিরূপে এ দায় হইতে নিস্তার পান তাহার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পার্শ্বস্থ এক কক্ষ পতিত হইল। আমার স্ত্রী, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীর এক ভ্রাতা, এক ভ্রাতুষ্পুত্র, এক ভ্রাতৃকন্যা এবং এক দাসী সকলেই ব্যস্ত হইয়া নিম্নতলায় আসিলেন। রজনী তখন তৃতীয় প্রহরেরও অধিক। সকলই স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা। কেবল দাস একজন পরিণত-বয়স্ক ছিল কিন্তু নির্ব্বোধ। যেমন নিবিড় অন্ধকার তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি, প্রাঙ্গণ জলপূর্ণ। বহির্গত না হইলে তখনি প্রাণ যায়, অথচ কোথায় যান তাহা কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন না। সুতরাং সকলেই অস্থিরচিত্ত হইলেন। শেষে নিকটস্থ ডাকঘর মনে পড়িল এবং তথায় যেমন উপস্থিত হইলেন অমনি বাসাবাটীর পতনশব্দ শুনিতে পাইলেন। আর ৫ মিনিট ঐ বাটীতে থাকিলে সকলের জীবনাবসান হইত। অবশিষ্ট যামিনী আর্দ্রবস্ত্রে ডাকঘরে যাপন করিয়া প্রত্যূষে সকলে গৃহিণীর পিত্রালয়ে আসিলেন। পরে সে বাটীও পতনোন্মুখ দেখিয়া শেষে মতিবাবুর বাটীতে আশ্রয় লইলেন, এবং পরদিন বাটী আসিলেন।

কখন দোষও গুণ হয়, তাহার এই ঘটনা বিলক্ষণ দৃষ্টান্তস্থল। আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভীরুপ্রকৃতি। তিনি যৎসামান্য কারণে বিপদাশঙ্কা করেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্বভাব ছিল বলিয়াই এই সঙ্কট হইতে সকলে রক্ষা পাইলেন। উৎকট বারিবর্ষণে ভীতা হইয়া জাগ্রতা না থাকিলে এবং অত উতলা না হইলে নিশ্চয় বিপদ ঘটিত। সে নিশায় প্রায় কেহই বাটীর বাহির হন নাই। অনেক অট্টালিকা নিপতিত হয়

এবং কোনও কোনও বাটীর সহিত কয়েক লোকেরও জীবন যায়। তৎকালীন অশীতি-বৎসরের বৃদ্ধগণও কহেন যে, তাঁহারা এরূপ ভয়ানক দৃশ্য কখন দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। কৃষ্ণনগরের নানা স্থান এতাধিক জলপূর্ণ হয় যে, অনেক রাস্তা কাটিয়া জলনির্গমের পথ করাতেও ৪।৫ দিন তথায় জলের অবস্থিতি হয় ও তদুপরিস্থিত সমুদয় মৃন্ময় গৃহ পড়িয়া যায় এবং অনেক বৃক্ষ পড়িয়া যায়।

১২৭৬ সালের ঝড়-বৃষ্টি

১২৭৬ বাঃ অব্দের ২৮শে আষাঢ় প্রাতঃকালে ঝড় আরম্ভ হইয়া বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। আর এই ঝটিকাব সঙ্গে ভয়ানক বৃষ্টিও থাকে। যদিও ইহা ১২৭১ অব্দের আশ্বিন মাসের ও ১২৭৪ অব্দের কার্ত্তিক মাসের ঝটিকার তুল্য ভয়ানক ও ক্ষতিজনক নহে, তথাপি অনেক বৃক্ষ ও গৃহ পতিত হওয়াতে লোকের বিস্তর অনিষ্ট হয়। যেমন কোন পরাক্রান্ত নিষ্ঠুর রাজা অন্যের রাজ্য উৎসন্ন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া পরাজিত দেশে পুনঃ পুনঃ হনন লুণ্ঠন ইত্যাদি বিবিধরূপ অত্যাচার করিয়া যায়, স্বভাব যেন সেইরূপ মানস করিয়া এ দেশকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। রোগ শোক ঝড়বৃষ্টি উৎপাতসকল উপর্য্যুপরি উপস্থিত হওয়াতে লোক অবসন্ন হইয়া উঠিল। এত অল্পকাল মধ্যে এত দুর্ঘটনা এ দেশে যে কখনও হইয়াছে ইহা শুনা যায় নাই।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, চ্যাপম্যান সাহেব দ্বারা মহারাজার যথেষ্ট মঙ্গল হয়, ও তাঁহার কমিশনরী পদ ত্যাগ করাতে পুনরায় পূর্ব্বমত অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। মহারাণী স্বামীর স্বাস্থ্যসাধনার্থ যারপরনাই চেষ্টা করেন। এবং এ বিষয়ে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুরের যথেষ্ট সাহায্য পান। মহারাজা প্রায় বৎসরাবধি উক্ত সাহেবের ভয়ে ইঁহাদের বাধ্য ছিলেন। ১২৭৫ বাঃ অব্দের ফাল্গুন মাস হইতে আবার স্বাধীনভাবে চলিতে লাগিলেন। এক্ষণে মহারাণীর ও যদুবাবুর ইষ্ট চেষ্টায় তাঁহার উপকার না হইয়া বরঞ্চ অপকার হইতে লাগিল। যদুবাবুর কর্ত্তৃত্ব তাঁহার অসহনীয় হইয়া উঠিল ও রাজবাটীতে থাকা তাঁহার যন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল। একারণ বৎসরের অধিকাংশ সময় বিদেশে যাপন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগকে এরূপ

খুঁচাখুঁচি করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতাম কিন্তু তাঁহারা আমার কথা শুনিতেন না। বরং রাজ্ঞী আমার প্রতি বিরক্তা হইতেন। তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইত যে, আমি বিশ্বস্তরূপে কর্ম্ম করাতে রাজা বিষয়-কার্য্যে মন দিতেন না। যাবৎ মহারাজা জীবিত ছিলেন তাবৎ তিনি আমাকে বিষনয়নে দেখিতেন।

রাণী প্রভৃতির রাজার মঙ্গল চেষ্টায় বিফল প্রয়াস

একবার মহারাণীর কটূক্তিতে আমি অত্যন্ত মনোবেদনা পাইয়া রাজাকে কহিলাম যে, "মহারাণী যেরূপ অপমানের কথা কখন কখন দাসীদ্বারা আমাকে কহিয়া পাঠান, তাহা কোন ভদ্রলোক সহ্য করিতে পারে না। তাঁহার কথার সমান উত্তর দিলে তাঁহার এবং আপনার অবমাননা হয়, এ কারণ এসকল অপমান সহ্য করিয়া থাকি। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই যে ইহা সহ্য করিব তাহা পারিব না। এবং আমার জন্য যে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীতে অসদ্ভাব ঘটে, ইহাও আমার ইচ্ছা নহে।" এই কথা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত বিষাদিত ও ব্যাকুলিত হইয়া আমাকে কহিলেন যে, "তাঁহার দোষে আমাকে ত্যাগ করিবেন না, যাহাতে আপনার এ কষ্ট আর সহ্য করিতে না হয় তাহার বিধান করিব।" আমি ইঁহাদের শুভ কি অশুভ আকাঙ্ক্ষী তাহা রাণী রাজার মৃত্যুর পর বুঝিতে পারিলেন।

গত বৎসর রাজা আষাঢ় মাসে স্থানান্তরে যান ; দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে আমি যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসি। এ বৎসর এলাহাবাদে তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। সেখান হইতে আগ্রায় যান। আমিও তাঁহার সঙ্গী হই। আগ্রায় দুই দিবস থাকিয়া কেল্লা ও মমতাজ-মহল দর্শন করি। যদিও মহারাজার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মনঃক্লেশ পাই, তথাপি ঐ দুই মহাকীর্ত্তি দর্শনে যারপরনাই আহ্লাদিত হই। কিন্তু ঐ দুই জগৎ-বিখ্যাত কাণ্ড একবার দেখিলে মনের সাধ মেটে না। সেখান হইতে এলাহাবাদ দিয়া পূজার অগ্রে পঞ্চমীর দিবস তিনি ও আমি রাজবাটী পৌঁছিলাম। ১২৭৭ অব্দের আষাঢ় মাসে মহারাজা পুনরায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন এবং মুসুরী পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থিত হইলেন। যাত্রাকালে

রাজার বিদেশ বাস

তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকাতে, যাহাতে তাঁহার যাওয়া না ঘটে তদ্বিষয় তদীয় আত্মীয়-স্বজন অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। রাণী ও যদুবাবু তাঁহার মঙ্গল-চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সুবিবেচনানুমত না হইলে অভিলষিত ফল দর্শে না, বরং কখন কখন বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে বলিতাম যে, "পরিণত-বয়স্ক পুত্রের কোন কু-অভ্যাস হইলে তাহার জনক-জননীও বলদ্বারা নিরাকৃত করিতে পারেন না। তোমরা যে একজন ৩০।৩২ বৎসরের ধনবান যুবকের কু-অভ্যাস বলে দূরীভূত করিবে অথবা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখিবে, এ আশা কখন পূর্ণ হইবে না। ইনি তোমাদের কর্ত্তৃত্ব অসহ্য বোধ করিয়া গৃহত্যাগী হইবেন এবং তাহা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য হইবে না। আর ইনি বাহিরে গেলে তোমাদের কোন বলই খাটিবে না। বাটী হইতে ধন না পান, যেখানে একটু কাগজ লিখিয়া দিবেন সেইখানেই প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইবেন এবং কোন ভৃত্য সঙ্গে না যায়, যেখানে ইচ্ছা করিবেন সেইখানে তাহা পাইবেন। তোমাদের এরূপ বলপ্রয়োগে বিপরীত ফল ফলিবে।" এরূপ কথায় মহারাণী বিরক্ত হইতেন ও যদুবাবু অমনোযোগ করিতেন। কিন্তু আমি যাহা বলিতাম তাহাই ঘটিল।

রাজার মুসুরী পর্ব্বতে অবস্থান

রাজা পূজার পূর্ব্বে আমাকে বারংবার লেখেন যে, "এবার আমি পূজার সময় কোনমতেই বাটী যাইব না। অতএব আপনি আমাকে লইতে আসিবেন না। আসিলেও আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। কার্ত্তিক মাস অষ্টমের সময় আমি নিশ্চয় বাটী প্রতিগমন করিব।" এদিকে রাণী রাজাকে আনিবার নিমিত্ত আমাকে মুসুরী যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতে লাগিলেন। আমি উত্তর করিলাম যে, "রাজা এবার যেরূপ বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন ও যেরূপ বারংবার লিখিতেছেন, তাহাতে যে আমি যাইলে তাঁহাকে আনিতে পারিব তাহা আমার বোধ হয় না। যখন আপনারা সকলে তাঁহাকে রাখিতে পারেন নাই, তখন যে একা আমার অনুরোধে আসিবেন ইহা কোনমতেই আমার বিবেচনায়

রাজার বাটী আসিতে অনিচ্ছা

আইসে না।” আমি তাঁহাকে আনিতে গেলাম না বটে, কিন্তু কৌশলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রাজাকে লিখিলাম যে, “গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি রাজস্বের পরিমাণ কর মহাল হইতে সংগৃহীত না হয়, তবে আমার দ্বারা বিষয় রক্ষা হইবার উপায় হইবে না। অতএব এ সময় আপনি রাজধানী না থাকিলে আপনার বিষয়ের ক্ষতি হইবে। আপনি রাজস্ব দিবার সময় রাজবাটী উপস্থিত না থাকিলে আমি আর আপনার কার্য্য করিতে পারিব না।” আমার এ কৌশলে কোন ফলোদয় হইল না। তিনি গোয়াড়ীর এক মহাজনকে এ বিষয় লেখাতে, মহাজন আসিয়া আমাকে কহিলেন যে, “রাজার রাজস্ব জন্য যে টাকা আবশ্যক হইবে তাহা আমি দিব।”

আমার অগ্রজ মহাশয় রাজার সঙ্গে ছিলেন। তিনি পূজার পর এক সহস্র টাকা সহিত আমাকে যাইতে লিখিলেন। ভাবিলাম রাজার প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় হইয়া থাকিবে। দুইদিন পরে ঐ বিষয়ে তিনি টেলিগ্রাফ করিলেন। আমি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পরদিবসই (১২৭৭।১ কার্ত্তিক) যাত্রা করিলাম। কয়েকদিন পরে সাহারামপুরে উত্তীর্ণ হইলাম।

আমার মুসুরী পর্ব্বতে গমন

তথা হইতে মুসুরী পর্ব্বত দৃষ্ট হইতে লাগিল। যদিও আমার চিত্ত গভীর চিন্তার্ণবে নিমগ্ন ছিল তথাপি ঐ প্রকাণ্ড গগনভেদী দৃশ্য দর্শনে মন যেন উন্নত হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! যেন ঐ শৈলশ্রেণী মহীমণ্ডলে বসিয়া গগনমণ্ডলকে মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। উপর্য্যুপরি কতই শৃঙ্গ শোভা পাইতেছে। শেখরস্থিত বাটীসকল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবিন্দুবৎ দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা পর্ব্বতপ্রদেশ কখন দেখেন নাই তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইবে যেন নবীন নীল নীরদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু শ্বেতমেঘের দর্শন হইতেছে। সুদূর হইতে ভূধরশ্রেণী বিশেষ মনোহর বোধ হইল না, কেবল বিস্ময়কর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যাহাই হউক, নয়নসুখকর তাহারসন্দেহ নাই। সাহারামপুর হইতে তৃতীয় প্রহরের সময় যাত্রা করিলাম। এবং যতক্ষণ দিবাকর কর প্রদান

মুসুরী পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য

করিলেন ততক্ষণ দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রের শলাকা যেমন উত্তরাভিমুখে থাকে, আমার চক্ষু সেইরূপ গিরি-দিকে থাকিল। রাত্রে মোহনপাস শেখরে উত্থিত হইলাম। সাহারামপুর পর্য্যন্ত রেলগাড়ীতে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে অশ্বযানে যাইতে লাগিলাম। পরদিন (৭ই কার্ত্তিক) অতি প্রত্যূষে রাজপুরে উপনীত হইলাম। সেখান হইতে ঝম্পানে পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। উত্থানকালে পার্ব্বতীয় আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে চিত্তে কতই আহ্লাদ ও বিস্ময় উপস্থিত হইতে লাগিল। পথপার্শ্বে ও গিরিগাত্রে কতপ্রকার মনোহর পুষ্প আলো করিয়া রহিয়াছে। তাহার মূলস্থানে কেহ কর্ষণ বা জলসেচন করিতেছে না। অথচ তৎসমূহ অতি সতেজ রহিয়াছে। অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিলে শৈলবাসী একজন কহিল, "মহারাজা পীড়িত আছেন।" এই সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। অগ্রজ মহাশয়ের পত্রের শেষ ভাগে লিখিত ছিল যে 'আমরা সকলেই ভাল আছি' ও টেলিগ্রাফেও কোন অমঙ্গল বার্ত্তা ছিল না। সুতরাং আমার মনে বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। তবে রাজার শরীর সর্ব্বদা সুস্থ থাকিত না বলিয়া পাছে তাঁহাতে পীড়িত দেখিতে পাই এইরূপ চিন্তা মধ্যে মধ্যে হইতেছিল।

রাজা সতীশচন্দ্রের পরলোকগমন

অনেকদূর আরোহণ করিয়া দেখিলাম একটি বাটী হইতে কেহ কেহ দূরবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে আমাকে দেখিতেছে। কিন্তু পর্ব্বতস্থ কুটিলপথ-প্রযুক্ত ঐ বাটী কখন দৃষ্ট কখন অদৃষ্ট হইতেছে। বেলা দুই প্রহরের পর ঐ বাটীতে উত্তীর্ণ হইলাম। রাজার অবস্থা দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলাম। তৃতীয় দিবসে (৯ই কার্ত্তিক) তাঁহাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখিলাম। চতুর্দ্দিক অন্ধকার বোধ হইল এবং সর্ব্বশরীরের শিরার মধ্যে যেন অগ্নিস্রোত বহিতে লাগিল। মহারাজার দেহ লইয়া সন্ধ্যার পর দারাহূনে উপস্থিত হইলাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত সেই রাত্রেই তাঁহার শব হরিদ্বারে পাঠাইলাম। আমি ঐ স্থানেই থাকিলাম। হরিদ্বার হইতে লোক ফিরিয়া যাইলে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অন্তঃকরণে কতই দুঃখের ও চিন্তার উদয় হইতে

লাগিল। যে আন্তরিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত লব্ধ হয় না, যে ঐশ্বর্য্য বহু আয়াস ভিন্ন হস্তগত হয় না, যে সম্মান বিপুল ব্যয় ও আয়াস বিনা পাওয়া যায় না—সে-সমুদয় রাজা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! নিজ অবিবেচনায় দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারিলেন না। বিজাতীয় সভ্যতা তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। শুদ্ধ তাঁহার নহে, পতিপুত্রবিয়োগবিধুরা দুঃখিনী জননীর ও তাঁহার পুত্রহীনা বিধবারমণীর সর্ব্বনাশ হইল।

আমাদের স্বদেশ-প্রত্যাগমন

পূর্ব্বে এ দেশে মদিরাপানের প্রথা এককালে ছিল না এরূপ নহে। বেদের অবতারণ-কাল বা তাহার পূর্ব্ব হইতে এ গরলপানের কথা রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং ইহাতে যেমন অনিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে সেরূপ সেকালে দৃষ্ট হইত না। পূর্ব্বকালে ভদ্রসমাজে সুরাপানের ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব ছিল। যিনি সেই ধর্ম্মের নিয়মানুসারে পান করিতে সমর্থ হইতেন তিনিই পান করিতেন। পানের নির্দ্দিষ্ট কাল ছিল। কেহ দিবসে একবার কেহ রাত্রে একবার, কেহ বা দিবসে একবার ও রজনীতে একবার নির্জ্জন স্থানে আপনার ইষ্টদেবতার উপাসনার সময় পান করিতেন। আর তাঁহাদের পানের পরিমাণও নির্দ্ধারিত ছিল। অধিকাংশ লোক যামিনীযোগেই পান করিতেন। তাঁহারা এত সাবধানে পান করিতেন যে, তাঁহাদের প্রতিবেশীরাও এ বিষয় জানিতে পারিতেন না। একালের মদ্য-পায়ীদের পানের সময় বা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। যাঁহার যে সময় ও যতবার অভিলাষ হয় তিনি সেই সময় ও ততবার পান করেন। পরিমাণের ত কথাই নাই। সুতরাং এ অবস্থায় কেন না অমঙ্গল ঘটিবে? সমাজের কেবলমাত্র যুক্তিপথে চলিবার অসম্ভাবনা দেখিয়া পুরাকালীন ব্যবস্থাপকগণ সকল কার্য্যই ধর্ম্মের শাসনাধীন করিয়া-ছিলেন। পাশ্চাত্যবিদ্যা সে শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ইদানীন্তন ভদ্রসমাজস্থ শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকেই পূর্ব্বকালের শাস্ত্রকারদিগের কৌশল বুঝিতে পারিয়াছেন। হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য লোকের জন্য শাস্ত্রশাসন হইয়াছে বটে, কিন্তু অধুনাতন শিক্ষিত

সুরাপানের ফল

সম্প্রদায়ের অনেকের অনেক বিষয়ে যতই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশক্তি হউক, মদ্যপান বিষয়ে পুরাকালীন অজ্ঞ লোকের মত অজ্ঞানই আছেন; বহু বুদ্ধিমান পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ বা বালকের মত বিবেচনাবিহীন হইতে দেখা যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশু যেমন দুগ্ধ অভাবে অস্থিরচিত্ত হয়, ইহারা মদিরাভাবে সেইরূপ অধীর হইয়া থাকেন। এই রাজাদের যে দুই পূর্ব্বপুরুষ পানাসক্ত ছিলেন তাঁহারা তান্ত্রিক-নিয়মানুগত থাকাতে তাঁহাদের এত অকালে জীবনাবসান হয় নাই। ইদানীন্তন যে দুইজন পানানুরাগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকবৎসরাবধি অস্বচ্ছন্দ শরীরে থাকিয়া শেষে তরুণ বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। হায়! ইহারা যদি মদিরার মোহিনীজালে পতিত না হইতেন অথবা পূর্ব্বনিয়মে পান করিতেন, তাহা হইলে সপরিবারে কতই সাংসারিক সুখভোগ করিতেন এবং স্বদেশের কতই উপকার করিতে পারিতেন।

রাজার মৃত্যুতে আমার চিন্তা

রাজাদের অবস্থার সঙ্গে নিজের বিষয়েরও চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার কিছুমাত্র সঞ্চিত ধন নাই। পৈতৃক সম্পত্তি যে যৎকিঞ্চিৎ আছে তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। মহারাণী আমার প্রতি যেরূপ কুপিতা আছেন তাহাতে তিনি যে আমাকে প্রতিপালন করিবেন এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে আমার কি গতি হইবে! এই বয়সে আবার কোথায় চাকুরী করিতে যাইব? মহারাজা

মহারাজার উইলে আমার আপত্তি

যে উইলের কথা বলিয়াছিলেন তাহা কেন করি নাই। তাহা করিয়া রাখিলে তো এত চিন্তা হইত না। পূর্ব্বে রাজা আমাকে কহিয়াছিলেন যে, "আপনি এইরূপ নিয়মে এক উইল প্রস্তুত করুন যে, আমার সমস্ত সম্পত্তির অভিভাবক আপনি হইবেন, এবং আমার বিনা অনুমতিতে সমস্ত কার্য্য চালাইবেন। আমি ইংলণ্ডে বা পর্ব্বতে বা যেখানেই থাকি সেখানে আমাকে বাৎসরিক ১২ হাজার টাকা দিবেন এবং অবশিষ্ট টাকা হইতে রাজস্ব দিয়া যাহা থাকিবে তাহা হইতে আপনি সাংসারিক সকল প্রয়োজন সম্পন্ন করিবেন। আর আমার মৃত্যুর পর আপনার

অন্যের দ্বারে যাইতে না হয় সেজন্য এই নিয়ম থাকিবে যে, আপনি যাবৎ জীবন মাসিক দুই শত টাকা পাইবেন।" এইরূপ নিয়মে উইল প্রস্তুত করিতে রাজা যখনি বলিতেন তখনি আমি এরূপ উত্তর করিতাম যে, "আপাততঃ উইল করিবার প্রয়োজন দেখি না। যখন প্রয়োজন হইবে তখন অবশ্যই তাহা করিব।" তিনি কহিতেন, "যদি আমি হঠাৎ মরিয়া যাই তবে আপনার উপায় কি হইবে?" আমি তাহার উত্তর করিতাম যে, "আপনি প্রায় আমার সন্তানের বয়স্ক। আমার মরণের'পর আপনি আমার সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিবেন এই সম্ভাবনা। অতএব আপনার অভাবে আমার কি হইবে তাহার চিন্তা করিবেন না। অন্যান্য বিষয়ের উইল আবশ্যক হইলেই প্রস্তুত করিব।" যদিও এরূপ উইলে আমার মঙ্গল হইত কিন্তু তাঁহার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহা করিতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কারণ ইদানীং তিনি মহারাণীর ভয়ে বাটীতে থাকিতে চাহিতেন না। তবে এককালে বিদেশে থাকিলে বিষয়কার্য্য চলিবে না এবং ইচ্ছামত টাকা পাইবেন না, শুদ্ধ এই বিবেচনায় কখন কখন বাটী থাকিতেন। যখন আমারও ইহাতে লাভ আছে তখন এ উইল অবশ্যই হইবে, বোধ হয় এইরূপ ভাবিয়া এ বিষয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হন নাই।

উইল না হওয়াতে আমার অনিষ্ট

এ উইল না হওয়াতে মহারাজারও কোন উপকার হইল না, অথচ আমার বিলক্ষণ অপকার হইল। পূর্ব্বে কয়েকবার তাঁহাদের মঙ্গল আশায় নিজের অমঙ্গল করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হইয়াছিল! এবার নিজের অমঙ্গল হইল, অথচ তাঁহাদের মঙ্গল কামনাও ব্যর্থ হইয়া গেল। পূর্ব্বে কয়েকবারের ভুলে আমার যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহাতে আমার বিশেষ ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু এবারের ভুলে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইল। যদি এই উইল রীতিমত সম্পন্ন হইত তবে আর আমার এই ৬২ বৎসর বয়সে নরক-ভোগ করিতে হইত না। আমার পুত্রাধিক রাজার বিয়োগে হৃদয়ে যে বেদনা পাইয়াছি তাহার শতগুণ যন্ত্রণা ইদানীন্তন দাসত্ব নিমিত্ত ভোগ করিতেছি। এক্ষণে কোথায় ঈশ্বর-আরাধনায় ও বন্ধুসহবাসে নানা সৎপ্রসঙ্গে জীবনযাপন করিব,

না কোথায় বিষয়চিন্তায় ও অসৎসংসর্গে কাল কাটাইতেছি। আমার কর্ত্তৃপক্ষের ও নিজের কর্ম্মচারীরা ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও আমি ঈদৃশ যমযন্ত্রণা পাইতাম না। সদর-কাছারীর কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই আহ্লাদপূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধন করেন না। সেকালের গুরুমহাশয়ের ন্যায় মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে হয়। মফঃস্বলের কর্ম্মচারীরা আরও ভয়ানক লোক। তাহারা কর্ত্তব্য-সংজ্ঞা পর্য্যন্ত জানে না, পরন্তু প্রবঞ্চনা করিতে বিলক্ষণ পটু। তাহাদের কর্ম্মের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে প্রভুর বিলক্ষণ অনিষ্ট-সম্ভাবনা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ বড়ই ক্লেশদায়ক হন।

রাজবাটীতে প্রত্যাগমন

রাজবাটী থাকিলে প্রায় দুই বেলায় গাড়ীতে বেড়াইতেন বলিয়া রাজবাটী হইতে চওক পর্য্যন্ত যে বর্ত্ম আছে তাহার সংস্কার ভালরূপ হইত না। একারণ রাজা যখন পশ্চিমাঞ্চলে যান তখন ঐ পথের সম্পূর্ণ সংস্কার আরম্ভ হয়। রাজাকে আনিবার জন্য যে দিন আমি যাত্রা করি সেদিন স্থপতিদিগকে কহিয়া যাই যে, যেন রাজা আসিয়া সমস্ত পথ প্রস্তুত দেখেন। মহারাজাকে বিসর্জ্জন করিয়া চওকের মধ্যে (১৭ই কার্ত্তিক) প্রবিষ্ট হইলাম, তখন ঐ সম্পূর্ণ সংস্কৃত বর্ত্মের প্রতি নেত্রপাত করিয়া যে কি মনোবেদনা পাইলাম তাহা ব্যক্ত করা যায় না। হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল, নয়নদ্বার দিয়া অগ্নিবৎ অশ্রু বহিতে লাগিল, এবং মস্তকে যেন অনল জ্বলিয়া উঠিল। রাজবাটী আসিয়া দেখিলাম পুরবাসীদের বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে, এবং সকলেই হাহাকার করিতেছে। কাছারীগৃহে ভট্টাচার্য্যের ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য্য আমাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া কহিলেন যে, "ভাই, আমরা পুরুষানুক্রমে তোমাদের অনুগত। তুমি আমাকে তোমার বামদিকে বসাইয়া কোন কর্ম্মের ভারার্পণ করিবে?" এমন শোকের সময় তাঁহার এই স্বার্থপরতার কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইলাম। কহিলাম যে, "আমিই থাকিব কিনা তাহার স্থিরতা নাই"; তিনি উত্তর করিলেন, "তোমার কর্ম্ম থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমার জন্য মহারাণীকে অনেক

বলিয়াছি”। “আমার জন্য যদি আপনি না বলিবেন তবে আর কে বলিবে”, এই বলিয়া আপাততঃ তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলাম। বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে তবু আমার মুখপ্রক্ষালন হয় নাই। সুতরাং আর রাজবাটীতে থাকিতে পারিলাম না।

ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক আমার অনিষ্ট-চেষ্টা

পরদিন রাজবাটী যাইয়া কর্ত্তব্যকার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ভট্টাচার্য্য কহিলেন, “আপনার নিকট যেসকল চাবি আছে তাহা রাণী চাহিতেছেন।” আমি উত্তর করিলাম, “মহারাণী ব্যতীত আর কাহারও হস্তে চাবি দিব না।” আমার কর্ম্ম লইবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য আমার বিরুদ্ধে মহারাণীর নিকট নানারূপ কথা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। আমার কোন দোষ না পাইয়া শেষে আমি সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ কথা মহারাণীকে জানাইলেন। একদিন হঠাৎ রাণী অন্দরমহালের দ্বারে আমাকে ডাকাইয়া দাসীদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, “বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা।” আমি উত্তর করিলাম যে, “সম্পত্তি কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে মহারাণীর পক্ষে মঙ্গল, আর রাণীর হস্তে থাকিলে চাকরদিগের পক্ষে মঙ্গল।” ক্ষণেক বিলম্বে—ভট্টাচার্য্য আসিয়া কহিলেন, “মহারাণী আপনাকে জানাইতে কহিলেন যে, সম্পত্তি হস্তে পাইলে কে তাহা ত্যাগ করিতে চাহে।” যদিও এ কথার মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি কহিলাম যে, “বিষয় হস্তে রাখা না রাখার কথা বলি নাই, প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার যে অভিপ্রায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছি।”

রাণীর নূতন দেওয়ান-নিযুক্তে মন্ত্রণা

কয়েকদিন পরে রাণী রাজ-জামাতা বাবু অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া দেওয়ানী কাহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন যে, “আপনার সংসারে আর কে আছেন যে, তাঁহাকে এই পদ দিবেন? যাঁহাকে রাজারা দেওয়ানী দিয়াছেন, আপনিও তাঁহাকেই দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত করুন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে যেমন ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন, আপনি তাঁহাকে সেরূপ না করিলে তিনি কর্ম্ম করিবেন বোধ হয় না।” রাণী

বিরক্তভাবে কহিলেন যে, "যদি আমি তাঁহার মত দেওয়ানের কেঁড়ে-ধরা হইতে না পারি?" অঘোরবাবু প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "আমি কেঁড়ে-ধরার কথা বলিতেছি না, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে যে তিনি থাকিবেন না তাহাই বলিলাম।" ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, "যাত্রাওয়ালার বালকের কথা রেখে দেও। কার্ত্তিক রায় ব্যতীত কি আর উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না?" অঘোরবাবু ইহার কি উত্তর দেন, তাহা মনে নাই। কিন্তু ভট্টাচার্য্য নিজ অভীষ্টসিদ্ধির বিষয়ে যত্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই তাহা স্মরণ আছে। কিন্তু তাহার বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

রাণীর অনুগ্রহ

উপরিউক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে মহারাণী আমাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া চিকের মধ্য হইতে কহিলেন, "আপনার প্রতি রাজার যেরূপ ভক্তি ছিল, আমারও ঠিক সেইরূপ আছে। আমার নিকট আপনার বিপক্ষে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এমন কি যাঁহাকে আপনি নিতান্ত আত্মীয় জ্ঞান করেন তিনিও আপনার বিরুদ্ধে নানা কথা কহিয়াছেন। আপনাকে অন্ততঃ ১৫ দিনের নিমিত্ত পদচ্যুত করিতেও কেহ কেহ পরামর্শ দিয়াছেন। অনেকে যেমন আপনার বিরুদ্ধে আমার নিকট বলিয়াছে, বোধ হয় আমার নিন্দাও তেমনি আপনার নিকট করিয়াছে। অতএব যদি আমার নাম করিয়া কেহ কোন বেদনাদায়ক কথা বলিয়া থাকে তাহা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। তাহার প্রমাণ এই, যদি আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতাম তাহা হইলে আমি অবশ্যই আপনার নিকট হইতে সমস্ত চাবি লইতাম। আমি যেমন কাহারও কথা শুনি নাই, আপনিও তেমনি কাহারও কথা মনে করিবেন না। আপনি যেরূপ বিষয়কার্য্য করিতেছেন সেইরূপ স্বচ্ছন্দচিত্তে করিতে থাকুন।" মহারাণীর এইসকল শ্রদ্ধা-সম্বলিত স্নেহবাক্যে আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না, এবং কোন কথা কহিতে সমর্থ হইলাম না। পরদিন হইতে প্রসন্নমনে কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। ধর্ম্মপথে প্রায়ই পদ স্খলিত হয় না। এ পথ যেমন সমতল তেমনি পরিষ্কার। ইহাতে কণ্টক ও কোন ভয় নাই। যদিও নিতান্ত

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পথে কেহ কখন পতিত হন, তিনি অবিলম্বেই উত্থান করিতে পারেন। তাঁহাকে তুলিবার জন্য কতজন বিনা প্রার্থনায় হস্তপ্রসারণ করেন। দেখ পুত্রগণ! যে রমণী তাঁহার স্বামীর সময় আমাকে দূরীভূত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কাহারও কুমন্ত্রণা না শুনিয়া আমার উপরই সকল বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। দেখ, ধর্ম্মের কত বড় জয় হইল।

কমিশনর ক্যাম্বেল সাহেব নদীয়া জেলার কালেক্টর সি. সি. ষ্টিভন্স্ সাহেবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, "শুনা যাইতেছে যে, নবদ্বীপের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। তুমি কি জন্য আমাকে এই সংবাদ লেখ নাই? রাজার উত্তরাধিকারী কে আছেন লিখিবে।" কালেক্টর তাহার উত্তর এইরূপ দিলেন যে, "রাজার মৃত্যুর রীতিমত সংবাদ না পাওয়াতে আমি আপনাকে এ সংবাদ দেই নাই। এ ঘটনা যথার্থ। মহারাণী তাঁহার উত্তরাধিকারিণী।"

রাণীর বৈষয়িকতা সম্বন্ধে কালেক্টর ও কমিশনরের আলোচনা

কমিশনর পুনরায় কালেক্টরকে লিখিলেন যে, "রাণী তাঁহার স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে সমর্থা কিনা লিখিবে।" কালেক্টর লিখিলেন যে, "রাণী তাঁহার সম্পত্তির কার্য্যের পরিচালনা করিতে পারিবেন কি না তাহা কিরূপে পরীক্ষা করিব তাহার উপদেশ দিবেন।" এই পর্য্যন্ত লেখালেখি হইয়া কিছুদিন এ বিষয়ের আর কোন কথা হইল না। পৌষ মাসে কমিশনর সাহেব এখানে আসিয়া মহারাণীকে এইরূপ এক পত্র লিখিলেন যে, "আপনি যেরূপ পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী তাহাতে আপনার উপযুক্ত দেওয়ানের সাহায্য সত্ত্বেও আপনি যে নিজ সম্পত্তির কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। আপনাদের ন্যায় উচ্চ পরিবারের প্রতি গভর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি আছে। অতএব আপনি স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে অর্পণ করুন।" তাঁহার সম্পত্তি পাছে উক্ত কোর্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে যায় এই নিমিত্ত রাণী অতিশয় চিন্তিত ছিলেন। এক্ষণে এই পত্র পাওয়াতে অত্যন্ত

সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে দিবার জন্য কমিশনরের আদেশ

ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া যাহাতে বিষয় নিজ হস্তে থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে আদেশ দিলেন। যদিও আমার ঐরূপ ইচ্ছা নহে, তথাপি তাঁহার ইচ্ছামত আমার কার্য্য করিতে হইল।

মহারাণীর আদেশানুসারে আমি একজন ব্যারিষ্টার ও দুইজন প্রধান উকীলকে রাজবাটী ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহারাণী না দিলে কোর্ট বলপূর্ব্বক তাঁহার সম্পত্তি আপন হস্তে লইতে পারেন কি না?" তাঁহারা কহিলেন যে, "মহারাণী যে জমিদারীর কার্য্য চালাইতে পারেন তাহার কোন নিদর্শন নাই। সুতরাং তাঁহাকে অযোগ্যা ভূম্যধিকারিণী স্থির করিয়া কোর্ট তাঁহার সম্পত্তি আপন হস্তে লইতে পারে।" নগরবাসীদের মধ্যে এই রাজপরিবারের হিতাভিলাষী কোন কোন ভদ্রলোক কোর্টের অধীনে এ সম্পত্তি যাওয়ার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় কমিশনর ও কালেক্টর মহারাণীকে পত্র লেখেন এবং ব্যারিষ্টার ও উকীলেরা উক্তরূপ মত দেন। তখন আমারও ঠিক এইরূপ বিবেচনা ছিল যে, কোর্ট ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ের ভার হস্তে লইতে পারেন। সুতরাং সম্পত্তি হস্তে রাখিবার নিমিত্ত মহারাণী আর কোন উদ্যোগ করিলেন না। তিনি ২৭শে পৌষ, ১২৭৭ সাল সমস্ত সম্পত্তির ভার কোর্টের হস্তে দিলেন এবং কয়েকদিন পরে আমাকে এই সম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ করিতে কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করিলেন।

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক সম্পত্তির ভার গ্রহণ

কালেক্টর আমার বিষয়ে কমিশনর সাহেবকে এইরূপ লিখিলেন যে, "রাজার মুখে দেওয়ানের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি এবং মহারাণীও ইহার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব আমার বিবেচনা হয় যে, দেওয়ানকে ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিলে সম্পত্তির কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। আর যে দুই শত টাকা বেতন ইনি পাইতেছেন তাহাই দেওয়া যাইবে।" কমিশনর সাহেব এই পত্রের উত্তরে কালেক্টরকে লিখিলেন যে, "তুমি ম্যানেজারী পদের জন্য যে জনকে মনোনীত করিয়াছ তাহা অপেক্ষা আপাততঃ আর উত্তম নির্ব্বাচন

আমার ম্যানেজারীতে নিযুক্তি

হইতে পারে না। অতএব ইঁহাকে এ পদে অভিষেক করা হইল।”

এদিকে আর কোন দুর্ভাবনার বিষয় থাকিল না। কিন্তু পঞ্চসহস্র টাকার গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী অথবা জমিদারী এই কর্ম্মের জামিনীতে আবদ্ধ রাখিতে হইবে, তাহারই নিমিত্ত অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইলাম।

আমার জামিনের বিষয়

জমিদারী বা সিকিউরিটী বা এত টাকা আমার অথবা স্বগণের মধ্যে কাহারও ছিল না। সুতরাং কি করিব ভাবিয়া অস্থির হইলাম। একদিন হঠাৎ রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর প্রচণ্ড রৌদ্রে আমার বাটী আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে কহিলেন যে, “আপনি নাকি জামিনীর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন? আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমাদের জমিদারী আপনার জামিনীতে আবদ্ধ রাখিব।” আমি কহিলাম, “পাছে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় এ নিমিত্ত আমি তোমার নিকট এ প্রস্তাব করি নাই।” তাঁহার এই নিঃস্বার্থ পরোপকারে আমার মন কৃতজ্ঞতারসে এত আর্দ্র হইল যে আমার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

পরদিবস মহারাণী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “যদুবাবু নাকি আপনার জামিন হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন?” আমি উত্তর করিলাম “আজ্ঞা এ কথা সত্য”। “আমি থাকিতে আপনার

মহারাণীর দয়া

জামিন অন্য লোক হইবেন ইহা আমার সহ্য হইবে না।” এই কথা বলিয়া তিনি পঞ্চসহস্র টাকার গভর্ণমেণ্ট নোট আমার হস্তে দিলেন। তাঁহার এইরূপ কৃপায় ও স্নেহে আমার নেত্রদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া গেল। ঐ পাঁচ হাজার টাকায় আমার নামে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী একখণ্ড ক্রয় করিয়া কালেক্টরীতে প্রদান করিলাম, এবং ঐ টাকার একখানি ঋণপত্র মহারাণীকে লিখিয়া দিলাম। ঐ সিকিউরিটীর বাৎসরিক যে দুই শত টাকা সুদ পাওয়া যাইবেক তাহা ঐ খতের সুদ অবধারিত হইল। ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইল না এবং আমারও যথেষ্ট উপকার হইল। আবার ধর্ম্মের জয় দেখ! যিনি পূর্ব্বে আমাকে পরম শত্রু মনে করিতেন তিনিই

এক্ষণে আমাকে পরম মিত্র জ্ঞান করিয়া বিনা প্রার্থনায় আমার উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন!

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্য-প্রণালী

মহারাজার পরলোকগমনে আমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের যে চিন্তা হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এবং কিরূপে কর্ত্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব এই ভাবনা উপস্থিত হইল। তৎকালে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কার্য্যপ্রণালীর কোন বিধি ছিল না। আমাদের কালেক্টর বা তাঁহার আমলারাও এ বিষয়ে আমার মত অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট কোন সতুপদেশ প্রাপ্তির আশা ছিল না। শুনিতাম ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের ম্যানেজার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রায় সমস্ত দিবস ও রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ইচ্ছামত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম না। চিন্তায় রাত্রে নিদ্রা হইত না।

আমার আশঙ্কা

রাজার মৃত্যুর পর হইতে শেষ রাত্রে বিপুল ঘর্ম্ম হইত ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন ধড়ফড় করিত। যেন কি একটা ভয়ানক বিপদ ঘটিবে এইরূপ মনে হইত। রজনী প্রভাত হইলেও প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐরূপ যন্ত্রণা থাকিত। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহার উপশম হইত। এই অকারণ চিন্তার শান্তির জন্য মন-মধ্যেই কতই চেষ্টা করিতাম কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। এ রোগ প্রায় দুই তিন বৎসর বলবৎ ছিল এবং এক্ষণে মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। আমি কখনই সাহসী নহি। বাল্যকালে গুরুজনেরা আমাকে মুখচোরা কহিতেন। অদ্যাপি যখন কালেক্টর কি কমিশনর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন আমার মন অতিশয় চিন্তাযুক্ত থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎ হইলেই চিন্তা দূর হয় এবং প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাগমন করি। আমার কার্য্যে কোন দোষ ঘটিলে আমি তাহা কখন গোপন রাখি না। আমি তাহা অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করি। মনে ভাবিয়া থাকি যে, যখন ভাল কার্য্য করিলে প্রশংসা পাই তখন মন্দ কর্ম্ম করিলে অবশ্যই দণ্ড পাইব। সৎপথে থাকার এমনি গুণ যে আমার

ভুলের নিমিত্ত আমি কখন দণ্ডিত বা তিরস্কৃত হই নাই, বরং ভুল সংশোধনের সদুপদেশ পাইয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বয়স ৫১ হইতে ৫৮ বৎসর

সম্পত্তি যে মাসেই কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হাতে আসুক, বৎসর শেষ হইলে তাহার সালতামামীর কাগজ দিতে হয়। প্রথম বৎসর ৩ মাসে আমার সালতামামী দিতে হইল। অনেক পরিশ্রম ও বিবেচনা করিয়া সালতামামীর কাগজ প্রস্তুত করিয়া দিলাম। দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১২৭৮ বাঃ অব্দে যথোচিত শ্রম ও যত্নপূর্ব্বক কার্য্যনির্ব্বাহ করিলাম। আমার জানিত চল্লিশ হাজার টাকা রাজার সময়ের ঋণ ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ঋণ প্রকাশ হইল। তাহার মধ্যে এই বর্ষে অনেক ঋণ পরিশোধ করা গেল। সালতামামীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব আমার অনেক সুখ্যাতির কথা লেখার পর এই কথা লিখিয়া রিপোর্ট শেষ করিলেন যে, "এমন ম্যানেজার পাওয়া নদীয়া ষ্টেটের সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক।" এই অব্দের ৯ই অগ্রহায়ণ মহারাণী দত্তক গ্রহণ করিলেন। দত্তক-গ্রহণ জন্য রাজার সময় আমি কয়েকটি বালক দেখিয়াছিলাম, এবং তাহার মধ্যে দুইটি রাজাকেও দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন বাধাবশতঃ কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। মহারাজা যখন শেষ বারে বহির্গত হন তখন বারাণসী হইতে আমাকে লেখেন যে, "আপনি আর অন্য বালকের অনুসন্ধান করিবেন না। আমি প্রতিগমন করিয়া হরধামের গিরিধরচন্দ্র খুড়ার পুত্রকে দত্তক লইব।" আহা! তিনি আর ফিরিলেন না! এবং মনোবাঞ্ছাও পূর্ণ করিতে পারিলেন না। যদি আমি দূরদর্শীর ন্যায় কার্য্য না করিতাম, তবে আর দত্তক-গ্রহণও হইত না এবং এ রাজপরিবারের নামও ডুবিয়া যাইত। মহারাজা বিষয়াধিকারী হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি তাঁহা দ্বারা দুই মহারাণীর দত্তক-গ্রহণের

সালতামামী

রাণীর দত্তক-গ্রহণ

অনুমতিপত্র লেখাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই অনুমতিপত্রানুসারে কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হইলেন, এবং ভাবী দত্তক-পুত্রের যে নাম রাজার সময় স্থির করিয়াছিলাম সেই নাম তাঁহাকে দেওয়া হইল। পূর্ব্বে আমি মহারাণীর ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলাম, এক্ষণে কুমারের সম্পত্তি হওয়াতে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার বলিয়া এক নূতন সনন্দ পাইলাম।

"ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত"

এই রাজবংশের একটি ইতিহাস থাকে অনেক দিবসাবধি আমার এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আমি কখন' কোনরূপ রচনা করি নাই বলিয়া স্বয়ং ইহা লিখিতে প্রথমে সাহস করি নাই। ভাবিয়াছিলাম যদি কোন উপযুক্ত লেখক এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হন তবে এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেই। প্রথমে আমি রায় যদুনাথ রায় বাহাদুরকে আমার অভিলাষ জানাই। তিনিই ইহা লিখিতে সম্মত হন। এই কথা শুনিয়া রাজ-জামাতা বাবু অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে কহেন যে, তাঁহার পুত্র, বাবু শ্যামাধব রায় তাঁহার মাতামহের বংশাবলী বলিয়া এই ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমি সম্মতি প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার পুত্রের ন্যায় তরুণ-বয়স্ক যুবকের দ্বারা যে ঐ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে এরূপ বিশ্বাস হইল না। রাজার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে, বাবু কালীচরণ ঘোষ ডেপুটী কালেক্টর আমাকে লিখিলেন যে, "কোন কোন ষ্টেটের ম্যানেজার তাঁহার ওয়ার্ডের বংশের ইতিহাস লিখিয়া কালেক্টরিতে দিয়া থাকেন। অতএব আপনি নবদ্বীপের রাজাদের একটি ইতিহাস লিখিয়া দিবেন।" তাঁহার কথানুসারে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিলাম ও পরে তাহার ইংরেজী অনুবাদ তৃতীয় কি চতুর্থ সালতামামীর রিপোর্টে সন্নিবেশিত করিলাম। কিছুদিন পরে আমার জনৈক সুবিজ্ঞ আত্মীয় এই সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা ইতিহাস পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ বিস্তারপূর্ব্বক রীতিমত ইতিহাস লিখিতে গাঢ় অনুরোধ করিলেন। আমিও ভাবিলাম, একজন উপকরণের আয়োজন করিয়া দিবেন, আর

একজন লিখিবেন, ইহা হইলে গ্রন্থ সুচারু হইবে না। অতএব এই বিষয় স্বয়ংই সম্পন্ন করিব।

এ দেশে আমাদের বংশের যে কিছু পদ মান আছে, তৎসমুদয় এই রাজাদের প্রসাদে হইয়াছে। এবং এই রাজবংশের ইতিবৃত্ত আমি যেমন জ্ঞাত আছি তেমন আর কেহই নাই। সুতরাং এ বিষয় আমি নিষ্পন্ন না করিলে আর কাহারও দ্বারা হইবে না। এবং এই বংশের বৃত্তান্ত জানিবার যে স্পৃহা সাধারণের আছে তাহাও পূরিবে না। এই বিবেচনা করিয়া আমার অবকাশ-বিরহেও আমি এই বিষয় নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। দিবসে বা রাত্রি নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজবাটীর কার্য্যের জন্য প্রায় অবকাশ হইত না। রজনী নয় ঘণ্টার পর দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই ইতিহাস লিখিতাম। এইরূপে দুই বৎসরে এই বিষয় সম্পন্ন করি।

মুদ্রণ-ব্যয় ও কমিশনর

এই ইতিহাসে এই রাজবংশের অনেক উপকার হইবে ভাবিয়া ইহার প্রকটন ব্যয়ের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে জানাইলাম। কালেক্টর কহিলেন, "কমিশনরের নিকট প্রার্থনা কর।" কমিশনর কহিলেন, "ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আপাততঃ নহে। ষ্টেটের ঋণ পরিশোধিত হইলে এ ব্যয় করা যাইবেক।" এই বিষয়ে উভয় সাহেবের অমনোযোগ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তাঁহারা এই জমিদারীর সরভের নিমিত্ত চৌদ্দ সহস্র টাকা বরাদ্দ করিয়া মাসিক প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিতেন, এবং বাটী-সংস্কার প্রভৃতি নানা আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ে বহু ব্যয় করিতে সম্মতি দিতেছেন, কিন্তু আমার মৃত্যু হইলে যে অত্যাবশ্যক কার্য্য আর সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না তাহারই নিষ্পাদনার্থ ৪৩৬৲ টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। আমি পরিশ্রমের পুরস্কার চাহি নাই। শুদ্ধ ছাপান ব্যয় চাহিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে উক্ত কমিশনর সাহেবের কোন কথায় আমি সায় না দেওয়াতে অর্থাৎ তাঁহার বিবেচনা ভ্রমাত্মক বলাতে, তিনি আমার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালেক্টরের নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত অপরাধী ছিলাম না,

তবে ইনি কেন আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন না তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আমি নিজ ব্যয়ে এই ইতিহাস ছাপাইলাম। ছাপানর কিছুদিন পরে আমাদের রাজ-দৌহিত্র শ্যামাধববাবু, এই গ্রন্থ রচিত হওয়াতে রাজসংসারের বিশেষ উপকার হইয়াছে, এইরূপ উক্ত কালেক্টর ও কমিশনর সাহেবের নিকট ব্যক্ত করিয়া ইহার ছাপানর খরচ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করাতে ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকা প্রাপ্ত হইলাম।

নিজ ব্যয়ে ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত ছাপান

পেট্রিয়ট্ প্রভৃতি সংবাদপত্রে এই ইতিহাসের যে প্রয়োজন ও প্রশংসা প্রকটিত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় কালেক্টর ভাবিয়াছিলেন যে, এই পুস্তক অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া আমার যথেষ্ট লাভ হইবে। এ টাকা পুরস্কার-স্বরূপ দিলেন। যদি যথার্থই তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে তাঁহার নিতান্ত ভুল হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের দেশীয় লোকের মত এ দেশের লোকের প্রবৃত্তি অদ্যাপি জন্মে নাই। যদি কোন কোন লোকের এ প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক ক্রয় না করিলে চলে না বলিয়া, তাহা অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। উপন্যাস ও নাটক আশু-প্রীতিকর ও অবকাশরঞ্জনী বলিয়া তাহার গ্রাহক যথেষ্ট হয়। তদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের গ্রন্থ যতই জ্ঞাতব্যবিষয়ে পূর্ণ থাকুক না ও যতই জ্ঞানপ্রদ হউক না, তাহা জনসমাজে বড় প্রবেশ করিতে পারে না। এখনও আমাদের দেশীয় লোক যত আমোদপ্রিয়, তত জ্ঞানপ্রিয় হয় নাই। সামান্য পাঁচালীরও পুনঃ পুনঃ সংস্করণ হইতেছে কিন্তু অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অবিক্রীত হইয়া কীটের আহার হইয়াছে। আমার এই ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতের প্রশংসা শুনিয়া অনেকেই তাহা পড়িবার জন্য ব্যগ্র হন, কিন্তু তজ্জন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না। এমন কি যাঁহাদের বংশের ইতিহাস তাঁহারাও এক জাড়া সামান্য বিনামার জন্য যে ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার অর্দ্ধেকও

মুদ্রণ-ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকা রাজ-সরকার হইতে দান

সারবান গ্রন্থ অবিক্রীত

এ পুস্তকের নিমিত্ত ব্যয় করিতে পারেন না। প্রথমে আমি প্রকাশ করি যে, কোন রাজজ্ঞাতিকে ইহা বিনামূল্যে দিব না। কিন্তু শেষে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি নাই।

সালতামামী

রাজসরকারের যে ৮৫ সহস্র টাকা ঋণ ছিল তাহা প্রায়ই তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধিত হইল। এইবারের সালতামামীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব আমার কার্য্যের ও চরিত্রের বহু প্রশংসা করেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে কমিশনর লর্ড ইউলিক ব্রৌন সাহেবের অভিপ্রায়-মত কথা না কহিয়া, ভদ্রলোকের মত স্বাধীন ভাবে যথার্থ কথা কহাতে তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হন। এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট তাঁহার নিকট যাইলে তিনি আমার প্রশংসার বিরুদ্ধে কিছু না পাইয়া এইরূপ লিখিলেন যে, "হাঁ আমি জানি যে ম্যানেজার অতি বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী এবং তিনি রাজষ্টেটের কার্য্য যত্ন সহকারে করিতেছেন। রাজার জমিদারী অধিকাংশ পত্তনি আছে। সুতরাং ইহার কার্য্য অতি সহজেই নিষ্পন্ন হয়। নাবালকের অভিভাবকগণের মধ্যে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুরের দুর্লভ সাহায্যে ষ্টেটের অনেক উপকার হইতেছে।" রায় বাহাদুর যদিও প্রকৃতরূপে বিষয়কার্য্যের কোন সংস্রবে ছিলেন না, তথাপি তিনি সাহেবের প্রিয়পাত্র বলিয়া সম্পত্তির সুচারু কার্য্যের জন্য প্রশংসাস্পদ হইলেন আর আমি এই সুচারু কার্য্যের কার্য্যদক্ষ হইয়াও তাঁহার বিরাগভাজন-বশতঃ যশ লাভ করিতে পারিলাম না। যদিও এ অনুগ্রহ-নিগ্রহের কারণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, তথাপি দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমার এ দুঃখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

কালেক্টরের প্রশংসা

কমিশনরের অসন্তোষ

রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা আমার কার্য্যে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিলেন যে, "ম্যানেজার যেরূপ উত্তমরূপে কর্ম্ম করিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।" আমি কমিশনরের পত্রে যেমন বিষাদিত হইয়াছিলাম বোর্ডের পত্রে তেমনি আহ্লাদিত হইলাম। দুঃখের পর সুখ হইলে

বোর্ডের সুখ্যাতি

যত আনন্দ হয়, সহজাবস্থায় সুখলাভ হইলে তত আনন্দ হয় না। শীতাবসানে বসন্তানিলে যে সুখ বোধ হয়, পূর্ব্বে শীতের কষ্ট না হইলে বসন্তে সে সুখ হইত না। কমিশনরও যদি কালেক্টরের মত যশ কীর্ত্তন করিতেন তাহা হইলে আর বোর্ডের প্রশংসায় এতাধিক আহ্লাদ হইত না। পরবৎসর (১২৮১ অব্দের শ্রাবণ মাসে) আমার ৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ২৫০৲ টাকা হয়। তাহার পর আমার বেতন ২৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা হয়।

আমার পুনর্ব্বার জ্বর

১২৮৩ অব্দের আশ্বিন মাসে আমার জ্বর হইল। কার্ত্তিক মাসে আমার পূর্ব্বসঞ্চিত শূল রোগ পুনরায় দেখা দিল। মাঘ মাস হইতে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ভাল থাকিলাম। ১২৮৪ অব্দেব প্রথমেই পুনর্ব্বার বেদনা ধরিতে লাগিল। কোন ঔষধে রোগের প্রতিকার হইল না। জীবনধারণ কঠিন হইয়া উঠিল। এখানে উপশমের কোন উপায় না দেখিয়া স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্ত তিন মাসের ছুটি লইলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র

কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া থাকিলাম। তিনি আমাকে সুস্থ করিতে ও সুখে রাখিতে যে আন্তরিক যত্ন করেন তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না। কলিকাতায় কোন উপকাব না পাওয়াতে ৯ দিবস পরে হুগলীতে

হুগলী

আমাদের রাজ-দৌহিত্র বাবু শ্যামাধব রায়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানেও স্বাস্থ্যলাভের কোনও লক্ষণ না দেখিয়া বর্দ্ধমানে বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে

বর্দ্ধমান

গমন করিলাম। সেখানে ভোলানাথ কবিরাজের কৃত ঔষধ লইয়া ৩রা আষাঢ় ভাগলপুরে যাইয়া অবস্থিত হইলাম। এদিকে আমার কিছুমাত্র বেদনা ধরিত না, কেবল অক্ষুধা ও দৌর্ব্বল্য ছিল। সেখানে এই দুয়ের প্রতিকার দ্রুতভাবে

ভাগলপুর

হইতে লাগিল। ভাগলপুর অতি রমণীয় স্থান, পার্ব্বতীয় নয় অথচ অসমতল; যাঁহারা প্রথমে এ দৃশ্যটি দর্শন করেন তাঁহারা এই নূতন আকারের নগর দেখিয়া বড়ই

আহ্লাদিত হন। প্রাতে ও বৈকালে বেড়াইবার অতি প্রশস্ত প্রদেশ আছে। কর্ণগড়, জাঙ্গিস খাঁর সমাধিস্থান প্রভৃতি অনেক পুরাতন ও আধুনিক কীর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবাদ আছে কর্ণগড় ভারত-রচয়িতা ব্যাস বর্ণিত মহারথী কর্ণের নির্ম্মিত। এ স্থান উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ খাদের নিদর্শন অদ্যাপি আছে। নাথপুর নামে এক পুরাতন নগর এই গড়ের পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয়। ভাগলপুর আধুনিক নগর। প্রাতে ও বৈকালে আমি যতদূর পারিতাম ততদূর বেড়াইতাম। রাত্রে অনেক ভদ্রলোক আমার সঙ্গীত শুনিতে আসিতেন। তাঁহারা গান শ্রবণের জন্য যাদৃশ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি তাঁহাদিগকে তাদৃশ তৃপ্ত করিতে পারিতাম না।

ভাগলপুরের কীর্ত্তি দর্শন

২২শে আমি মুঙ্গেরে যাইয়া সেখানকার স্কুলের হেড্ মাষ্টার বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করি। তাহার পরদিনই আমার ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিবার বাসনা থাকে। এ কারণ অঘোরবাবু আমাকে সীতাকুণ্ড দেখাইয়া পীরপাহাড় লইয়া যান। সেখানে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক অপূর্ব্ব প্রাসাদ আছে। আমি বহু কষ্টে ঐ শেখরে আরোহণ করিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ মনোহর দৃশ্য দর্শনে আমার সকল কষ্ট দূরীভূত হইয়া গেল, এবং হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরসে আর্দ্র হইল। শেষে প্রাসাদের মধ্যে যাইয়া বসিলাম। মনের আহ্লাদ আর মনে রাখিতে পারিলাম না। একটি ভীমপলাশ রাগিণীর গীত গাহিতে লাগিলাম। অঘোরবাবু আমার সঙ্গীত শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, "আমি আপনাকে অষ্টাহের ন্যূন কোনপ্রকারে ছাড়িব না।" পরদিন তাঁহার নিকট বিদায় হইবার অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোনমতেই তাঁহার অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলাম না। ভাগলপুর হইতে আমার পুত্র নরেন্দ্রকেও লইয়া গেলেন। ৯ দিবস আমাকে যারপরনাই সুখে রাখেন। প্রতি রাত্রেই কোন না কোন গায়ক ও বাদককে আনাইতেন। দিবসে

মুঙ্গের

যেমন নানাবিধ স্থান দর্শনে আনন্দ হইত, রজনীতেও তেমনি সঙ্গীতে আমোদ করা যাইত।

মুঙ্গেরেও কতিপয় পৌরাণিক ও আধুনিক ঘটনার প্রবাদ আছে। তথায় যে দুর্গে জরাসন্ধ রাজা লক্ষ ভূপতিকে বন্দী রাখেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দুর্গের প্রাচীর ও পরীখা অদ্যাপি রহিয়াছে।

মুঙ্গেরের কীর্ত্তিমালা

ইহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে "করণ চেওড়া" নামে যে একটি স্থান আছে তাহাতে কর্ণরাজা বাস করিতেন। গঙ্গাতীরে একটি ঘাট আছে তথায় ত্রেতাবতারে রামচন্দ্র বনবাসকালে স্নান করেন বলিয়া তাহা তীর্থস্থানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকে সেই স্থানকে কেল্লার ঘাট বলিয়া থাকে। নিষ্ঠুর মিরকাসিম এদেশস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ঐ দুর্গ-মধ্যে বন্দী রাখেন। এবং শেষে তাহার পশ্চিমদিকস্থ গঙ্গায় অগাধ জলে নিক্ষেপ করেন।

৩রা ভাদ্র আমি মুঙ্গের হইতে ভাগলপুবে প্রত্যাগত হই। সে অঞ্চলের জলবায়ুব গুণে আমার শরীব এত শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ হইতে

ভাগলপুরে প্রত্যাগমন

লাগিল যে ১২ই আষাঢ় যে শরীরের ওজন একমণ সাড়ে বার সের হইয়াছিল, ২০শে শ্রাবণ সেই শরীর ওজনে একমণ সাড়ে আঠার সের হইল। আর কিয়ৎকাল সে দেশে থাকিতে পারিলে বড়ই উপকার হইত; কিন্তু ছুটী শেষ হওয়াতে ৬ই ভাদ্র বাটীতে আসিতে হইল।

গতবারের সালতামামীর রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব আমার সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন যে, "ভূম্যধিকারী ও প্রজাতে যেরূপ অসদ্ভাব আছে, তাহাতে ম্যানেজার বিনা নালিশে জমিদারীর যে এতাধিক আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন ইহা অতীব প্রশংসার বিষয়। আর রাজার সময় দেওয়ানী অবস্থায় তাঁহার সচ্চরিত্রের খ্যাতি এতই বিস্তারিত ছিল যে, কমিশনর সাহেব তাঁহাকে ম্যানেজারী পদ দিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নাই।"

আমার পুনরায় অম্লরোগের আবির্ভাব হওয়াতে ৩০শে আশ্বিন কুষ্টিয়ায় যাই। তাহার সন্নিহিত গড়ুই সেতুর শিল্পকার্য্য দেখিয়া

সাতিশয় আহ্লাদিত হই। কিন্তু এ সেতু যতই সুদৃঢ় হউক না, যমুনা সেতুর ন্যায় সুদৃশ্য নয়। পূজার ছুটীতে হাকিম, উকীল, মোক্তার প্রভৃতি প্রায় সকলেই বাটী গিয়াছিলেন। সুতরাং অধিক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত না। এক যৎসামান্য বাসস্থানে ছিলাম। কিন্তু স্থানটি এমনি স্বাস্থ্যকর যে, যে আট দিবস তথায় থাকি সে কয়েক-দিন আর রোগের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমাদের বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা গিরীন্দ্র সে সময় তথায় সব্ ডেপুটী কালেক্টরের পদে ছিলেন। তিনি এই কয়েকদিন আমাকে সুখে রাখিবার অনেক যত্ন করেন।

অম্লরোগের প্রাদুর্ভাব

কুষ্টিয়া

রাজবাটীর দীঘির পঙ্কোদ্ধার করিবার কার্য্য ১০ই মাঘ আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারটি নির্ব্বাহ করিতে আমার বিস্তর শ্রম হয়, ও তন্নিমিত্ত সময় সময় বুকের বেদনায় ক্লেশ পাই। রাজবাটীর কোন মোকদ্দমার উদ্যোগ করিতে ফাল্গুন মাসে আমি মুরসিদাবাদে যাই। তথায় কয়েকদিন অবকাশক্রমে নবাব-বাটী, কাসিমবাজারের অন্নদাপ্রসাদবাবুর বাটী ও লক্ষ্মীপতি সিংহের উদ্যান দেখি। কয়েকদিনের পর বাটী ফিরিয়া আসি।

দীঘির পঙ্কোদ্ধার

আমি পূর্ব্বে একস্থানে লিখিয়াছি যে বাল্যকাল হইতে আমার সঙ্গীত বিষয়ে একটু আসক্তি ছিল। ইহা বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে পরিবর্দ্ধিত হয়। যেসকল হিন্দী গীত গাইতাম তাহাতে আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ সন্তোষ হইত না। তাঁহারা কহিতেন যে, "গানের ভাব বুঝিতে না পারিলে, শুদ্ধ সুরে আনন্দ লাভ হইতে পারে না।" তৎকালে বঙ্গভাষায় রচিত গীতের মধ্যে দেওয়ান রঘুনাথ রায় মহাশয়ের পদ ও রাজা রামমোহন রায়ের রচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচারিত ছিল। কিন্তু পবিত্র প্রণয়-রসাত্মক গান অত্যল্প শুনা যাইত। তদানীন্তন আদিরসাত্মক গীতির মধ্যে অধিকাংশ গাইতে লজ্জাবোধ হইত। তখন দম্পতি-প্রণয় প্রণয়-মধ্যেই পরিগণিত ছিল না। সুতরাং সুরসিক রচয়িতাগণও অপবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গে গান রচনা করিতেন। প্রথমে আমি ঐসকল

সঙ্গীতে অনুরাগ

গীতির মধ্যে যাহাতে সুন্দর কবিত্ব দর্শন করিতাম তাহার অশ্লীল ভাব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পবিত্র ভাবে পরিগণিত করিয়া গাইতাম। আত্মীয়গণ তাঁহা শ্রদ্ধা ও আহ্লাদের সহিত শুনিতেন। কিন্তু বারংবার একই গান শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের আমোদের ন্যূনতা হইতে আরম্ভ হয়। এ কারণ আমার তাদৃশ কবিত্বশক্তির অভাবেও আমি প্রণয়গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

এইসকল গান শুনিয়া আত্মীয়গণ অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু ইহার রচয়িতা কে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কেহ কখন জিজ্ঞাসা করিতেন "তুমি এসকল নূতন গান কোথায় পাও", আমি উত্তর করিতাম "রাজারা হাতি-ঘোড়া যেখানে পায়"। এসকল আমার নিজের গীত, ইহা বলিতে যেন লজ্জা বোধ হইত। প্রায় ১০।১২ বৎসর এইরূপ যাওয়ার পর একদা কোন আত্মীয়ের বাটীতে যে সময় আমি এইসকল গীত গাই, তখন প্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা বাবু দীনবন্ধু মিত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের পণ্ডিত নবগোপাল তর্কালঙ্কার, বাবু পূর্ণপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েকজন বান্ধব উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও রচয়িতার নাম না পাওয়াতে, আমার রচনা বুঝিতে পারিলেন এবং সকল আত্মীয়ের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়া দিলেন।

সঙ্গীতে সন্তোষ

প্রথমে আমি কেবল ভালবাসার গীত রচনা করিয়াছিলাম, পরে আত্মীয়-বিশেষের প্রীত্যর্থ রামচরিত, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া মাতৃস্নেহ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ ইত্যাদি কয়েক বিষয়ে কতিপয় গীত রচনা করি। তাহার পর ঋতু-বিশেষে গাইবার জন্য বসন্ত, বর্ষা, হোরির ও শুভকর্ম্মোপলক্ষে গাইবার নিমিত্ত বিবাহ, পুত্রলাভ, জন্মতিথি বিষয়ের কতকগুলি গীত হিন্দী গানের আদর্শে প্রস্তুত করি। আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ আমার গানসকল পুস্তকাকারে প্রচার করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু আমি সাধারণের গোচর করিবার আশায় এসকল গান রচনা করি নাই। আমি স্বয়ং গাইয়া আত্মীয়-স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করিব এই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

"গীতমঞ্জরী"

সুতরাং তাঁহাদের অনুরোধের প্রতি মনোযোগ দিতাম না। যাঁহাদের নিতান্ত আগ্রহ দেখিতাম তাঁহাদিগকে কতক গীত লিখিয়া দিতাম। কিন্তু শেষে আমার যেরূপ বয়স হইল তাহাতে আর আমার উদ্দেশ্য সাধনের প্রত্যাশা রহিল না। সুতরাং আমার গান সমস্ত ১২৮৫ বাঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রচার করিলাম।

পূর্ব্বসুখের দিন

আহা! কি সুখের সময়ই বিগত হইয়াছে। যে সময় আমি বান্ধব সমাজে এইসকল গীত গাইতাম, সে সময় বন্ধুদিগের আনন্দ দর্শনে আমার হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় সুখেরই আবির্ভাব হইত! আমার হৃদয় যেন নৃত্য করিতে থাকিত। আমার গানে তাঁহারা যতদূর মোহিত হইতেন, আমি তাঁহাদের আনন্দদর্শনে তাহার অধিক মোহিত হইতাম। আমার মনে হইত যে আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। কলিকাতা হইতে কত লোকের এখানে আসিবার কালে তাঁহাদের বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে আমার গান শুনিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন। আমার বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর তখন একবার বাবু রামগোপাল ঘোষ কয়েকজন আত্মীয় সহিত শুদ্ধ আমার গান শুনিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, "যদি কণ্ঠদেশ বিনিময় করা যাইত তাহা হইলে আমার গলা তোমাকে দিয়া তোমার গলা আমি লইতাম।" মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বাবু রামতনু লাহিড়ী, বাবু দীনবন্ধু মিত্র, বাবু ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক আত্মীয়গণের আমার গীত যেমন মিষ্ট লাগিত সেরূপ আর কাহারও গান লাগিত না। একদা রথের সময় বঙ্কিমবাবুদিগের বাটীতে গিয়াছিলাম—একবার সন্ধ্যাকালে আমার গান হইয়া গেল; রাত্রি ১১টার সময় যখন আমি শয়ন করি তখন ক্ষেত্রবাবু আসিয়া কহিলেন যে, "মহাশয়, শয়নাবস্থায় কি গাওয়া যায় না?" আমি তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া পুনরায় গাইতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমবাবুরা চারি ভ্রাতাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে সে সময় যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহা শুনিতে অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তথাপি আমি যে পর্য্যন্ত গাইলাম

সে পর্য্যন্ত কোন ভ্রাতাই যাত্রার নিকট গমন করিলেন না। বোধ হইল যেন সকলেই মোহিত হইয়াছেন। এইরূপ সুখের ঘটনা যে কত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার জীবন এইরূপ সুখে গত হইয়াছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী বহুকালের পর সর্ব্বস্বান্ত হইলে তাহার মন যেরূপ হয়, এক্ষণে আমার মন ঠিক সেইরূপ হইয়াছে।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

পিতৃদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনা অবশ্য আত্মজীবনচরিতে স্থানলাভ করে নাই। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে জলপ্লাবন হেতু অনেক দীনদুঃখীর সর্ব্বনাশ হয়। এই ভীষণ জলপ্লাবনের তথ্যনির্ণয়, দীনদুঃখীর অবস্থা পরিদর্শন এবং সময়োপযোগী সাহায্যের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর সার রিভার্স টমসন (Sir Rivers Thompson) জল পরিভ্রমণে নির্গত হন এবং নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হন। 'রোটসে' কৃষ্ণনগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইলে, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে পিতৃদেবকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে কৃষ্ণনগরের স্বর্গীয় যদুনাথ রায় বাহাদুর এবং স্বর্গীয় কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় পিতৃদেবের পীড়ার কথা উল্লেখ করেন। এই পীড়ার কথা শুনিয়া সার রিভার্স টমসন জিজ্ঞাসা করেন, "Is he ('the old Dewan') in town ?" ঐ প্রশ্নের উত্তরে যদুনাথ রায় বাহাদুর বলেন যে, "দেওয়ানজী কৃষ্ণনগরেই আছেন, তবে তিনি অতিশয় পীড়িত।" এই কথা শুনিয়া সার রিভার্স স্বয়ং পিতৃদেবের বাসস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজকার্য্যের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা নিবন্ধন, কখন বা অসুখের জন্য, রাজবাড়ীর তেতালার একটি কামরা পিতৃদেবের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছোটলাটের সহিত পিতৃদেবের সাক্ষাৎকারের জন্য সেইদিন ঐ কামরাটিই নির্দ্দিষ্ট হইল *।

সন্ধ্যার সময় সার রিভার্স টমসন বিনা আড়ম্বরে শকটারোহণে পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং পারিবারিক বিষয়ে প্রশ্নাদি করেন এবং পিতৃদেবের অনেক প্রশংসা করেন। যেসকল বন্ধুবর্গ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ আপনার আত্মীয়ের জন্য ডেপুটী চাকরীর আবেদন করিলেন। কিন্তু সার রিভার্স টমসন পিতৃদেবকে পরিবারবর্গের প্রত্যেকের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি নিজের পুত্রদিগের কর্ম্ম-প্রাপ্তির জন্য ছোটলাট বাহাদুরকে কোন রকম অনুরোধ বা উপরোধ করিলেন না। সার রিভার্স টমসন চলিয়া গেলে, তাহার পরদিন কেবলমাত্র বলিলেন "তুমি

* এ সম্বন্ধে ঐ সময়ের ষ্টেটসম্যান দৈনিকপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে ইহার বিবরণ জানা যায়।

বি. এ. পাস করিয়াছ, তোমার কথা একবার মনে হইয়াছিল ; কিন্তু তখনই মনে হইল, ছোটলাট নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছায় আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন ; এই সুযোগের ব্যপদেশে নিজের স্বার্থকলুষিত অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন নিতান্ত অভদ্রোচিত এবং হীন এই ভাবিয়া, তোমাদের কাহারও জন্য ছোটলাট বাহাদুরকে কিছু বলিতে পারিলাম না"।

নদীয়া-রাজ-সংসারে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়া প্রাণপাত করিলেও পিতৃদেব শেষবয়সে রাজকার্য্য পরিচালনা বিষয়ে বিশেষ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। শেষজীবনে রুগ্নশয্যাপার্শ্বে ছোটলাটের অপ্রত্যাশিত সন্দর্শনলাভে সেই নৈরাশ্যজনক বিষণ্ণতা শান্তিময় প্রফুল্লতায় পরিণত হইয়াছিল। রিভার্স টমসন সাহেব যখন কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ তখনই পিতৃদেবের সম্পর্কে অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন ; এবং কার্য্যসূত্রে সেই সময়ে তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। পরেও অনেক কথা শুনিয়া থাকিবেন। পিতাঠাকুর সাহেবদিগের সঙ্গে বিনা কাজে বা উপযাচক হইয়া কখন দেখা করিতেন না এবং কখনও খেতাব প্রাপ্তির জন্য লালায়িত হন নাই ; বিশেষ সুবিধা সত্বেও সাহেবদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপনে কখন প্রয়াসী হন নাই। বরং জীবনের অধিকাংশ সময়েই সাহেবদিগের সুদূরে অবস্থিতি করিতে যত্নশীল ছিলেন।

এই ঘটনার পর, পিতৃদেব কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আবার রাজকার্য্যে নিবিষ্ট হইলেন। ১৮৮৫ সালে ১লা অক্টোবর রাজসংসারের দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া পীড়িতাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। সেইদিন রাত্রিতে অম্লশূলের বেদনা মর্ম্মান্তিক হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। তিনি তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা স্বনামধন্য ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীকে বলিলেন যে, "এই সময়ই, আমার যাইবার সময় ; কিন্তু পুত্রেরা তাহা বুঝেন না।"—বেলা দ্বিপ্রহর, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বিষণ্ণ শোকাকুল পুত্রদিগকে সর্ব্বদা সৎপথে থাকিবার উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, " 'Honesty is the best policy in the long run' ইহা যে সত্য বাক্য, তাহা আমার জীবনের ঘটনাগুলি প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।" আরও বলিলেন, "যাঁহারা আমার বিশেষ অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিয়াও এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার যথেষ্ট সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকা সত্বেও, তাঁহাদের ক্ষতি বা ক্ষতিচেষ্টা করি নাই। তাঁহারাই পরে আমার বন্ধু হইয়াছিলেন। দেখ, এই নদীয়া জেলায় এই চল্লিশ বৎসর রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছি। আমার সন্তান অনেকগুলি, [৭ পুত্র এবং ১ কন্যা] ;—কত লোকে সন্তানদিগের

জন্য কত সময় কত রকমে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আমাকে তোমাদিগের জন্য কখন কোন প্রকার অবমানিত হইতে হয় নাই। তোমরা এ পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ কর নাই যাহাতে আমাকে সমাজে হীন হইতে হয়।" স্বর্গীয়া দেবী-সদৃশী মাতৃদেবীকে এই আশ্বাস দিলেন যে, "তোমার ভাবনা কি, তোমার সাত ছেলে ; সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রও এম. এ. পাস করিয়া বিলাত গিয়াছে।" যতদূর স্মরণ হয়, এই কথাগুলি মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার বন্ধু, সিভিল মেডিকাল অফিসার ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন "দেওয়ানজী, ভয় কি ?", পিতৃদেব ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন "আমার ভয় ?"— * * * ভগবানের নিকট অশ্রুপূর্ণ নয়নে করযোড়ে প্রার্থনা, যেন আমাদিগের নিতান্ত মলিন জীবনের ভগ্নাংশ, পিতৃদেবের জীবন-কাহিনী ও উপদেশ স্মরণে নিয়মিত ও পরিচালিত হয়।

"পতাকা" ৯ই অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল

পতাকা প্রধানতঃ যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদিগকে গত একবৎসরের মধ্যে নূতন নূতন পারিবারিক শোকে নিদারুণ আঘাত পাইতে হইয়াছে। পতাকাতে অবশ্য তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু অন্য যে শোক আমাদিগের হৃদয়কে আকুল করিয়াছে, তাহা দমন করিয়া রাখিবার শক্তি আমাদিগের নাই। যাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, ন্যায়পরতা, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিনয়, শীলতা, জীবনব্যাপী বিশুদ্ধতা চিরকাল আমরা আদর্শস্থানীয় বিবেচনা করিয়াছি, যাঁহাকে প্রতিদিন গৃহে দেখিয়াও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছি, যাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও গৌরকান্তি এখনও মানসনেত্রে দেখিতেছি এবং ইহজীবনে আর কখন বাস্তবিক দেখিতে পাইব না, তাহা নিতান্ত সত্য জানিয়াও ইহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছি না।—তাঁহার জীবনী এখন কেমন করিয়া লিখিব ? তাঁহার পরলোকগত বন্ধু কবিবর ৺দীনবন্ধু মিত্র "সুরধুনী" কাব্যে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এবং অন্য দুই একখানি সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এখন তুলিয়া দিলাম।

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।

(সুরধুনী কাব্য)

"বড়ই শোকের সংবাদ যে, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় গত শুক্রবারে ইহজীবন ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত কৃষ্ণনগর মহারাজের দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছেন। এই প্রবীণ বয়সে ইনি যেরূপ দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য করিতেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। এ ছাড়া ইনি একজন নানাগুণে বিভূষিত সদালাপী মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ইঁহার মধুর সঙ্গীতালাপে বন্ধুবর্গ মোহিত হইতেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি সাহিত্য সমাজেও সুপরিচিত। আজি কৃষ্ণনগর এরূপ রত্ন হারাইয়া শোকসন্তপ্ত।"—দৈনিক।

"We regret to learn of the death this gentleman (Dewan Karticeya Chandra Roy) for many years the Dewan of the Nuddea Rajbaree. He had been complaining for a few days of colicky pain, but no one thought that the end was so near. On Thursday last (Oct. 1) he attended to his duties in connection with the funeral ceremonies of the late Ranee, and returned home feeling very unwell. The next morning he grew worse and expired by four in the afternoon. His sudden death has cast a gloom over the place, as his life was one of self-sacrifice and devotion in the cause of the Rajbaree, and in the interest of his countrymen generally."— *The Statesman, Oct. 7, 1885*

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় *

জগতে এমন কতকগুলি লোক আবির্ভূত হন, যাঁহারা যুদ্ধও করেন নাই, বক্তৃতাও করেন নাই, কোন একটা দলও সংস্থাপন করেন নাই, কোন একটা আবিষ্কারও করেন নাই—তথাপি তাঁহাদিগের জীবন জাতীয় কলঙ্ক অপনয়ন করে, তথাপি তাঁহাদিগের জন্ম মনুষ্যজাতির গৌরব বৃদ্ধি করে, তাঁহাদিগের জীবন সত্যনিষ্ঠার প্রতিভা প্রকাশ করে, এবং তাঁহাদিগের অস্তিত্ব সাধুতার ও ধর্ম্মের প্রতাপ প্রশান্ত ভাবে প্রচার করে। এইজন্যই এইসকল লোকের জীবনচরিত আলোচ্য, এবং দৃষ্টান্ত শুভপ্রদ।

* * *

বিনয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তাঁহার একজন মনস্বী বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"Your father combined in his character the deepest

* "প্রদীপ" হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইল।

humility with the loftiest dignity." যাঁহারা বাহিরে আত্মগরিমা করেন না, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই নিজের পরিবারের সাক্ষাৎ আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি কখন আমার পিতাকে নিজের পরিবারের মধ্যেও আপনার প্রশংসা করিতে শুনি নাই। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি যেরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহাই কখন কখন প্রয়োজনমতে বলিতেন। কিন্তু নিজে গুণের কথা বলা দূরে থাকুক, তিনি আমাদিগকে নিজে গুণের অভাবের কথাই বলিতেন। তিনি একদিন, তাঁহার ভাল স্মরণশক্তি নাই বলাতে, আমি বলিলাম "যদি আপনার ভাল স্মরণশক্তি না থাকে তাহা হইলে আপনি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা মেডিকাল কালেজে পড়িয়াছিলেন, এবং যাহা পরে আর আলোচনা করেন নাই—তথাপি তাহা আপনার ঠিক বেশ মনে আছে কেমন করিয়া? আমরা দুই তিন বৎসর এম. এ. পরীক্ষা দিবার সময় যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা ইহার মধ্যেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন— "তোমাদিগকে পরীক্ষার জন্য এক্ষণে অনেক পুস্তক পড়িতে হয় তাই তোমাদিগের মনে থাকে না। আমাদিগের সময় অল্প পুস্তক পড়িতে হইত। তাই আমার অদ্যাপি পঠিত বিষয় স্মরণ আছে।" তাহাতে আমি বলিলাম—"আপনি ৪৫ বৎসর পুর্ব্বে যেসব পারস্য পুস্তক পড়িয়াছেন তাহার কোন কোন স্থান এখনও আপনি অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারেন। স্মরণশক্তি ভাল না হইলে তাহা পারা যায় না।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তবে বোধ হয় অধিক বয়স হওয়াতে এক্ষণে স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে।" তাঁহার আত্মজীবনচরিতে বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন বিনয ছিল, অপর দিকে তেমনি তেজস্বিতাও ছিল। রাজা কোন অন্যায় কথা বলিলে তিনি তাহা সরলভাবে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

* * *

রাজা সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হইলে যখন বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডসে (Court of Wards) যায় তখন দেওয়ান স্বাধীন সত্যবাদিতা হেতু একজন কমিশনরের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। ঐ ষ্টেট সম্পর্কে কমিশনর সাহেবের ভুল হয়। ম্যানেজার (দেওয়ান) ঐ ভুল অনুমোদন না করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহাতে কমিশনর সাহেব অসন্তুষ্ট হন। বার্ষিক রিপোর্টে কমিশনর সাহেব এইজন্য মানেজারের সমুচিত প্রশংসা না করিয়া রাজকুমারের অভিভাবকের অমূলক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখের বিষয়, স্থানীয় কালেক্টর বিজ্ঞ ষ্টীভেন্‌স্ সাহেব (যিনি পরে ছোটলাট হন) এবং বোর্ড অব রেভিনিউ (Board of Revenue) তাহার ভুয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ায়, কমিশনরের অন্যায় নিন্দা নিমজ্জিত হইয়া গেল। তাঁহার জীবনের কোন সময় সত্যবাদিতায়

তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর বার্ষিক রিপোর্টে তিনি লিখিতেন যে, প্রজা ও জমিদারদিগের মধ্যে দিনদিনই পুর্ব্বের সদ্ভাব কমিয়া যাইতেছে। তিনি যখন প্রথমে এইরূপ লেখেন তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—যে তিনি এইরূপ লিখিলে গবর্ণমেণ্ট কখনই মনে করিবেন না যে তাঁহাদিগের নিজের শাসনপ্রণালী ও আইনের ফলে এই দোষ ঘটিতেছে; বরঞ্চ এই কথাই বিশ্বাস করিবেন যে তাঁহার ম্যানেজমেণ্টের দোষে এই অসদ্ভাব ঘটিতেছে। তাহাতে তিনি বলিলেন —"আমি তাহা জানি। তবে তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না।" তিনি অসদ্ভাবের কথা লিখিলেন। এই উক্তির প্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। ছোটলাট গেজেটে মন্তব্য লিখিলেন যে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যে অসদ্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে সম্ভবতঃ ম্যানেজারের দোষ আছে। ম্যানেজার পরবর্ত্তী বার্ষিক রিপোর্টে এই কথার প্রতিবাদ করিলেন। আমি তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে আবার বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট এইরূপ প্রতিবাদে অতিশয় কুপিত হইবেন এবং তাহাতে আপনাকে বিশেষ মনঃকষ্ট পাইতে হইবে। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "কি করি, বৃদ্ধবয়সে যদি গভর্ণমেণ্ট আমাকে লাঞ্ছিত করেন, উপায় নাই, তবে যাহা সত্য তাহা লিখিতেই হইবে।" ছোটলাট টমসন সাহেব এইবার আরও কুপিত হইলেন, এইবার লিখিলেন, "ম্যানেজার নিজের পক্ষসমর্থন করিতে চাহেন; কিন্তু তিনি রাজবংশের নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষী স্বীকার করিয়াও এ কথা অবশ্য বলিতে হইবে যে প্রজাদিগের অসদ্ভাব ম্যানেজারের অপটুতার জন্য ঘটিয়াছে।" এ কথাও ম্যানেজার নতশিরে গ্রহণ করিলেন না। একজন ডেপুটী কলেক্টরের উপর তদন্ত করিবার ভার অর্পিত হইল। শ্রদ্ধেয় ডেপুটী কলেক্টর ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণের তদন্তে প্রকাশ পাইল যে প্রজাদিগের প্রতি এই জমিদারিতে যেরূপ সদয় ব্যবহার হয় তাহা অন্যত্র প্রায়ই দেখা যায় না। ছোটলাট টমসন ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি বোধ হয় অনুভব করিলেন কাজটি অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট আত্মবাক্য প্রতিসংহার করিলে তাহার সম্মান রক্ষা হয় না। সেইজন্য বোধ হয় গেজেটে এই ফল উল্লেখ করা হইল না। কিন্তু ছোটলাট তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা বশতঃ প্রকারান্তরে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়া দেওয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ছোটলাট কৃষ্ণনগরে আসিলেন। কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান ভদ্র-লোকগণ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হন। তিনি শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেওয়ান কোথায়?" রায় বাহাদুর বলিলেন, "তিনি কৃষ্ণনগরেই আছেন। তিনি এক্ষণে পীড়িত, তজ্জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারেন নাই।" ছোটলাট বলিলেন, "আমি সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট

যাইব, তিনি কোথায় আছেন?" পীড়িত অবস্থায় নিজের বাটীতে ছোটলাটকে সমুচিত অভ্যর্থনা করা বড়ই দুঃসাধ্য হইত। বিজ্ঞ রায় বাহাদুর বলিলেন, "তিনি বাটীতে আছেন কিন্তু তাঁহার বাটী রাজবাটীর অতি নিকট। কল্য রাজবাটীতে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন।" দেওয়ানজীকে আসিয়া তাহাই বলিলেন। তাহার পরদিন দেওয়ানজী রাজবাটীর একটি প্রকোষ্ঠে পীড়িত শরীরে একখানি সোফার উপর শয়ন করিয়া আছেন—ছোটলাট একজন মাত্র এডিকং সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইহা কম সম্মানের বিষয় নহে। দেওয়ান তাঁহাকে দেখিয়া কষ্টে উত্থান করিলেন। ছোটলাট "বসুন" বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। রাজকুমার এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানকে নানাবিধ আত্মীয়তাসূচক কথা বলার পর রাজকুমারকে ছোটলাট বলিলেন, "দেখ, তোমার জমিদাবি এই দেওয়ানের হস্তে আছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য জানিবে। আমি ভরসা করি, ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, তুমি তোমার পিতা এবং পিতামহের ন্যায় ইঁহাকে সম্মান করিবে।" এই ঘটনার কযেক দিবস পরেই দেওয়ান ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরবাসী প্রধান লোকের মধ্যে যাঁহারা সংবাদ পাইয়াছিলেন, প্রায় সকলেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর অন্ধকারময় ছায়া যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিযাছে, যখন তিনি বুঝিযাছেন জীবনের আর আশা নাই, তখন তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন— "দেওয়ানজী ভয় কি!" তিনি প্রশান্তভাবে ঈষৎ হাস্যবদনে উত্তর দিলেন "ভয় কিসের? এই ত মৃত্যুর উপযুক্ত সময়"; এই কথা বলিবার দশ মিনিট পরে তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। মৃত্যুসমযেও সাধু ব্যক্তির কেমন প্রশান্ত নির্ভীক ভাব!

* * *

ইংরাজদিগের যেসকল সদ্গুণ আছে, দেওয়ানজীর চরিত্রে তাহা ছিল। শ্রম, অধ্যবসায়, যথাসময কার্য্যকারিতা, পরিচ্ছন্নতা, সাহস, পুষ্পোদ্যান ও উদ্যানপ্রিয়তা প্রভৃতি ইংরাজদিগের মত তাঁহার ছিল।

ভাল ভাল বিলাতী ফুলের গাছ তাঁহার গৃহোদ্যানে ছিল, অথচ বেল, মল্লিকা, যুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, মধুমালতী, মাধবীলতা ইত্যাদিও ছিল। তিনি কখনও ইংরাজী পরিচ্ছদ অনুকরণ করেন নাই এবং প্রয়োজন ব্যতীত ইংরাজি কহিতেন না। কিন্তু ইংরাজের ন্যায় বন্দুক-ব্যবহার-প্রিয় ছিলেন। লোকালয়-দূরস্থিত তাঁহার উদ্যানভবনে, একটি বন্দুক ও একটি রিভল্‌ভার রাখিয়া, প্রহরীর অপেক্ষা না করিয়া দস্যু বা তস্কর ভয় করিতেন না। দূরপথে যাইতে হইলে বন্দুক বা

রিভল্‌ভার সঙ্গে লইতেন। ইংরাজদিগের এবং স্বদেশের আচার-ব্যবহারে যাহা ভাল, তিনি তাহার সমর্থন এবং যাহা মন্দ তাহার নিন্দা করিয়াছেন।

* * *

৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়কে, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, সকলে অসাধারণ ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, "বান্ধবগণ যে কি গুণ দেখিয়া আমাকে এত ভালবাসিতেন তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারি না। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমাকে সোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং গুরুজনের ন্যায় মান্য করিতেন। একই ব্যক্তিতে এতাদৃশ যুগপৎ স্নেহ ও ভক্তি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অতি অশান্ত ও সকলের অবাধ্য বালকেরাও আমার বশীভূত হইত। স্ত্রীলোকেরা আমাকে নিরতিশয় ভালবাসিতেন, এমন কি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা-কহা করিত।" আমি একটি গল্প শুনিয়াছি। দশ বা একাদশ বর্ষীয়া কোনও রাজকন্যার বিবাহমণ্ডপে যুবা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ও বর উভয়ই উপস্থিত ছিলেন। রাজা কন্যাকে আমোদচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ইহার মধ্যে কাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর।" সরলা রাজকন্যা আঙ্গুল দিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিলেন।

* * *

কামিনী-কাঞ্চনে মনুষ্য-চরিত্রের পরীক্ষা হয। সংসারে এমন লোক অতি বিরল, যিনি অর্থের লোভে বা কোন কামিনীর কুহকে পড়িযা কোন অবৈধ কার্য্য করেন নাই; যিনি লজ্জা না পাইয়া আপনার সমগ্র জীবনকাহিনী প্রকাশ করিতে পারেন। একটি সরলপ্রকৃতি প্রাচীন শিক্ষক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "হৃদয়ের অভ্যন্তরে গোপনে পাপের নরক আমরা পোষণ করিতেছি, তাহা কোনও প্রকারে আচ্ছাদন করিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া কপট হাসি হাসিযা সংসারে বিচরণ করি।" এই কথা সকলের পক্ষে সত্য না হউক, প্রায সকল লোকের পক্ষেই সত্য, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দুই একজন লোক জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদিগের হৃদয়ে নরক নাই, কোন গুপ্ত পাপ নাই। তাঁহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে সাধুতা ও সততা, তাহাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য্য স্বর্গের জ্যোতিঃ দ্বারা আলোকিত। অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায এই দুই-একজন লোকের মধ্যে। তাহার শত্রুগণও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক নামে কদাপি কোনও কলঙ্কের কথা সংযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার আত্ম-জীবন-চরিতে তিনি যে স্বকীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীল চিত্তে পড়িলে বুঝা যায়, প্রতি পরীক্ষাতেই তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি যে পদে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে প্রভূত ধনরাশি

সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেন। একটা রাজবংশের জমিদারী তিনপুরুষ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। মহারাজা সতীশচন্দ্র তাঁহাকে বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া একটা উইল করিয়া দিবার জন্য দেওয়ানজীর নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাহাতে সম্মত হন নাই।

রাজাদিগের অনেক বিষয় পত্তনী ও ইজারা বন্দোবস্ত তাহার হাত দিয়া হইয়াছিল। তিনি কখন স্বনামে বা বিনামে তাহার কোনটি বন্দোবস্ত করিয়া লন নাই। মহারাজা তাঁহার একান্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই রাজবংশ নিষ্কর জমি দান করিয়া বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ, তথাপি স্বকীয় ভবন প্রস্তুত করিবার জন্য এক কাঠাঁও নিষ্কর জমি চাহিয়া লন নাই।

আমাদিগের দেশে অনেকস্থলে দেখা যায়, যে ব্যক্তি কোন বড় জমিদারের ঘরে চাকুরী করেন, তিনি একটি জমিদার হইয়া পড়েন, এবং একটি জমিদারবংশ স্থাপন করেন। দেওয়ানজী ইচ্ছা করিলে তাহা পারিতেন। কিন্তু মহারাজার ধন আত্মসাৎ করিয়া জমিদার হওয়ার নীচ বাসনা, সুবিধা সত্ত্বেও, তাঁহার মনে কখনই উদয় হয় নাই।

গুণগ্রাহী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল—"দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ কায়মনোবাক্যে স্বার্থচিন্তা ছাড়িয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরবপ্রকাশ জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাহা তাঁহাব সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়াগণ এবং হোলকার-সিন্ধিয়া প্রভৃতি সামন্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবজীর সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত।" সংসারে, বিশেষতঃ বৈষয়িক লোকদিগের মধ্যে এরূপ স্বার্থ-ত্যাগ ও সাধুতা অতি দুর্লভ। এরূপ সাধু ব্যক্তি কোন রাজ্যের অধিপতি না হইয়াও নরপতি-তুল্য সম্মানার্হ।

দেওয়ানজীর জীবনে এই মহামূল্য শিক্ষা পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মপথে থাকিয়াও সুচারুরূপে জমিদারী পরিচালনা করা যায়; কেবলমাত্র জমিদারী চালান যায় তাহা নহে, জমিদারীর উন্নতিও করা যায়। আমি এই কথা আমাদিগের দেশের জমিদারগণের নিকট বিশেষ করিয়া নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অনেক জমিদার বিশ্বাস করেন যে, কুকার্য্য না করিলে জমিদারীর রক্ষা বা উন্নতি হয় না। তাঁহারা অতি অল্পবেতনে অসৎ ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের কর্ম্মকর্ত্তা করিয়া থাকেন। এইসকল ব্যক্তি জমিদারদিগকে একদিকে তোষামোদ করিয়া নিত্য মনোরঞ্জন করে, অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে সর্ব্বনাশ করে। একদিন দেওয়ানজী দেশের একটি প্রধান জমিদারকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী রাজনৈতিক বিষয়েও দূরদর্শী ছিলেন। একবার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত একখানি ইংরাজী মাসিকপত্রে, দশশালা বন্দোবস্তের দোষ অতি তেজস্বী ভাষায় ঘোষণা করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেওয়ানজী যাহা বলিয়াছিলেন, অনেক বর্ষের বহুদর্শিতার পর, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় এবং কংগ্রেস তাহাই অদ্য বলিতেছেন। দেওয়ানজী বলিয়াছিলেন যে, যেখানে দশশালার বন্দোবস্ত নাই, সে স্থানে রায়ত-দিগের অবস্থা আরও মন্দ ও শোচনীয়, এবং ভারতের সর্ব্বস্থানে দশশালা বন্দোবস্ত হইলে ক্ষতি না হইয়া বরঞ্চ প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে।

বিলাতে গিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি বলিতেন যে, "যে সাহেবদিগের নিকট আমরা আবেদন করি, তাঁহাদিগেরই পুত্র, ভ্রাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন এই দেশে কার্য্য করিতেছেন। সুতরাং বিলাতের সাহেবেরা, তাহাদিগের পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে আমরা যে কথা বলি, তৎপ্রতি কর্ণপাত করিবেন তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।" এ কথা অদ্য কংগ্রেসনেতৃগণ স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু আমার বোধ হয় এ কথা সত্য বলিয়া একদিন অনুভব করিবেন।

* * *

কবি ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" লিখিযা কবিতাতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশকে চিরস্মরণীয করিয়াছেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র "ক্ষিতীশবংশাবলী" গ্রন্থ লিখিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্ণ ইতিহাস এবং বাঙ্গালাদেশের আংশিক ইতিহাস সাহিত্যপটে স্থায়িভাবে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এবংবিধ ইতিহাস লেখা সম্বন্ধে তিনি পথপ্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইযাছেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য ও নেতা, ব্রাহ্মধর্ম্ম-গৌরব সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক নূতন গ্রন্থে দেওযানজীর "আত্মজীবনচরিত" হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেওয়ানজীর "আত্মজীবনচরিত" হইতে দেওয়ানজীর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের গুণ* উদ্ধৃত করিয়া শিবনাথবাবু লিখিতেছেন ঃ—

"কি অপূর্ব্ব সাধুতা! যাহার বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, যাঁহার আত্মজীবনচরিত হইতে

* "আত্মজীবনচরিত"—পৃঃ ৮৯-১০০

এইসকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এসকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।"

১২৮৫ বঙ্গাব্দে ২১শে আশ্বিন তারিখে মহীশূর-নিবাসিনী স্বনামধন্যা পণ্ডিতা রমাবাই অগ্রজসহ কৃষ্ণনগরে আগমন করেন। দেওয়ানজীর বাসভবন দেশ-হিতৈষী সাধু পণ্ডিতদিগের সঙ্গমস্থল ছিল। পণ্ডিতা রমাবাই অগ্রজ শ্রীশ্রীনিবাস শাস্ত্রীসহ তাঁহার সহিত তাঁহাব ভবনে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই সূত্রে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শ্রীশ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা স্বাধীন হৃদয়ের অকপট উক্তি বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল :—

"শ্রীঃ

কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়! তেজসঃ পরং মহৎ
সাগরস্য পারমাপ্য যত্নতস্তবাদ্ভুতম্।
বুদ্ধিবৈভবস্য ভাবমুদ্গিরৎ প্রতিক্ষণং
ত্বাং নু মূত্তিমন্তমেব তত্র ভাবযত্যহো॥

পরিযদি মতিমান্বিবেকপূর্ণো-
বিবুধগণার্চিত-কাত্তিকেয়-তুল্যঃ।
সচিববর উদারকীর্ত্তিশালী
জয়সি পুরো নন্থ কার্ত্তিকেযচন্দ্রঃ॥

বিবুধগুরুমতীত্য বর্ত্তমানো
নিজধিষণা-জনিত প্রভাভিরার্যঃ।
পরগুণ-পরমাণুভিঃ স্বকীয়ং
গুণজলধিং নু পিধায় কার্য্যকর্ত্তা॥

বিনযবলপবিত্র-চিত্তভাবঃ
পরহিতচিন্তন-দত্তচিত্তবৃত্তিঃ।
প্রকৃতিকৃতি-বিবেচনেঽপ্রমত্তঃ
সুখিতমিহাস্ব শতং সমাঃ সমানঃ॥

শ্রীনিবাসশর্ম্মণঃ"।

COPY OF CERTIFICATE OF HONOUR PRESENTED TO
Babu Kartic Chandra Roy,
Late Dewan of the Nadia Raja.

By Command of His Excellency the Viceroy and Governor-General this certificate is presented in the name of Her Most Gracious Majesty Victoria, Empress of India, to Babu Kartic Chandra Roy, of Krishnaghur, in recognition of his excellent character and faithful and liberal management of the Estates of the Maharaja of Krishnaghur.

(Sd). RICHARD TEMPLE

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত সম্বন্ধে মত

---

* * *

"সভ্য সমাজে যতদিন ইতিহাসের আদর থাকিবে, তাবৎকাল ৺কার্ত্তিকেয়বায় মহোদয়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে ধরাতলে দেদীপ্যমান থাকিবে। অগ্রে জমীদারগণ দস্যু শ্রেণীর মধ্যেই গণনীয় হইতেন, কিন্তু যৎকালে কার্ত্তিকবাবুর "ক্ষিতীশবংশাবলী" প্রচারিত হইল, তখনই গবর্ণমেণ্ট ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বুঝিলেন যে, জমীদারবর্গের অনেকেই বিদ্বান্, সভ্য, ভদ্র, গুণগ্রাহী, বদান্য এবং আশ্রিত-প্রতিপালক। কৃষ্ণনগর রাজবংশের পবিচয় বিশিষ্টরূপ দেওয়াতেই, অন্যান্য রাজবংশের পরিচয়-পুস্তক বাহির হইতেছে। যথা কোচবিহার, দিনাজপুর, নাটোর, মুরশিদাবাদ, চক্রদ্বীপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি। কিন্তু ইহার একখানিও ক্ষিতীশবংশাবলীর অগ্রবর্ত্তী নহে ও গুণনির্ব্বাচনে সমকক্ষ নহে।"

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা, বিদ্যানিধি (সম্বন্ধনির্ণয়-রচয়িতা)। অক্টোবব, ১৯০০ সাল।

Extracts of a letter received from Babu Khetter Nath Bhattacharji.

COMMILLAH, 18th January 1876

My dear Kartik Baboo,

Although I am so late in acknowledging the favour of a present of your book yet allow me to offer my sincere thanks for it. * * * However late I feel I should tell you something about

my opinion of the book, and believe me that it is an honest opinion delivered without fear or favour, and almost with the same judicial impartiality of expression with which I reviewed books in the Education Gazette.

The first thing I should mention is *the excellence of style.* I never knew you could write so well, so very well, I thought you never had had sufficient practice, and therefore feared, the book might not be well written. But on opening the work as it came into my hand, I was most agreeably surprised. The style is formed on the model of Vidyasagara's, and is a most successful one. I now think I should have been able to anticipate it from my knowledge of your abilities. The style of a man is exactly as his thoughts are. I knew you to be a clear-headed earnest-minded man, and I knew you would never say any thing unless you actually had something to say and had thought about it earnestly. I should therefore have expected that your Style would be clear, to the point and always having some matter in it. But beyond this I find another excellence. *The position of the words and expression of sentences are almost in all cases exactly as they should be.* Good writers we have many but in this very important matter there is none who comes up to Vidyasagar. He alone of all our writers places the different elements of a sentence exactly where they should be with a view to give each its requisite weight in giving shape to the idea conveyed in the sentence. * * * * Idiomatic and polished certainly he is, but Akhoy Coomar is far more successful in the variety of his idioms, and Bankim has also been successful in engrafting many foreign idioms in the vernacular. As regards polish there is most of writers of the old school who are scarcely inferior to Vidyasagar. But his chief merit in my eyes consists essentially in the employment of the exact number of words, and in their exact relative position suitable to giving expression to what he just purposes to say.

* * *

Altogether your venture in the book making line seems to me to have been a successful one, and such as most educated people if they proved similarly successful to be proud of. I must therefore ask you to another venture. Subject can not be wanting to a mind like yours and with the experience it has.

*

HINDOO PATRIOT, OCTOBER 4, 1875

* * *

WITH the *glorious exception of Babu Rajendra Lal Mittra*, the writers of our day *have not up to this time turned their attention in this direction.* If we would only look about us with our eyes and ears open ; if we would store up the legends and traditions of times not long past, if we would but carefully study the songs and ballads of our ancestors, we might have sufficient materials for building up a rational and intelligible historical structure. *We hail Babu Karticeya Chundra Roy as a pioneer in this unexplored but interesting field.* It is very gratifying to find that he has made the best use of the opportunities with his long connection *with one of the most ancient and distinguished families of Bengal afforded.* The chronicles of the Rajahs of Nuddea form an important contribution to the history of Bengal and on some particular periods of their history they throw a flood of light.

BENGAL MAGAZINE, 1876, NO. XIII

WE have in this excellent book a series of the memoirs of Rajahs of Nuddea. The book contains a *vast deal of information* and is *admirably written*, the style being at once *simple, elegant and perspicuous.*

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব [৪র্থ খণ্ড ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮২] : নবদ্বীপের ও তত্রত্য রাজন্যবর্গের বিবরণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সকল বঙ্গবাসীরই তাহা সম্যক প্রকারে বিদিত থাকা আবশ্যক। "ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত" সেই আবশ্যক পূরণ করিবে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় বঙ্গবাসীগণের বিশেষ উপকার সাধিত করিলেন, তিনি দেশের বিশেষ অভাব মোচন করিলেন। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অকপট হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করি।

ইহা হইতে অধুনাতন বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। বিশেষতঃ এক্ষণকার বঙ্গদেশীয় জমিদারী বন্দবস্ত ও ব্যবস্থার আভ্যন্তরিক বিবরণ ইহাতে যেমন জানা যায় বঙ্গভাষায় আর কোন গ্রন্থে সেরূপ জানা যায় না।

* * *

সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় অনেক স্থানের উৎপত্তির বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অপর্য্যাপ্ত ও নূতন বিবরণ গ্রন্থমধ্যে

সন্নিবেশিত হইয়াছে যে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মে। মনে হয় উত্তরোত্তর কতই জ্ঞানলাভ করিব। জ্ঞানলাভ করিয়া পাঠক এতদূর সন্তৃপ্ত হইবেন যে তাঁহার পুস্তকের জন্য ব্যয় স্বীকার সার্থক বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় একখানি মূলগ্রন্থ বলিয়া নিশ্চয় গণনীয় হইবে। ইহা হইতে ভবিষ্যতে বাঙ্গালার ইতিহাসবেত্তা অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশ [৭০ নং। ১৮৭৫—৭ই সেপ্‌টেম্বর]ঃ নবদ্বীপের রাজবংশ বর্ণন উদ্দেশ্য করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আনুষঙ্গিক ও প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় বর্ণিত হইযাছে। প্রায় সমুদায়ই কাজের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখানি একখানি উৎকৃষ্ট উপকারক গ্রন্থ হইয়াছে। এতৎপাঠে অনেক বিষয়ে জ্ঞান-তৃষ্ণা ও কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা আছে।

আর্য্যদর্শন [২য় খণ্ড ১২৮২, ভাদ্র ও আশ্বিন—৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা।]ঃ গ্রন্থকারের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের যেরূপ সুবিধা, এবং যে প্রকার উপকরণ হইতে বৃত্তান্তনিচয় সংকলিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিতে হইলে, সমালোচ্য গ্রন্থকে একখানি মূল-গ্রন্থ বলিতে হইবেক। বঙ্গভাষায় অন্যান্য পুরাবৃত্তমূলক যে সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যদি কোন গ্রন্থে মূল বিবরণ প্রচারিত হইয়া থাকে, সেই গ্রন্থের মৌলিকতার সহিত সমালোচ্য গ্রন্থের মৌলিকতার কিছু প্রভেদ আছে। বাস্তবিক ইতিহাসমূলক যাবতীয় মূল গ্রন্থের আদি উপকরণের বিচার করিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে মৌলিকতা দ্বিবিধ। একজাতীয় মৌলিকতার উপকরণ পুরাতন রাজসম্বন্ধীয় কাগজপত্র, নবাবিষ্কৃত লিপিসমূহের তত্ত্বনির্ণয়, মুদ্রা, প্রাচীন পুস্তকাদির লেখন এবং কিম্বদন্তি প্রভৃতি; অন্যজাতীয় মৌলিকতার উপকরণ প্রচারিত গ্রন্থনিচয়। আমাদিগের রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, নৃসিংহচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই দ্বিতীয়-শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ। আজিও প্রথম শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইতে হইলে যে উৎসাহ ও উদ্যোগ, সাহিত্যবিষয়ে রুচি ও ঐকান্তিকতা, অর্থ ও পরিশ্রম, সদ্বিবেচনা ও ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন, কোন বাঙ্গালীর একধারে তাহার কিছুই নাই। সে যাহা হউক সমালোচ্য গ্রন্থের কিয়দংশ প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতা ও কিয়দংশ দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌলিকতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে অনেক সুবিধা হওয়াতে, তিনি সেই উপকরণনিচয়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সেই সদ্ব্যবহার জন্য বঙ্গসাহিত্য একখানি অমূল্য মূল গ্রন্থ লাভ করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তক হইতে স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকবাবু সম্বন্ধে শিবনাথবাবুর উক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোন্নগর-নিবাসী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের দেওয়ানজী সম্বন্ধে অভিমত উপরিউক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করা গেল। তৎসঙ্গে উক্ত গ্রন্থ হইতে দেওয়ানজীর পিতৃবংশ সম্বন্ধে শিবনাথবাবুর স্বীয় অভিমত প্রকাশিত হইল :—

দেওয়ানজী সম্বন্ধে ক্ষেত্রবাবু লিখিতেছেন—"রামতনুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বেলেডাঙ্গাব বাটীতে কযেকবার গিয়াছিলাম। সেখানে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদব ৺কালীচরণ লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাঁহার মাতুলপুত্র ৺কার্ত্তিকচন্দ্র রায় দেওয়ান মহাশয় দুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কি অমায়িক লোক ছিলেন! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও-প্রদেশে কালীচরণ-বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল যে, লোকে ভাবিত তাঁহার দর্শন পাইলেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ আরাম হইয়া যায। দেওয়ান মহাশয় যেমন সুশ্রী ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক যত্ন সহকারে তিনি গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গলাও বড় মধুর ছিল। অনুরোধ করিলেই তিনি গান শুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার ন্যায় প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল।"

শিবনাথবাবু দেওয়ানজীর পিতৃবংশ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"এই রায়-বংশীয়গণ বহু পুরুষ ধরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজ-সংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।* পদে সম্ভ্রমে কুলমর্য্যাদাতে ইঁহারা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন কবেন; সেজন্য ইঁহারা মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া বারেন্দ্র দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল-মর্য্যাদা-সম্পন্ন দেওযানগণ স্বীয় স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বরেন্দ্রভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইযা নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেন।—

* * *

জগদ্ধাত্রী দেবী [স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর জননী এবং স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পিতৃস্বসা] যে রায় বংশের কন্যা তাঁহারা কৃষ্ণনগরে

* "যৎকালে এই রাজবর্গের পূর্ব্বপুরুষেরা ঢাকা অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, সেই সময় হইতে আমার [স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের] পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের সংসারে দেওয়ানী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"—ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত

দেওয়ান চক্রবর্ত্তীর বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তীর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি খাঁ (ভাদুড়ী), সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় প্রভৃতি ছয় ঘর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা-কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা যদি ধর্ম্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোযাদিগের ন্যায় রাজাদিগকে মারিয়া নিজেরাই কার্য্যতঃ রাজসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা না করিয়া বরং আপনাদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাজবাটীর অনেক বিষয় ইঁহাদের নামে বেনামী রহিয়াছে। সেসকল বিষয় ইঁহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন * * * * * এই বংশের পূর্ব্বকথা যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে বংশপরম্পরা-ক্রমে ইঁহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাত-পূর্ত্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ-দরিদ্রে দান প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে এক এক জন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। যাহা শুনিলে অনেকে উপন্যাসের বর্ণিত বিষয় বলিয়া অনুভব করিবেন; কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা।”—ইহার পরে শাস্ত্রী মহাশয় দেওয়ানজীর “আত্মজীবন-চরিত” হইতে দেওয়ানজীর জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের গুণাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবনাথবাবু আর একস্থানে লিখিতেছেন —“ধন-সম্পদে, মান-সম্ভ্রমে তাহার (জগদ্ধাত্রী দেবীর) পিতার (স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পিতামহের) সমকক্ষ লোক কৃষ্ণনগরে ছিল না বলিতে অত্যুক্তি হয় না।”

‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার পত্রিকায় এই গ্রন্থের ভুমিকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

“নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন,—তাঁহার ‘স্বলিখিত জীবনচরিত’ যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ‘স্বরচিত জীবনচরিতে’র আরও একটি আকর্ষণ আছে। ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ রাজবংশের সহিত দেওয়ানজী মহাশয়ের

বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ ;—সুতরাং তাঁহার জীবন-কাহিনীর সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্তও স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। 'আত্মজীবনচরিতে'র এ দেশে সম্পূর্ণ অপ্রতুল। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ আত্মজীবনচরিত ভিন্ন এ বিষয়ে এখনও আর কিছু প্রকাশিত হয় নাই। যে দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথাই নূতন, তথায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত একজন বিষয়ী ব্রাহ্মণ আপনার জীবন-কাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাও অল্প বিচিত্র নহে। রায় মহাশয় এই আত্মজীবনচরিতে প্রসঙ্গক্রমে যেসকল মত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উদারতা ও সূক্ষ্ম দর্শনের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক, এই জীবনচরিতের সঙ্গে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।—'সাহিত্য'-সম্পাদক।"